বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস

ডক্টর কৃষ্ণপদ গোস্বামী

প্রকাশক ঃ
অনিন্দিতা ঘোষ
ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ এডুকেশন
১২১-বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য—সতের টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
সুনীল চন্দ্র পাল
বেন্‌লী প্রেস
১২১-বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান—পি, ঘোষ এণ্ড কোং
২০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

পরমারাধ্যতমা মাতৃদেবীর

পুণ্যস্মৃতি স্মরণে

ভূমিকা

'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস'-এর প্রথম সংস্করণ প্রায় দুই বৎসর পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে গ্রন্থখানি পূর্বে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এই সংস্করণে কতিপয় নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে ও বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বর্তমানে 'বর্ণনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান' (Descriptive Linguistics) সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণামূলক কাজ হইতেছে। এই গ্রন্থে ও ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। তাছাড়া ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণের (Historical and Comparative Grammar) সাহায্যে ভাষাতত্ত্বগত খুঁটিনাটিগুলি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমেরিকায় 'গঠন বিন্যাসমূলক ভাষাতত্ত্ব' (Structural Linguistics) নামক ভাষা-বিজ্ঞানের আর একটি নূতন শাখায় নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ এডুকেশন' গ্রন্থখানির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বইখানি মুদ্রিত হইয়াছে বেন্‌লী প্রেসে। প্রেস-কর্মীগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রশংসনীয়। মুদ্রিত গ্রন্থে কয়েকটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় সেইগুলি নির্দেশিত হইল।

পুস্তকখানি পড়িয়া পাঠক-পাঠিকার চিত্তে বাংলা ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার ভাব জাগ্রত হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
দীপান্বিতা, ৮ কার্তিক সন ১৩৮০
(২৫ অক্টোবর ১৯৭৩)

সূচীপত্র

বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

গ্রীকগণ মানুষের ভাষাকে লোগস্ (lo'gos) বলিত। লোগস্ শব্দের অর্থ—"চিন্তাশক্তি"। কারণ মানুষের চিন্তাশক্তি, ধ্যান-ধারণা ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। ইতর প্রাণী তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এখানেই মানুষের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য। অবশ্য ইতর প্রাণীগণ প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের মনোভাব (যেমন---ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, যৌনক্ষুধা প্রভৃতি) নানা প্রকার ইঙ্গিত বা ধ্বনির সাহায্যে প্রকাশ করে। কিন্তু এই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে ভাষা বলা যায় না, কারণ ইহাদের পশ্চাতে কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তাশক্তি নাই। অবশ্য ইহা খুবই সম্ভব যে আদিম যুগে মানুষও তাহার মনের ভাব ইতর জন্তুদের মত অস্ফুট ধ্বনি বা আকার ইঙ্গিতের সাহায্যে (Gesture language) প্রকাশ করিত। মানসিক উৎকর্ষের ফলে ক্রমে ক্রমে ভাষা সৃষ্টি হয়; এবং এই সৃষ্টির মূলে সম্ভবত ছিল যৌনক্ষুধা বা আদিরস। মানুষের চিন্তাশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ক্রমশ রূপ পাইতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইতর প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেই চিন্তাশক্তি অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে ক্রমবিকাশের ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মানুষ সামাজিক জীব। সে তাহার মনোভাব সমাজভুক্ত বন্ধু-বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানব সভ্যতার আদিম যুগে মানুষ তিনটি উপায়ে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইত—(১) ইঙ্গিত ও সঙ্কেতের সাহায্যে (২) অস্ফুট ধ্বনির দ্বারা (৩) বিবিধ চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে। কণ্ঠোচ্চারিত ভাষা-সৃষ্টির প্রথম স্তরে মানুষ নানাবিধ অঙ্গ-সঞ্চালনের দ্বারা অর্থহীন অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করিত। ক্রমে ক্রমে সেই অব্যক্ত ধ্বনিসমূহ ক্রোধ, হর্ষ, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশের উপযোগী হইয়াছিল। পরে কোন পদার্থ বা বস্তুর উপর বিবিধ চিত্রাঙ্কনের সাহায্যেও মনের ভাব রূপায়িত হইত।

ইঙ্গিতময়ী ভাষার পরবর্তী অবস্থায় কণ্ঠোচ্চারিত অর্থবান ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। মানুষের মনের মধ্যে পৃথক পৃথক অনুভূতিগুলি দানা বাঁধিতে থাকে। বিভিন্ন অনুভূতিগুলি

একত্রিত হইয়া একটা ভাবসত্যের সৃষ্টি হয়। চিন্তাবৃত্তির সম্যক অনুশীলনের ফলেই কতকগুলি ভাব বা ধারণা (concepts) মানস-পটে গ্রথিত হয়। সেই ভাব বা ধারণা-গুলিকে বাক্যের মধ্যে যথানিয়মে সুবিন্যস্ত করিলে একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। **বাক্যই ভাষার প্রধান উপাদান।** বিভিন্ন ভাষাগুলির স্বরূপ ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে ভাষায় অন্তর্গত প্রত্যেকটি বাক্যের শব্দসমূহের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

প্রাচীন যুগে মানুষের ধারণা ছিল ভাষা ভগবানের সৃষ্টি। এই বিশ্বাসের ফলেই সংস্কৃত অপৌরুষেয়, দেবভাষা। বাইবেলেও ভাষা সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বর্ণিত আছে। এক হিসাবে এই মতবাদ সত্য। কারণ ভগবানের সৃষ্ট বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের মনই শ্রেষ্ঠ। "মন্" ধাতু হইতে মানুষ শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার "বুদ্ধিবৃত্তি" আছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণে রাজী নন। তাঁহারা মনে করেন, পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর মত সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। ভাষার উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের মূলে মানুষের মন বিশেষ কার্যকরী। মানবজাতি যেমন সরল জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে সভ্যজীবনের জটিল-দর্শনের ধারা গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি ভাষাও সহজ সরল অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে জটিলরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মোক্ষমূলার (Maxmüller) ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে চারিটি মতবাদ স্থাপনা করিয়াছেন।

(১) The Bow-wow Theory or Onomatopoetic Theory (**ধ্বন্যাত্মক মতবাদ**)।

যে ধ্বনি দ্বারা কোন বস্তু নির্দেশিত হয়, সেই ধ্বনির অনুরূপ শব্দে সেই বস্তুর নামকরণ করা যায়। কোকিল কুহুধ্বনি করে বলিয়া সেই প্রাণীর নাম "cukoo"। পশুপাখী যে শব্দ করে, বালক-বালিকারা সেই শব্দগুলি অনুসরণ করিয়া ইহাদের নামকরণ করে। এইভাবে ধ্বনির অনুকরণজাত কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই মতবাদের সাহায্যে খুব বেশী শব্দ ব্যাখ্যা করা যায় না।

(২) The Pooh-Pooh theory (Interjectional theory)

বিভিন্ন অনুভূতি মানুষের মনে বিভিন্ন অবস্থা ও ভাবের সৃষ্টি করে এবং যথাযথ ধ্বনির সাহায্যে প্রত্যেকটি ভাব ব্যক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে সেই উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ ক্রোধ, বিস্ময়, ভয়, লজ্জা, যৌনক্ষুধা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু

এই মতবাদের ভিত্তিতেও খুব বেশি শব্দ পাওয়া যায় না এবং বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একই মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

(৩) The Ding-dong theory (Pathogenic theory)

ইহার সাহায্যেও কতকগুলি শব্দ সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহ এই পর্যায়ে পড়ে। নিশ্চয়ার্থবোধক দ্বিত্ব-শব্দগুলি (reduplicated) এই ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে।

(৪) The Yo-he-ho theory

ধাতু সমূহই কার্যের অর্থ প্রকাশ করে। শ্রমজীবীরা যখন কোন কঠিন শ্রমমূলক কাজ করে, তখন সমস্বরে একপ্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করে; তাহাতে শ্রমের খানিকটা লাঘব হয়। নাবিকেরা পারে জাহাজ ভিড়াইবার সময় "যো-হে-হো" ধ্বনি করে। ঘরের ছাত পিটাইবার সময় ও অনুরূপ একটা ধ্বনি শ্রুত হয়।

অবশ্য উপরিউক্ত মতবাদগুলির সাহায্যে খুব সামান্য সংখ্যক শব্দের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

ভাষার সংজ্ঞা

ভাষার বিশ্লেষণকে **ভাষাতত্ত্ব** (Linguistics) বলা হয়। ভাষাতত্ত্বে কোন ভাষার বিভিন্ন স্তরের ধ্বনি (Sound), রূপ (morph) ও পদের সংগঠন (Structure) বিশ্লেষণ করা হয়।

ভাষা বলিতে প্রধানত মুখের ভাষাকেই বোঝায়। লেখ্য ভাষায় কথ্য ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য স্থায়ী রূপটি বিধৃত হয়। সুতরাং ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—

(১) সঙ্কেত ও ইঙ্গিত (২) কথ্য ভাষা (৩) লেখ্য ভাষা।

ভাষাতাত্ত্বিকের নিকট সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল অর্থবোধক কণ্ঠজাত ধ্বনি এবং ধ্বনির শ্রেণী বিন্যাস।

ভৌগোলিক অবস্থান ও গোষ্ঠী বিশেষে কথ্য ভাষায় অল্প বিস্তর পার্থক্য থাকিবেই। কিন্তু ভাষা লিপিবদ্ধ হইলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা মানুষ তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা এই ধ্বনিগুলিকে (Sound) বাহিরে রূপ দেওয়া হয়। ধ্বনি-নির্দেশক এই চিহ্নগুলিই হইতেছে কোন একটি ভাষার বর্ণমালা। ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির কোন নির্দিষ্ট সার্বজনীন রূপ নাই। দেশ, কাল বা ভিন্ন

পরিবেশে একই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য পৃথক পৃথক ধ্বনির সংযোগে শব্দ বা পদ সৃষ্টি হয়। এই ভাবে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থদ্যোতক শব্দ (word) বা পদগুলি যখন যথানিয়মে বাক্যে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে **ভাষা** বলে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব-সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। ভাষায় একটি সুনির্দিষ্ট ধ্বনি-সমষ্টি যে জন-সম্প্রদায় ব্যবহার করে, তাহাদিগকে **ভাষা-সম্প্রদায়** (speech-community) বলা হয়। ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে কথ্য ভাষায় কম-বেশি পার্থক্য থাকিবেই।

আবার একই ভাষার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথ্যভাষায় এমন প্রভেদ দেখা যায় যে এক অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা অপর অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট দুর্বোধ্য হয়। যেমন, চট্টগ্রামের কথ্যভাষা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা বুঝিতে পারে না। প্রথমে ধ্বনি-পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাষার পরিবর্তন হইতে থাকে। পরে পদরূপে ও বাক্য-গঠন প্রণালীতেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কোন অঞ্চল মূল দেশ হইতে বিছিন্ন হইলে ভাষা-সম্প্রদায় বিভক্ত হয়। অনেক সময় কোন ভাষার একটি শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। মানচিত্রে রেখার সাহায্যে সেই বিশেষ শব্দটির প্রয়োগের স্থানগুলি প্রদর্শিত হইলে তাহাকে **শব্দ-রেখা** (Isogloss) বলা হয়। আবার রেখা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ধ্বনির ব্যবহার নির্দেশ করিলে তাহাকে **ধ্বনি-রেখা** (Isophone) বলে। প্রত্যয়-বিভক্তির দ্বারা কোন শব্দের প্রয়োগের স্থান নির্দেশিত হইলে বলা হয় **রূপ-রেখা** (Isomorph)। কোন ভাষা-সম্প্রদায়ে একাধিক উপভাষা থাকিলে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা অনেক সময় শিষ্ট ভাষার মর্যাদা লাভ করে। তখন অন্য উপভাষাগুলি এই শক্তিশালী ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। যেমন, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষা এখন সমগ্র বাংলার ভদ্রসমাজে ব্যবহৃত হইবার একমাত্র শিষ্ট-ভাষা। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও পরবর্তী সাহিত্যিকগণ এই চলিত ভাষাতেই (Standard Colloquial Dialect) তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্বগত ভূগোল বা উপভাষাতত্ত্ব (Linguistic Geography)—বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কতকগুলি ভাষা ও উপভাষার সমীক্ষা করার কাজ আরম্ভ হয়। ভাষার ক্রমবিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে আধুনিক ভাষা ঐতিহাসিক কারণেই উপভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উপভাষাসমূহ কোন চলিত ভাষার বিচ্ছিন্ন রূপ নয়। এইভাবে উপভাষার বিশ্লেষণমূলক কাজ অনেকটা অগসর হইয়াছে। উপভাষাসমূহে অনেক সময় প্রাচীন বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায়, যাহা সাধু ভাষাতে লক্ষিত হয় না।

অপভাষা (Jargon or Mixed language)

অনেক সময় দেখা যায় যে প্রয়োজনবশত দুই বা ততোধিক ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা মিশ্রিত হইয়া একটা নূতন ভাষার সৃষ্টি করে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভাষাটিকে সহজ ও বোধগম্য করিয়া তোলা। এই জাতীয় ভাষাকে **অপভাষা** বলা হয়। ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্যই এই ভাষাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। অপভাষাগুলির মধ্যে **চারিটি ভাষা** প্রধান।

(১) পিজিন ইংরেজী (Pidgin English)

ইংরেজী "business" শব্দের চীনা উচ্চারণ "পিজিন"। এই ভাষায় ইংরেজী শব্দই বেশি। তাছাড়া, চীনা শব্দও ব্যবহৃত হয়। অষ্টাদশ শতকে এই অপভাষার জন্ম হইয়াছিল। চীনা ভাষার মত পিজিনে র>ল হয়। পিজিন ভাষা চীন, জাপান ও কালিফর্নিয়ায় প্রচলিত।

(২) বীচ-লা-মার (Beach-La-Mar)

এই ভাষায় ইংরেজী শব্দই বেশি। কিছু কিছু পোর্তুগীস ও স্পেনীয় শব্দ আছে। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত হয়। এই অপভাষায় শব্দের লিঙ্গ, পুরুষ ও বচনে কোন প্রভেদ নাই। যেমন আমি—me ; আমরা—me two fella, ইত্যাদি। You not like soup ? (Don't you like the soup ?)

(৩) চিনুক অপভাষা (Chinook Jargon)

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত ওরগনে এই অপভাষা প্রচলিত। ইংরেজী ও আদিম আমেরিকান ভাষার শব্দসমূহের সংমিশ্রণে এই ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। অল্প সংখ্যক ফরাসী শব্দও পাওয়া যায়।

(৪) মরিশাস ক্রেওল (Mauritius Creole)

মরিশাস দ্বীপ ফরাসীদের দ্বারা অধিকৃত হইলে অনেক নিগ্রো এই দ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এই ভাষায় শব্দ সম্পদের মধ্যে বেশির ভাগই ফরাসী। বীচ-লা-মার মত এই ভাষাতেও শব্দের রূপগত কোন প্রভেদ নাই। অনেক সময় শব্দ ও ক্রিয়াপদ অভিন্ন।

বড় বড় শহরে যেখানে বিভিন্ন দেশ হইতে নানা জাতির লোকের সমাগম ঘটে, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে কথাবার্তার বিনিময়ে নানা প্রকার অপভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

লিপির উদ্ভব

সভ্যতার উষালগ্ন হইতেই মানুষ নিজের মনের ভাব চিত্রে ও দুর্জ্ঞেয় রেখা-বন্ধনীতে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। নিজের মনের কথা বহুজনে জানিবে, অনাগত কালেও নিজের চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবে, মানুষের এই উদগ্র বাসনা চিরদিনই তাহাকে বিচিত্র পথে সৃষ্টিশীল করিয়াছে। তাই পাথরের বুকে, গুহার দেওয়ালে, জীবজন্তুর চামড়ায় মনের কথা চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে মানুষ কত চেষ্টাই না করিয়াছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব ও অনুভূতিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্যই লিপির উদ্ভব হইয়াছিল। লিপির মধ্যেই বাঙ্ময় ধ্বনি আত্মপ্রকাশ করে।

লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারায় কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাওয়া যায় স্মারক-চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি। আদিমস্তরে মানুষ ছবি আঁকিয়া বিশেষ বস্তুর ও ঘটনার চিরন্তন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিত। ইউরোপের বিভিন্ন পর্বতগুহার গাত্রে প্রাচীন যুগের আঁকা চিত্র পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি মানুষের শিল্প উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে ভারতে ভূপালের নিকটে এক প্রাগৈতিহাসিক চিত্রশালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানগণ চিত্রাঙ্কন করিয়া তাহাদের মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশ করিত। দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা রজ্জুতে গ্রন্থি দ্বারা উল্লেখযোগ্য বস্তুর রূপ দিত। এই রীতির নাম কুইপু (Quipu) বা "গ্রন্থিলিপি"।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখিতে পাই **চিত্রলিপি** (Pictogram) ও **ভাবলিপি** Ideogram)—অর্থাৎ রেখাচিত্রের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তু বা ঘটনার রূপ বা ভাব প্রকাশ করা হইত।

তৃতীয়স্তরে আমরা পাই **শব্দলিপি** (Phonogram)। প্রাচীন চীনের লিপি এবং মিশরের চিত্র ও প্রতীকলিপি (Hieroglyphic) এই পর্যায়ের অন্তর্গত।

চতুর্থস্তরে শব্দচিত্রের রেখা সংক্ষিপ্ত হইয়া **অক্ষর লিপিতে** (Syllabic Script) পরিণত হইল। পঞ্চমস্তরে অক্ষরলিপি রূপান্তরিত হইল **ধ্বনিলিপিতে** (Alphabetic Script)।

এই চারিটি লিপি-পদ্ধতি হইতে আধুনিক লিপিসমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

(১) মিশরীয় চিত্রলিপি (২) ভারতীয় চিত্রলিপি (৩) চীনীয় চিত্রলিপি (৪) মেসোপোটেমীয় বাণমুখ (Cuneiform) চিত্রলিপি।

মিশরীয় লিপিচিত্রের প্রাচীন রূপ (Hieroglyphic) হইতে সংক্ষিপ্ত (Hieratic) লিপি উদ্ভূত হইল। পরবর্তীকালে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ফিনিশীয়রা মিশরের

এই সংক্ষিপ্ত লিপি গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে ইহার সংস্কার বিধান করিল। এই ফিনিশীয় লিপি হইতেই গ্রীক, রোমান, হিব্রু, আরবী প্রভৃতি বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের প্রাচীনতম লিপিমালা খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অশোকের অনুশাসনে পাওয়া যায়। খরোষ্ঠী সেমেটিক লিপি (হিব্রু-আরবী) হইতে উৎপন্ন। ব্রাহ্মী-হরফ কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক ভারতীয় এবং তিব্বতী-বর্মী ও যবদ্বীপীয় প্রভৃতি লিপিমালায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

চীনীয় লিপিচিত্র হইতে চীন ও জাপানে প্রচলিত লিপির উদ্ভব হইয়াছে।

ব্রাহ্মী লিপি হইতে **শারদালিপি, নাগরলিপি** ও **দেবনাগরীর** উৎপত্তি হয়।

গুপ্তযুগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মী-লিপি কুটিল-লিপিতে পরিণত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এই কুটিল লিপি হইতেই বাংলা, ওড়িয়া, ও মৈথিলী লিপির উদ্ভব হইয়াছিল।

ভাষাতত্ত্বের একটি উপশাখা হইতেছে **লিপিমালা তত্ত্ব (Graphemics or Graphonomy)**। লিপিতত্ত্বে কেবলমাত্র ভাষার লেখ্যরূপেরই বিশ্লেষণ করা হয় না, মৌখিক রূপের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।

আন্তর্জাতিক ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালা (International Phonetic Script)— বিভিন্ন ভাষার ধ্বনির উচ্চারণ পদ্ধতি বিচারের জন্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ত্ব সংস্থা **(International Phonetic Association)** গঠিত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্ অটো জেস্‌পারসনের (Otto Jesperson) এর নির্দেশমত আন্তর্জাতিক বর্ণমালার প্রতীকরূপে বিভিন্ন স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পৃথিবীর ভাষাবর্গ

ভাষার শ্রেণী বিন্যাস ঃ

পৃথিবীর ভাষাগোষ্ঠীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যে সব ভাষা একদা প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন লুপ্ত এবং যে সমস্ত ভাষা এখন প্রচলিত আছে তাহাদের সবগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দুইটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে ভাষাবর্গের বিভাগ যে সর্বাংশে সমর্থন-যোগ্য তাহা বলা যায় না।

এই দুই প্রকার বিভাগ হইতেছে—(১) **রূপতত্ত্বানুগত, বাক্যরীতিগত বা পদবিন্যাস সম্বন্ধীয় বিভাগ**

(২) **ঐতিহাসিক বা বংশানুক্রমিক বিভাগ**

এতদ্ব্যতীত আরো দুইটি বিভাগের কথা বলা হইয়া থাকে—**ভৌগোলিক শ্রেণী বিভাগ ও নৃতত্ত্বসম্মত শ্রেণীবিভাগ**। ভৌগোলিক ও নৃতত্ত্বসম্মত শ্রেণীবিভাগ প্রাথমিক বিচারেই ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। পৃথিবীর ভাষাগুলিকে কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে শ্রেণীভূক্ত করার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ একটি ভাষা বা ভাষা সম্প্রদায়ের সীমানার সঙ্গে ভৌগোলিক সম্পর্ক না ও থাকিতে পারে। যেমন, ইংরেজী ভাষা ইংলণ্ড ছাড়া কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড ও আমেরিকায় প্রচলিত। স্পেনীয় ভাষা দক্ষিণ আমেরিকায় বহুস্থানে ব্যবহৃত হয়। ভারতে প্রচলিত ভাষাগোষ্ঠীর কথা আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। নৃতত্ত্বসম্মত শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যেও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাংলায় অনেক সাঁওতাল ও মুণ্ডা বাস করে, যাহাদের ভাষা বাংলা।

শব্দ ও অর্থ এই দুই উপাদানের ভিত্তিতে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক ভাষার তিন প্রকার শ্রেণীভেদ করিয়াছেন।

(১) **অবস্থানিক বা বিশ্লিষ্ট**

(২) **যৌগিক**

(৩) **স-বিভক্তিক বা সাধিত**

ম্যাক্সমূলর ও হুইটনি ভাষার এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগকে সমাজ বিবর্তনের তিনটি স্তরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। প্রথম পর্যায়ের ভাষাগুলিকে পারিবারিক স্তরের

(Family stage) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষাগুলিকে যাযাবর স্তরের (Nomadic stage) এবং তৃতীয় পর্যায়ের ভাষাগুলিকে উন্নততর রাজনৈতিক স্তরের (Political) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন।

রূপতত্ত্বানুগত বা পদবিন্যাস সম্বন্ধীয় বিভাগ—

রূপতত্ত্বগত বিভাগে প্রত্যেক ভাষার বাক্য গঠনরীতি বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলিকে সমষ্টিগতভাবে বিচার করা হয়। বাক্যই প্রত্যেক ভাষার মূল একক বা উপাদান। অর্থযুক্ত বাক্যই হইল ভাষার প্রাণ। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বাক্যগুলি ভাষায় কিভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহাই হইতেছে এই প্রকার বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাক্যের মধ্যেই মনের বিভিন্ন ভাব থাকে। তবে এই পদ্ধতি যে একেবারে অভ্রান্ত ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বলা চলে না। যেমন পদ গঠন বিচারে ইন্দো-ইউরোপীয় ও সেমীয় ভাষাগোষ্ঠী একই পর্যায়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক বা বংশানুক্রমিক বিভাগ—

ঐতিহাসিক শ্রেণীবিন্যাসে ভাষা বা ভাষাসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। শব্দ, বিভক্তি, প্রত্যয় এবং বাক্যগঠন রীতিতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে মিল দেখা যায়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ভাষাগুলিকে একটি গোষ্ঠীতে সাজানো হয়। যেমন, সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক, বাল্‌তো-শ্লাবিক, গ্রীক, ইতালিক, জার্মানিক প্রভৃতি ভাষাবর্গের মধ্যে ধ্বনিতত্ত্বগত, রূপগত ও বাক্যগঠনরীতিতে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হইয়াছে যে এই ভাষাগুলি একটি বিশেষ ভাষাবর্গের শাখা এবং এই প্রাচীন ভাষাবর্গের নাম দেওয়া হইয়াছে আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা।

ভাষা সমূহের শ্রেণীবিন্যাস বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে অনেকটা সম্ভবপর। তবে এই বিভাগের ক্ষেত্রে ও কিছু কিছু অসুবিধা রহিয়াছে। প্রথমত প্রত্যেকটি ভাষার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, যথোপযুক্ত নিদর্শনের অভাবের দরুন এই পদ্ধতিতে বর্গীকরণের ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তৃতীয়ত বিভিন্ন ভাষায় যে সব ধ্বনি পরিবর্তন হইয়াছে, অথবা শব্দের অর্থ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

রূপতত্ত্বানুগত বা পদবিন্যাস সম্বন্ধীয় বিভাগ—

এই বিভাগের আবার **দুইটি উপবিভাগ** আছে—(ক) **অশৃঙ্খলিত বা আশ্লেষহীন**

(খ) **শৃঙ্খলিত বা আশ্লেষযুক্ত (Organic)**

(ক) আশ্লেষহীন, অবস্থানিক, স্বতন্ত্রমূলক বা অসমবায়ী **(Inorganic, Positional or Isolating languages)** এই বিভাগের মধ্যে যে ভাষাগুলি অন্তর্ভুক্ত, তাহাদর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের আভ্যন্তরীন বা বাহ্যিক কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত না হইয়াই বাক্যের অর্থ দ্যোতিত হয়। স্থান বিশেষে একই শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার বিশেষণরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। বাক্য-মধ্যে পদের সুনির্দিষ্ট অবস্থানে অর্থ প্রতীতি হয়। এই জাতীয় ভাষার কোন নিয়মতান্ত্রিক ব্যাকরণ নাই। **চীনীয় ভাষা** এই শ্রেণীভুক্ত। চীনীয় ভাষায় কতকগুলি সুর (tone) ব্যবহৃত হয়। বৈদিক সংস্কৃতে যেমন স্বর প্রক্রিয়ার উপর শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়, তদ্রূপ এখানেও সুরের পার্থক্যের উপর অর্থের তারতম্য ঘটে।

(খ) **আশ্লেষযুক্ত বা শৃঙ্খলিত ভাষাবর্গ—**

এই জাতীয় ভাষাবর্গের বৈশিষ্ট্য এই যে শব্দের আভ্যন্তরীন পরিবর্তন দ্বারা কিংবা শব্দের সঙ্গে উপসর্গ বা প্রত্যয়যোগ করিয়া বাকে ব্যবহৃত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হয়। প্রত্যয় বিভক্তির সংযুক্তির দ্বারা পরিবর্তনশীল ধাতুর সাহায্যে শব্দ গঠিত হয়। পৃথিবীর বেশীর ভাগ ভাষাই এই শ্রেণীভুক্ত।

আশ্লেষযুক্ত ভাষাগুলিকে আবার **তিনটি উপ-বিভাগে** ভাগ করা হয় —

(১) **সংযোগমূলক বা সমবাযী (Incorporating)**

(২) **যৌগিক বা সমসাত্মক (Agglutimating or Juxtapositional)**

(৩) **সমন্বয়ী, সাধিত বা সবিভক্তিক (Inflecting)**

(১) **সংযোগমূলক, বহুসংশ্লেষাত্মক, বহুসংহতিমূলক বা বাক্যসংহতিমূলক ভাষাসমূহ** (Incorporating, Polysynthetic or Holophrastic languages) :—

সংযোগমূলক, ভাষাবর্গের দুইটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) পূর্ণ সংযোগমূলক (Completely Incorporating)

এই জাতীয় ভাষাবর্গের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে বিভিন্ন শব্দের যোগে যে বাক্য গঠিত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে একটি শব্দ-বাক্য (Sentence-word)। প্রত্যেকটি শব্দের এক বা একাধিক অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া একটি মাত্র বৃহৎ শব্দে পরিণত হয় এবং তাহাই বাক্য। বাক্যসংহতিমূলক (Holophrastic) বলা হয় এই কারণে যে

সমস্ত অবস্থার ভাবটিই একটি মাত্র শব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রীণল্যাণ্ড এবং আমেরিকার দুই অংশের ভাষা এই পর্যায়ভুক্ত।

(খ) আংশিক সংযোগমূলক (Partially Incoporating)

এমন কতকগুলি ভাষা আছে যেখানে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির আংশিক সংযুক্তিকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বাস্ক (Basque) ভাষার নাম করা যাইতে পারে। এখানে সর্বনামের কর্মপদ ক্রিয়ার সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত হয়। যেমন, সিম্‌তন্দ (Simtanda)—"আমরা ইহা ভালবাসি" ; সিবতন্দ (Sibatanda) —আমরা তাহাদিগকে ভালবাসি।

যৌগিক কিংবা আধুনিক সবিভক্তিক ভাষাগুলিতেও শব্দের আংশিক সংযুক্তিকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ইংরেজীতে—don't=do not। Isn't=is not ; বাংলায়—তা'নলে=তাহা না হইলে ইত্যাদি।

(২) যৌগিক বা সমাসাত্মক ভাষাবর্গ

এই জাতীয় ভাষা সমূহ পৃথিবীর সমস্ত অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে শব্দের উপাদানগুলি পরস্পর যুক্ত হয়, আবার প্রত্যেকটি উপাদানকেই স্বতন্ত্র শব্দ রূপে গণ্য করা যায়। সংযুক্তিমূলক ভাষার মত প্রত্যেকটি শব্দ মিলিত হইয়া একটি মাত্র শব্দ গঠন করে না। ধাতু অপরিবর্তনীয় থাকে এবং প্রত্যয়াদি দ্বারা শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হয়। উপাদানগুলির সংযোগ সাধনের রীতি ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি না করিয়া আশ্চর্যরকম নমনীয়তা (flexibility) ও নিয়মানুবর্ত্তিতা আনয়ন করে। যেমন, তুর্কী ভাষায় দেখিতে পাই—সেব-মেক (Sev-mek) "ভালবাসা" ; সেব-মে-মেক (Sev-me-mek) "ভাল না বাসা" ; সেব-ইন-মেক (Sev-in-mek) —"নিজেকে ভালবাসা"। সোয়াহিলি, তামিল প্রভৃতি ভাষা এই শ্রেণীভুক্ত।

সবিভক্তিক ভাষাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও এই রীতি দেখা যায়। যেমন, সংস্কৃতে ভবিষ্যৎকালে—ভবিষ্যতি, ভবিষ্যতঃ, ভবিষ্যন্তি ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্রয়োগ-রীতি অনুসারে যৌগিক ভাষাগুলিকে কয়েকটি উপ-বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, (ক) **উপসর্গমূলক-যৌগিক ভাষা** (Prefix-Agglutinating)। বান্‌তু (Ba-ntu) ভাষা-গোষ্ঠী এই শ্রেণীভুক্ত। এই ভাষা-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে শব্দের গোড়াতে প্রত্যয়ের পরিবর্তে উপসর্গ বসে।

(খ) প্রত্যয়যুক্ত যৌগিক ভাষা (Suffix-Agglutinating)

এই জাতীয় ভাষায় প্রত্যয়গুলি পর পর যুক্ত থাকে। পৃথিবীর অনেক ভাষা-গোষ্ঠী এই শ্রেণীভুক্ত। উরল-আলতাই গোষ্ঠী ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন, কানাড়ীর ভাষায়—সেবক-রু (Sevaka-ru)—কর্তার বহুবচন
সেবক-রন্নু (Sevaka-rannu)—কর্মের বহুবচন।

"র" এর পরিবর্তে "ন" বসিলে একবচনের রূপ হইবে।

(গ) উপসর্গ-প্রত্যয় যুক্ত যৌগিক ভাষা (Prefix-suffix Agglutinating)

প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলিতে প্রচলিত ভাষাগোষ্ঠী এই শ্রেণীভুক্ত। মালয় শাখার ভাষাগুলিতে উপসর্গ, বিকরণ ও প্রত্যয় পর পর যুক্ত হয়। এই জাতীয় ভাষাসমূহের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, বাক্যগঠনরীতিতে শব্দের দ্বিত্ব (reduplication) হয়।

(ঘ) আংশিক যৌগিক ভাষা (Partially Agglutinating)

কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ভাষা এই শ্রেণীভুক্ত এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। পোলিনেসীয় ভাষা গোষ্ঠী এই শ্রেণীতে পড়ে।

(৩) সমন্বয়ী বা সবিভক্তিক ভাষা (Inflecting languages)

অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠী হইতে এই ভাষাবর্গের পার্থক্য হইতেছে যে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সাহায্যে স্থিরীকৃত হয়। এই প্রত্যয়গুলি শব্দের অপরিহার্য অঙ্গ এবং অনেক সময় শব্দের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়। উভয়ে মিলিত হইয়া একটি নূতন রূপ লাভ করে। লিঙ্গ, বচন, যোগ করিয়া একটা নূতন অর্থবোধক শব্দ গঠিত হয়। এই প্রত্যয়গুলি কোন বিশেষ শব্দ বা শব্দের অংশ হইলেও অনেক সময় ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যৌগিক ভাষাগুলিতে প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত হয় বটে, কিন্তু সেখানে মূল শব্দের কোন রূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। ইহারা শব্দের প্রথমে বা পরে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। এই শ্রেণীভুক্ত ভাষা-বর্গের দুইটি বিভাগ আছে—

(ক) যে সব ভাষার ব্যাকরণের উপাদানগুলি শব্দের মধ্যে মিশিয়া থাকে।

(খ) যে সব ভাষার ব্যাকরণের উপাদানগুলি শব্দের বাহিরে যুক্ত হয়।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত ভাষাবর্গের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে শব্দের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন অনুসারে বাক্যের অর্থ নির্দেশিত হয়। ধাতুতে তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে। ব্যঞ্জনধ্বনি-গুলির মধ্যে স্বরধ্বনির পরিবর্তন অনুযায়ী শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে।

যেমন—√কৃট্‌ল্‌ (qtl) হইতে আগত কিট্‌ল্‌ (qitl) শব্দের অর্থ "শত্রু"। কিটল (qital) শব্দের অর্থ "আঘাত"।

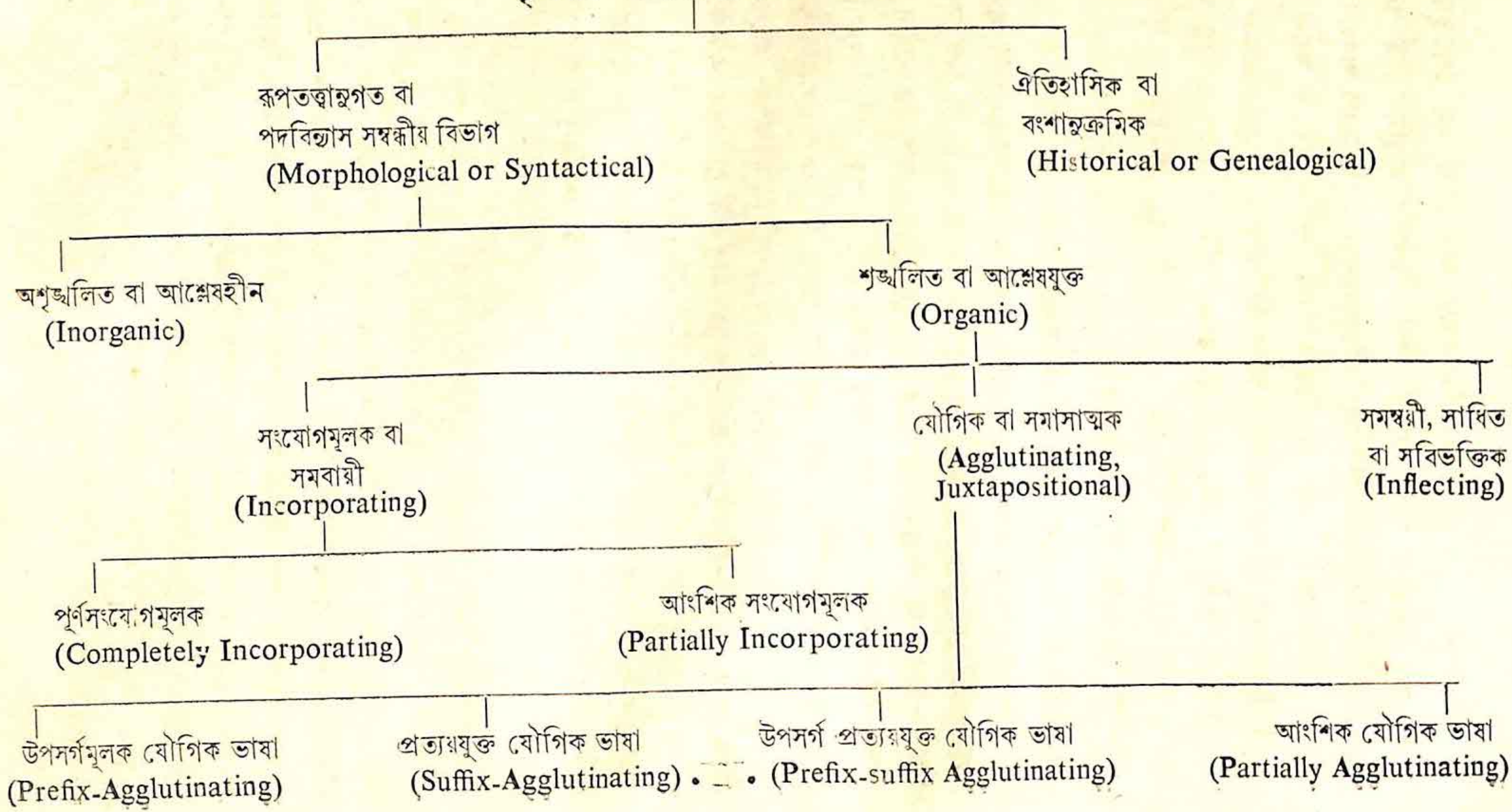
সেমেটিক-হেমেটিক (Semitic-Hamitic) ভাষা-গোষ্ঠী এই শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য ভাষার ক্রম বিবর্তনের ফলে সেমেটিক শাখার অন্তর্গত আধুনিক হিব্রু ভাষা প্রাচীন সংশ্লেষাত্মক অবস্থা (synthetic stage) হইতে বর্তমানে বিশ্লেষণমূলক অবস্থায় (analytic stage) পৌছিয়াছে। ফলে বিভক্তির পরিবর্তে শব্দের অবস্থান অনুসারে বাক্যের অর্থ স্থিরীকৃত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ভাষাবর্গের বিশেষত্ব এই যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিভক্তি বা প্রত্যয় শব্দের শেষে যুক্ত হয় এবং বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স্বতন্ত্র অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী এই শ্রেণীভুক্ত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ভাষাসমূহ এই শ্রেণীতে পড়ে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের বৈশিষ্ট্য সমূহ

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গে প্রত্যয় সমূহ শব্দের অপরিহার্য অঙ্গ। এই প্রত্যয় সমূহের অনেকগুলিই পূর্বে পৃথক শব্দ ছিল। কালক্রমে উচ্চারণ ঘটিত কিংবা অন্য কোন কারণে বিভক্তি-জ্ঞাপক এই শব্দগুলি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাহাদের স্বাধীন সত্তা ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র অক্ষরে (syllable) পরিণত হয়। তখন আবার নূতন করিয়া বাক্য মধ্যস্থিত শব্দের অর্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করিবার জন্য নানাবিধ উপসর্গ, অনুসর্গ, সহায়ক ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ প্রভৃতির সাহায্য নিতে হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর ধাতুগুলি সাধারণত একাক্ষর বিশিষ্ট। শব্দের সঙ্গে সুপ্ বিভক্তি যুক্ত হইয়া কারক-বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপিত হয়। ধাতুর উত্তরে কাল-ভাব-পুরুষ বাচক তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত হয়। আবার ধাতুর উত্তরে কৃৎপ্রত্যয় (Primary suffix) এবং শব্দের উত্তরে তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary suffix) যোগ করিয়া নূতন শব্দ গঠিত হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে ধাতুর গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ (Vowel-gradation) হয়। আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে দুই বা ততোধিক পদ একত্রিত করিয়া সমাসবদ্ধ পদ (Compound)) সৃষ্টি করা হয়। মূল ভাষায় স্বরতরঙ্গ (Intonation) একটি বিশেষ রীতি ছিল। বৈদিকে এবং গ্রীকে স্বর প্রায়ই স্বস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গ পূর্বে সংশ্লেষাত্মক (Synthetical) ছিল, কিন্তু বর্তমানে অনেকগুলি ভাষাই বিশ্লেষণমূলক (Analytical)। আধুনিক বিশ্লেষণমূলক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজী, বাংলা, ফারসী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বৈদিক সংস্কৃত, লিথুয়ানীয়, প্রাচীন হিব্রু, আরবী, হোমারিক গ্রীক প্রভৃতি ভাষাগুলি সংশ্লেষণমূলক।

পৃথিবীর ভাষাবর্গের শ্রেণী বিভাগ



তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে এবং যে-সব লুপ্ত ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের স্বরূপ ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণ সেগুলিকে কয়েকটি বর্গে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। দুই বা ততোধিক ভাষার মধ্যে যদি ধ্বনিতত্ত্বে, রূপতত্ত্বে বা বাক্যগঠন-রীতিতে লক্ষণীয় সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা হইলে সেই সব ভাষাগুলির মধ্যে বংশগত মৌলিক সম্পর্ক অবশ্যই থাকিবে। আবার এমন অনেক ভাষা আছে, যেগুলিকে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

পথিবীর ভাষাগুলিকে বিভিন্ন গোষ্ঠী বন্ধনে আনিবার একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, বহু ভাষা ঐতিহাসিক যুগেই অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর একটা বাধা হইতেছে যে ভাষাগুলির ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। যে-সব লুপ্ত ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৪০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীনতম ভাষা সুমেরীয় (Sumerian), পূর্ব-মেসোপোটেমিয়ার আঞ্চলিক ভাষা মিতান্নি (Mitanni) [খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৬০০], পশ্চিম-ইরানের ভাষা এলামাইত (Elamite) [খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০], ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন ভাষা [খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০], ইটালীর প্রাচীন ভাষা এত্রুস্কান (Etruscan) [খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬০০] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে বাস্ক (Basque), বুশম্যান (Bushman) [দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচলিত], জাপানী, কোরিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচীন ভাষা কোন গোষ্ঠীর পর্যায়ে পড়ে না। এইগুলিকে বলা হয় **[অ-শ্রেণীবদ্ধ বা গোষ্ঠী বহির্ভূত] ভাষা (unclassified languages)**।

পৃথিবীর ভাষাগুলির ইতিহাস বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিতভাবে বর্গীকরণ করা হইয়াছে।

(১) **ইন্দো-ইউরোপীয়** (Indo-European)

(২) **সেমিটিক বা সেমীয়** (Semitic)

(৩) **হেমিটিক বা হামীয়** (Hamitic)

(৪) **আলতাই বর্গ** (Altai family) **অথবা, তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চুবর্গ** (Turki-Mongal-Manchu family)

(৫) **ফিন্নো-উগ্রায়** (Finno-Ugric) **অথবা ইউরলীয়** (Uralic)

(৬) ককেশীয় (Caucasian family)
(৭) ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese or Sino-Tibetan)
(৮) দ্রাবিড় (Dravidian)
(৯) অষ্ট্রিক (Austric)
(১০) পাপুয়া বর্গ (Papuan)
(১১) বান্টু (Bantu)
(১২) উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় ভাষা (Hyperborean or Palaeo-Asiatic)
(১৩) এস্‌কিমো (Esquimo)
(১৪) আমেরিকার আদিম ভাষাসমূহ
(১৫) গোষ্ঠী-বহির্ভূত ভাষাসমূহ

উপরিউক্ত ভাষাবর্গের মধ্যে সাহিত্য ও সম্পদের দিক হইতে ইন্দো-ইউরোপীয় শাখাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার পরেই সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠীর নাম করিতে হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

সেমীয় বা সেমিটিক শাখা

সেমীয় শাখার দুইটি উপশাখা আছে—(ক) পূর্বী উপশাখার মধ্যে পড়ে আসীরীয় (Assyrian) ও আক্কাদীয় (Akkadian) অথবা বাবিলোনীয় (Babylonian)। পশ্চিমী উপশাখার উত্তর গোষ্ঠীতে আছে কনানীয় (Canaanite), ফিনীশীয় (Phoenician), আরামীয় (Aramaic) ও বাইবেলের ওলড্ টেষ্টামেন্টের (Old Testament) মূল ভাষা হিব্রু (Hebrew)। আর দক্ষিণগোষ্ঠীতে রহিয়াছে আরবী এবং ইথিওপিয়ার প্রচলিত ভাষাসমূহ। আরব, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের ৬½ কোটির বেশী অধিবাসীর মধ্যে **আরবী ভাষা** প্রচলিত। পূর্বী উপশাখার ভাষাগুলিকে আসীরীয়-বাবিলোনীয় (Assyro-Babylonian) বলা হইয়া থাকে। বাণমুখ (Cuneiform) লিপিতে লেখা এই দুই ভাষার প্রত্নলেখ ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে পাওয়া যায়।

সেমীয় শাখার অন্তর্গত আরবী বর্তমানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি প্রত্নলেখে।

হেমীয় বা হেমিটিক শাখা

হেমীয় শাখায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য ভাষা প্রাচীন মিশরীয়। ৪০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। মিশরীয় ভাষা হইতে কপটিক (Coptic) আসিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই ভাষার বিলোপ ঘটিয়াছে। তখন হইতে

আরবী ভাষা সমগ্র মিশরে কথ্য ভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে কপটিক ভাষা ধর্মীয় ভাষারূপে প্রচলিত।

হেমীয় শাখার অন্য দুইটি ভাষা, লিবিকো-বেরবের (Libyco-Berber) ও কুশীয় (Cushite)। প্রথমটিতে পড়ে লিবিয়া, মরক্কো, সাহারা ও কানারী দ্বীপ প্রভৃতির কয়েকটি ভাষা। সোমালিল্যাণ্ডের কয়েকটি ভাষা দ্বিতীয়টির অন্তর্গত। সেমীয় ও হেমীয় ভাষাবর্গকে কেহ কেহ একই শাখার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বর্গ

এই বর্গের প্রধান শাখা—(ক) তুর্ক-তাতার (Turkish-Tartar), (খ) মোঙ্গোল (Mongol), (গ) মাঞ্চু (Manchu) অথবা (Tungus)। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক এই তিনটি শাখাকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে বিচার করেন।

ফিন্নো-উগ্রীয়

ফিন্নো-উগ্রীয় বর্গের চারিটি প্রধান শাখা—(ক) ফিন্নীয় (Finnish), পারমীয় (Permain), উগ্রীয় (Ugric) ও সামোয়ীদ (Samoyede)। ইউরল (Ural) পর্বতের প্রান্তীয় অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠী প্রচলিত বলিয়া ইহার নাম ইউরালীয় (Uralic)।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভাষা ফিন্নীয় ও লাপ্পীয় (Lapponic) ; এস্তোনিয়ার ভাষা এস্তোনীয় (Esthonian) ফিন্নীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত। হাঙ্গেরীয় ভাষা হাঙ্গেরীয় (Hungarian) উগ্রীয় শাখাভুক্ত।

এতদ্ব্যতীত চারিটি শাখার অন্তর্গত বহু বিচিত্র ভাষা বর্তমান।

ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষাবর্গের সঙ্গে আলতাই ভাষাগোষ্ঠীর খানিকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেকে দুইটি ভাষাগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

ককেশীয়

এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি ককেশাস অঞ্চলে প্রচলিত। এই বর্গের দুইটি শাখা—(ক) উত্তর-ককেশীয় (খ) দক্ষিণ-ককেশীয়। উত্তর-ককেশীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত কোন ভাষারই বর্ণমালা বা সাহিত্য নাই। দক্ষিণ-ককেশীয় শাখার ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে জর্জিয়ার ভাষা জর্জীয় (Georgian)। পঞ্চম শতকে জর্জীয় ভাষায় রচিত বাইবেলের অনুবাদের কিছু অংশ মিলিয়াছে।

ভোট-চীনীয়

এই ভাষাবর্গের তিনটি শাখা—(ক) চীনীয় (Chinese) (খ) থাই (Thai) বা তাই (Tai) (গ) ভোট-বর্মী (Tibeto-Burman)।

চীনীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কয়েকটি প্রত্নলেখে পাওয়া গিয়াছে। ইহা পৃথিবীর সর্বাধিক লোকের ভাষা। **উত্তর-চীনীয়** প্রায় ৩০ কোটি লোকের মাতৃভাষা।

থাই শাখার প্রধান ভাষা সিয়ামী শ্যামদেশে প্রচলিত।

ভোট-বর্মী শাখার তিনটি উপশাখা—ভোট বা তিব্বতী (Tibetan), বর্মী (Burmese) এবং বোডো (Bodo)। বোডো উপশাখার অন্তর্গত বোডো, নাগা, কাচিন প্রভৃতি ভাষাগুলি বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে এবং হিমালয়ের পূর্বাংশের পাদদেশে প্রচলিত।

দ্রাবিড়

দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত। সিংহলের উত্তরাংশেও দ্রাবিড়ীয় ভাষা কথিত হয়। সুপ্রাচীনকালে প্রত্ন-দ্রাবিড় ভাষা উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে দ্রাবিড় শাখার অন্তর্গত **ব্রাহুই** ভাষা এখনও প্রচলিত আছে। দ্রাবিড় বর্গের প্রধান ভাষাগুলি হইতেছে দক্ষিণ ভারতের তেলেগু (Telugu), তামিল (Tamil), কানাড়ী (Canarese) ও মালয়ালম্ (Malayalam)। উড়িষ্যার ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশে ব্যবহৃত গোঁড়-খোঁড়-ওরাওঁদের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মালদহ জেলায় রাজমহল অঞ্চলে কথিত **মাল্‌তো** উপভাষাও এই শাখার মধ্যে পড়ে।

অষ্ট্রিকবর্গ

এই বর্গের দুই শাখা (ক) অষ্ট্রো-এসিয়াটিক (Austro-Asiatic) এবং (খ) অষ্ট্রোনেশীয়ান (Austronesian), অথবা মালয়-পলিনেশীয় (Malaya-Polynesian)।

অষ্ট্রো-এসিয়াটিক শাখার দুই উপশাখা—মোন্-খ্মের (Mon-Khmer) এবং কোল (Kol) অথবা মুণ্ডা (Munda)। মোন্-খ্মের উপশাখার ভাষাসমূহ বর্মা, মালয় এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কথিত হয়। আসামের খাসী ভাষাও ইহার অন্তর্গত। কোল উপশাখার সাঁওতালী, মুণ্ডারি, হো, ভূমিজা, কোড়া, কুরকু প্রভৃতি ভাষাগুলি পশ্চিমবঙ্গে, ছোটনাগপুরে, মধ্যপ্রদেশে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের পূর্ব-উত্তর অঞ্চলে প্রচলিত। অষ্ট্রোনেশীয়ান শাখার ভাষাগুলি মালয়, ফিলিপাইন, নিউজিলাণ্ড, তাহিতি, হাওয়াই, ফিজি, সামোয়া, ফরমোসা, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত। তন্মধ্যে মালয় (Malay), যবদ্বীপীয় (Javanese), বলিদ্বীপীয় প্রভৃতি ভাষাগুলি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে **ইন্দোনেশীয়** ভাষা প্রায় ৮ কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত।

পাপুয়া বর্গ

এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রায় একশত বত্রিশটি ভাষা আছে। নিউ ব্রিটেনের কোন কোন অঞ্চলে, নিউগিনির প্রায় সর্বত্র—রাউ, টোলো, টারনেট প্রভৃতি দ্বীপে এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অঞ্চল বিশেষে এই বর্গের ভাষাগুলি কথিত হয়। এই ভাষাগুলির সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বিস্তৃত তথ্য জানা সম্ভব হয় নাই।

বাণ্টু

মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সব ভাষাই বাণ্টু বর্গের মধ্যে পড়ে। শতাধিক ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কাফির (**Kaffir**), জুলু (**Zulu**), সোয়াহিলি (**Swahili**) প্রভৃতি ভাষাগুলি উল্লেখ্য।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বর্গ

এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের অল্পসংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে এই বর্গের ভাষা প্রচলিত। উল্লেখযোগ্য ভাষা হইতেছে চুক্‌চী (**Chukchee**)।

এস্‌কিমো

উত্তরমেরুর সীমান্ত প্রদেশগুলিতে, গ্রীণল্যাণ্ড ও আলেউশীয়ান (**Aleutian**) দ্বীপপুঞ্জে এই বর্গের ভাষাগুলি কথিত হয়।

আমেরিকার ভাষা—আমেরিকার প্রাচীন ভাষাগুলির সঠিক সংখ্যা এবং তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক এখন পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। নিম্নলিখিত কয়েকটি বর্গ উল্লেখযোগ্য।

(১) আলগঙ্কিন (**Algonkin**)—প্রায় পঞ্চাশটি ভাষা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) মুস্‌কোজীয়াম্ (**Muskogean**)—ষোলটি ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) উটো-আজটেক (**Uto-Aztex**)—পঁয়ষট্টিটি ভাষা এই বর্গের মধ্যে পড়ে। প্রাচীন আজটেক সংস্কৃতি-বাহক ভাষা ছিল।

(৪) ইরোকোয়ীয়ান (**Iroquoian**)

(৫) পিমান্ (**Piman**)

(৬) সিউউয়ান্ (**Siouan**)

(৭) কিচুয়া (**Kichua**)

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা এখন বিলুপ্তির পথে। ইংরেজী, স্পেনীয়, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপের ভাষাগুলি তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে।

গোষ্ঠী-বহির্ভূত ভাষা—এই পর্যায়ের ভাষাগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) প্রাচীন (খ) আধুনিক।

(ক) প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে সুমেরীয় (Sumerian), এলামাইত (Elamite), মিতান্নি (Mitanni), করিয়ান (Karian) ও এত্রুস্কান (Etruscan) উল্লেখযোগ্য। সুমেরীয়—ইহা মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীনতম ভাষা। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্যাবিলন হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সুমেরীয় এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ভাষা ছিল। ইহা সংযোগমূলক শ্রেণীর ভাষা। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই এই ভাষা অবলুপ্ত হয়।

এলামাইত—পশ্চিম ইরানে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে এই ভাষার প্রচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই ভাষা লুপ্ত হয়।

মিতান্নি—পূর্ব-মেসোপোটেমিয়ার মিতান্নি সাম্রাজ্যের ভাষা ছিল অধুনালুপ্ত মিতান্নি। খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দে বাণমুখ লিপিতে লেখা এই ভাষার নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

করিআন—এই ভাষার প্রাপ্ত অনুশাসনগুলি খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর রচনা।

এত্রুস্কান—ইহা ইটালীর প্রাচীন ভাষা। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। অষ্ট্রিকবর্গের সঙ্গে এই ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেক ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন।

(খ) আধুনিক বিচ্ছিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে বাস্ক (Basque), বুশমান (Bushman), হটেনটট্ (Hottentot), জাপানী (Japanese), কোরিয়ান (Korean), লাটি (Lati), আন্দামানী (Andamanese), বুরুশস্কি (Burushaski), অষ্ট্রেলীয় (Australian) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাস্ক—এই ভাষা ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী পীরেনিজ পর্বতমালার পশ্চিমাংশে কথিত হয়। ইউরোপের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাস্কের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহার উপভাষাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করাও দুরূহ ব্যাপার।

বুশমান ও হটেনটট্—উত্তমাশা অন্তরীপের উত্তর-পশ্চিমাংশে ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাষাগুলি প্রচলিত। এই ভাষাগুলির সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য সংগৃহীত হয় নাই।

জাপানী ও কোরীয়—অনেকে জাপানী ও কোরীয়কে আল্‌তাইবর্গের সঙ্গে যুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভাষাগুলিকে কোন গোষ্ঠীবন্ধনে আনা সম্ভব হয় নাই। জাপানী ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। চীনীয় ভাষা ও সংস্কৃতি এই ভাষার উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কোরীয় ভাষায় পার্শ্ববর্তী মোঙ্গল ও মাঞ্চু ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। **প্রায় ১০ কোটি লোকের মাতৃভাষা জাপানী।**

লাটি—এই ভাষা য়ুনান (Yunan) ও টঙ্কিং (Tonking)-এর সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকশত লোক বলিয়া থাকে।

আন্দামানী—আন্দামান দ্বীপে আন্দামানী ভাষাগুলি প্রচলিত।

বুরুশস্কি—ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি ভাষা। ভারতের কোন ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে ইহা পড়ে না।

চতুর্থ অধ্যায়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা

যে আদিম মূল ভাষা (Parent language) হইতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বাসস্থান কোথায় ছিল সে বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একসময় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বাসস্থান ছিল মধ্যএশিয়ায়। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সেখানে প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় শাখা মধ্য এশিয়ার সীর এবং আমুদরিয়ার ভিতর দিয়া প্রথমে ইরানে আসে। ইরান হইতে পরবর্তীকালে ভারতে আর্যদের আগমন ঘটে। আবার একদল পণ্ডিতের ধারণা যে মধ্য-ইউরোপই প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদি জন্মভূমি ছিল। আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এই জাতি পূর্ব ও মধ্য-ইউরোপে এবং এশিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে এক বিরাট সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি কিছু নূতন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে উরল পর্বতের দক্ষিণে, দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া এবং কিরগিজস্থানের উবর অঞ্চলই ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির আদি বাসস্থান। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা ব্রাণ্ডেনস্টেইন (Brandenstein) মনে করেন যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ইতিহাসকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশের ভাষাগুলি ইউরেশিয়ার উরল পর্বতের দক্ষিণ অংশের সমতলভূমিতে এবং পার্বত্য অঞ্চলে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় অংশের ভাষাগুলি পূর্ব ইউরোপের আদ্রভূমিতে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে আর্যশাখার অধিবাসীগণ আদি বাসস্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, কাজাকস্থান এবং ককেশাস পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া উত্তর-মেসোপটিমায় আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে আর্যশাখার সংস্কৃত, আবেস্তা, প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি ভাষা সমূহ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসহ আত্মপ্রকাশ করে। মিতান্নি শিলালিপিতে কিছু সংখ্যক আর্যশব্দের নাম আমরা পাই। উত্তর মেসোপটিমায় উপনিবিষ্ট আর্যগণ পরবর্তীকালে আসিরিয়ান ও ব্যাবিলনিয়ানদের সঙ্গে মিশিয়া যান। কিন্তু পূর্ব-মেসোপটেমিয়ায় বসবাসকারী আর্যগণ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পুরাপুরি বজায় রাখিতে সক্ষম হন। সেখান হইতে তাহারা প্রথমে ইরানে গমন করেন। ইরান হইতে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বে আর্যদের কয়েকটি দল পশ্চিমপাঞ্জাব ও পূর্ব-আফগানিস্থানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। ইরানীয়-আর্য ও ভারতীয়-আর্য শাখার ভাষাগুলি মূলত এক হইলেও পরবর্তীকালে ভৌগোলিক ও রাজনীতিক কারণে স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের প্রাচীন শাখা দশটি—(১) কেলতিক ((Celtic)), (২) ইতালিক, (Italic), (৩) জার্মানিক (Germanic) বা টিউটনিক (Teutonic), (৪) গ্রীক (Greek), (৫) হিট্টি (Hittite) (৬) তোখারীয় (Tokharian), (৭) বাল্‌তো-স্লাবিক (Balto-slavic) (৮) আল্‌বানীয় (Albanian), (৯) আর্মানীয় (Armenian), (১০) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) বা আর্য (Aryan)।

কেন্তুম (Centum) ও সতম্‌ (Satəm) বিভাগ।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ক-বর্গের তিনটি শ্রেণী ছিল—পুরঃকণ্ঠ্য **(Palatal)**, কণ্ঠ্য বা পশ্চাৎকণ্ঠ্য **(Ve'ar)** ও কণ্ঠোষ্ঠ্য **(Labio-ve'ar)**।

মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য "ক" **(K)** ধ্বনি কেলতিক, ইতালিক, জার্মানিক, গ্রীক, হিট্টি ও তোখারীয় শাখায় রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু ইন্দো-ইরানীয়, বালতো-স্লাবিক, আলবানীয় ও আর্মানীয় শাখায় এই "ক" ধ্বনি শ-কারে অথবা স-কারে পরিণত হইয়াছে।

এই শাখাগুলির মধ্যে হিট্টি ও তোখারীয় বর্তমানে বিলুপ্ত। তোখারীয় ভাষার নিদর্শন চীনীয় তুর্কীস্থানে ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে পাওয়া যায়।

এই ভাষা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল।

মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ধ্বনির এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ইন্দো-ইউরোপীয়বর্গের ভাষা গোষ্ঠীকে দুইটি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

যে ভাষাগুলিতে কণ্ঠ্যধ্বনি রহিয়া গিয়াছে সেই ভাষাগুলি কেন্তুম্‌ শাখার অন্তর্ভুক্ত, আর যে ভাষাগুলিতে ইহা "শ" বা "স" হইয়াছে, সেগুলি সতম্‌ শাখার

অন্তর্গত। মূল ভাষার *Kṃtom '(শত)' শব্দের লাতিনে রূপ ছিল "কেন্তম্", আর আবেস্তায় ছিল "সতম্"। এই দুইটি শব্দের উপর ভিত্তি করিয়া দুইটি শাখার নামকরণ হইয়াছে।

মূল ভাষার *Kṃtom (শতবাচক শব্দ)

কেন্তম্ শাখা	সতম্ শাখা
লাতিন-কেন্তম্ (Centum)	সংস্কৃত—শতম্ (Satam)
গ্রীক —হে-কতোন্ (He-katon)	আবেস্তীয়—সতম্ (Satəm)
আইরিশ—কেত্ (Ket)	স্লাবিক—স্থতো (Suto)
ওয়েল্‌স—কন্ত্ (Kant)	লিথুয়ানীয়—শিম্‌তাস্ (Szimtas)
তোখারীয়—কত (Kat)	রুশীয়—স্তো (Sto)
গথিক—খুন্দ্ (Khund)	
ইংরেজী—হনড্রেড (Hund-red)	

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের এইরূপ শ্রেণী-বিন্যাসের ফলে অনেক ভাষাতত্ত্ববিদের ধারণা হইয়াছিল যে প্রাচ্য অঞ্চলের ভাষাগুলি সতম্ শাখার অন্তর্গত, আর পাশ্চাত্য অঞ্চলের ভাষাগুলি কেন্তম্ শাখার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হিট্টি ও তোখারীয় ভাষার আবিষ্কারের ফলে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইয়াছে, যেহেতু এই দুইটি ভাষাগোষ্ঠী কেন্তম শাখার অন্তর্গত হইলেও প্রাচ্য অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর সমগ্র লোক সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষায় কথাবার্তা এবং ভাবের আদানপ্রদান করিয়া থাকে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পরিচয়

কেলতিক ভাষাগুলির মধ্যে আয়র্লণ্ডের আইরীশ ভাষাই উল্লেখযোগ্য। আইরীশ ভাষায় লিখিত সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন মিলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপিতে ও অষ্টম শতাব্দীতে রচিত কয়েকটি গ্রন্থে। ওয়েলস ভাষাও কেলতিক শাখার অন্তর্গত। পশ্চিম ও মধ্য-ইউরোপে একদা কেলতিক ভাষার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কেলতিক ভাষার সহিত ইতালিক ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। সেজন্য অনেক ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন যে এই দুইটি শাখার মূল একই ছিল—পরে দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত হয়। কেলতিক ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও বাক্য-গঠনরীতি অত্যন্ত জটিল। ইতালিক ও জার্মানিক ভাষার প্রভাবে এই শাখার অন্তর্গত ভাষাগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে।

ইতালিক—ইতালিক শাখায় দুইটি প্রাচীন লুপ্ত ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—ওস্কান্ (Oscan) ও উম্ব্রিয়ান (Umbrian)। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওস্কান ভাষায় লেখা কতকগুলি প্রত্নলিপি মিলিয়াছে। এই ভাষা দুইটিতে মূল ভাষার কণ্ঠোষ্ঠ্য ধ্বনি প-বর্গে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইতালীয় শাখার ভাষাগুলির মধ্যে লাতিনই প্রধান। ইতালীর লাতিউম (Latium) প্রদেশের ভাষা হইলেও লাতিন মূলত রোমের ভাষা। এই ভাষাতেই উঁচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃতের মত লাতিনও সমগ্র ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সংস্কৃতি-বাহক ভাষা ছিল। লাতিনের বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্যরূপ হইতে আধুনিক ইতালিক বা রোমান্স (Romance) ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। এই ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হইতেছে—ইতালীতে ইতালীয়, ফ্রান্সে ফরাসী, স্পেনে স্পেনীয়, পর্তুগালে পোর্তুগীস, রুমানিয়ায় রুমানীয় ও সুইট্জারলাণ্ডে রেটো-রোমাইক। **বর্তমানে ১২ কোটি লোক স্পেনীয় ভাষা ও ৬ কোটি লোক ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে।**

জার্মানিক—জার্মানিক শাখার ভাষাগুলি তিনটি উপভাষায় বিভক্ত—পূর্ব জার্মানিক, পশ্চিম জার্মানিক, উত্তর জার্মানিক। পূর্ব জার্মানিক উপশাখার নিদর্শন গথিক ভাষা বর্তমানে লুপ্ত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গথিক ভাষায় রচিত বাইবেলের অনুবাদের কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম জার্মানিক উপশাখার অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান—ইংরেজী, জার্মান ও ওলন্দাজ। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জার্মানিক ভাষা ব্রিটেনে প্রচলিত কেলতিক ভাষাকে হঠাইয়া দেয়। ইংরেজী ভাষা সাহিত্য গৌরবে এবং লোকসংখ্যার দিক হইতে পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। **বর্তমানে ২৫ কোটি লোকের মাতৃভাষা ইংরেজী। ১০ কোটিরও বেশী লোক মাতৃভাষারূপে জার্মান ভাষা ব্যবহার করে।**

উত্তর জার্মানিক ভাষার মধ্যে পড়ে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসল্যাণ্ডের ভাষা।

জার্মানিক শাখায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের ফলে জার্মানিক শাখার ব্যঞ্জনধ্বনি পদ্ধতি অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার ব্যঞ্জনধ্বনি-পদ্ধতি হইতে পৃথক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম সর্বপ্রথম সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করেন য়াকোব গ্রিম (Jacob grimm)। সেইজন্য এই ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম **গ্রিমের সূত্র** (Grimm's law) বলিয়া পরিচিত। এই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির পরিবর্তন সম্পর্কে **রাস্ক** (Rask) প্রথমে ভাষা-তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

গ্রিমের সূত্র এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ—মূল ভাষার চতুর্থ, তৃতীয় এবং প্রথম বর্ণের ধ্বনি জার্মানিক শাখায় যথাক্রমে তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে (সাধারণত উষ্মবর্ণ) রূপান্তরিত হইয়াছে।

যেমন, * ভেরো (bhero)>গথিক—বের (baira) ইং—বেয়ার (bear);

* ঘোন্‌সো (ghonso)>ইং গুজ (goose)

* √ধে (dhe)>ইং ডু—(do)

* দোন্ত (dont)>ইং টুথ্ (tooth)

* দ্বে>গথিক টুা (twa), ইং—two

* দেকেম্ (decem)>গথিক—টইহুন্ (taihun) ইং-টেন (ten)

* পেকু (Peku)>গথিক ফেখু (fachu), ইং ফী (fee)

* পাতের (Pətēr)>গথিক—ফাডার (fader), ইং ফাদার (father)

জার্মানিক শাখায় মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও অনেক ব্যতিক্রম রহিয়া গেল।

যেমন * স্ক, * স্ত * স্প—এই যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির ক, ত, প, গ্রিমের সূত্র অনুসারে পরিবর্তিত হয় নাই। যেমন * এস্তি (esti)>গ্রীক (এস্তি), >সং—অস্তি, ইং—ইজ্ (is)।

পরবর্তীকালে **গ্রাস্‌মান্** (Grassmann) ও **বের্‌নের্** (Verner) অনেকগুলি ব্যতিক্রমের মীমাংসা করিলেন। এইগুলি গ্রাস্‌মানের সূত্র (Grassmann's law) ও বের্‌নের সূত্র (Verner's law) বলিয়া পরিচিত। গ্রাস্‌মানের সূত্র গ্রীকে ও আর্য-শাখায় প্রযোজ্য।

গ্রাস্‌মানের সূত্র এইরূপ—মূল ভাষার কোন শব্দে পাশাপাশি দুইটি অক্ষরে চতুর্থ বর্ণ থাকিলে তাহাদের মধ্যে একটি গ্রীকে ও আর্য শাখায় তৃতীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছে।

যেমন, * √ভেউধ্ (bheudh)>সং বুধ্, গ্রীক পেউথ (Peuth);

*ভেন্ধ্ (bhendh)>সং বন্ধ, গ্রীক পেন্থ (Penth);

* ধুঘতের্ (dhughəter) সং দুহিতা, গ্রীক থুগতের্ (thugater)

অবশিষ্ট যে ব্যতিক্রমগুলি রহিয়া গেল, তাহার অনেকগুলি কার্ল বের্‌ন তাঁহার আবিষ্কৃত ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্রের সাহায্যে মীমাংসা করিলেন।

বের্‌নের সূত্র এইরূপঃ—ব্যঞ্জন ধ্বনির অব্যবহিত পূর্ববতী অক্ষরে স্বরাঘাত (accent) না পড়িলে মূল ভাষার প্রথম বর্ণ জার্মানিক শাখায় দ্বিতীয় (উষ্ম) বর্ণ না হইয়া

তৃতীয় বর্ণধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং "স" ধ্বনি জ়-কার (z) হইয়াছে; অর্থাৎ পরবর্তী অক্ষরে স্বর থাকিলে ক, ত, প যাথাক্রমে গ, দ, ব হইবে।

যেমন, * কৃম্‌তোম (Kmtó'm)>গথিক খুন্দ্ (hund), ইং হণ্ড্-রেড্ (hundred); * ক্লুতোঁস (Kluto´'s) গ্রীক ক্লুতোস্, সং শ্রুতন্, ইং লাউড্ (loud)। * কস´ (Kasa) সং শশ, ইং হেয়ার<*haza।

গ্রীক

হোমরের রচিত "ইলিয়াড্" ও "ওডিসি" (Illiad ও Odyssey) নামক মহাকাব্যদ্বয়ে প্রাচীনতম গ্রীক ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে গ্রীক ভাষা এশিয়া মাইনরের উপকূলে, সাইপ্রাস দ্বীপে ও ঈজিয়ান উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। গ্রীকের অনেকগুলি উপভাষা ছিল, তন্মধ্যে প্রধান—(ক) আত্তিক-আইওনিক (Attic-Ionic) ও দোরিক (Doric)। ইলিয়াড্ ও ওডিসি আইওনিক উপভাষায় রচিত। পরবর্তী কালের গদ্য-সাহিত্য প্রধানত আত্তিক উপভাষায় রচিত হইয়াছিল। দোরিকে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার দীর্ঘ "আ" রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আত্তিক-আইওনিক ভাষায় ইহা দীর্ঘ এ-কার হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে গ্রীক ভাষায় রচিত কতকগুলি প্রত্নলেখ পাওয়া গিয়াছে। এথেন্সের গৌরবময় যুগে আত্তিক উপভাষায় গ্রীসের অমূল্য নাট্য সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের অবদান। খ্রীষ্টজন্মের নিকটবর্তী সময়ে গ্রীক উপভাষাগুলির মিশ্রণে **কোইনে** (Koine) নামক সাধুভাষার উদ্ভব ঘটে। তাহা হইতেই আধুনিক গ্রীক ভাষার জন্ম।

হিট্টি

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এশিয়া মাইনরের কাপ্‌পাদোকিয়া প্রদেশে বাণমুখ অক্ষরে উৎকীর্ণ অনেকগুলি প্রত্নলেখের সন্ধান পাওয়া যায়। যেস্থানে প্রত্নলেখগুলি আবিষ্কৃত হয়, সেখানে খ্রীষ্ট-পূর্ব দুই হাজার অব্দে হিট্টাইট সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই প্রত্নলেখগুলির মধ্যে এক সুপ্রাচীন ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহার নাম হিট্টি।

ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের অন্যতম শাখারূপে এই ভাষা এশিয়া মাইনরে প্রায় দেড় হাজার খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে প্রচলিত ছিল। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন যে ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের তুলনায় হিট্টি ভাষা প্রাচীন। **এই কারণে ইন্দো-হিট্টিকে মূল ভাষা ধরিয়া তাহা হইতে প্রত্ন-হিট্টি ও প্রত্ন-ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার পরিকল্পনা করা হয়।** কিন্তু যথেষ্ট উপাদানের অভাবে এই মত এখন পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। হিট্টি প্রত্নলেখ-

গুলির মধ্যে অশ্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়, যাহার সঙ্গে ভারতীয়-আর্য ভাষায় মিল রহিয়াছে। যেমন, "আইক-বর্তন", সং-একবর্তন। মেসোপোটেমিয়ার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মিটান্নির রাজসভার ভাষার সহিত ভারতীয় আর্যভাষার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহার প্রমাণ মিলে অন্য একটি প্রত্নলেখে। এই প্রত্নলেখ হইতেছে হিট্টাইট ও মিটান্নি এই দুই সাম্রাজ্যের রাজাদের মধ্যে। পুত্র-কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র। এই চুক্তি-পত্রে কয়েকটি বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়। যেমন্ "ইন্দর" (=ইন্দ্র); "উরুবন" (=বরুণ); "মি-ইৎ-র" (=মিত্র); "নশত্তিয়ন" (=নাসত্যানাম্)। কয়েকটি ব্যক্তিনামে ও ভারতীয়-আর্য ভাষার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। যেমন, শুবন্দু (=সুবন্দু); অর্তমনিঅ (=ঋতমন্য)। হিট্টি ভাষার ধ্বনি সংখ্যা কম ছিল। কয়েকটি কণ্ঠনালীয় ধ্বনি ছিল। বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ নাই। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার তুলনায় অনেক সরল। সুমেরীয় ও আক্কাদীয় ভাষার প্রভাব হিট্টিতে পড়িয়াছে।

তোখারীয়

এই ভাষা বর্তমানে লুপ্ত। বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতে মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত চীনীয় তুর্কিস্থানের বালুকাস্তূপের মধ্য হইতে কতকগুলি প্রত্নলিপি আবিষ্কৃত হয়। এই প্রত্নলেখ-গুলি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। "তোখারীয়" তুখার বা তুষার জাতির ভাষা ছিল। এই ভাষার দুইটি উপভাষা ছিল—প্রথমটি ছিল তুখারদের ভাষা। দ্বিতীয়টি কুচা অঞ্চলের ভাষা বলিয়া ইহাকে "**কুচীয়**" বলা হইয়া থাকে। তোখারীয় ভাষায় রচিত যে সাহিত্যের নিদর্শন মিলিয়াছে, তাহা বৌদ্ধশাস্ত্র ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্পর্কিত। কতকগুলি বিষয়ে তোখারীয় ভাষার সঙ্গে কেলতিক ও ইতালিক ভাষায় সাদৃশ্য দেখা যায়।

বাল্‌তো-স্লাবিক ঃ—

এই বর্গের ভাষাগুলির দুইটি শাখা—(১) বালতিক (২) স্লাবিক।

বালতিক শাখার অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে পড়ে—প্রাচীন প্রুশীয়, লিথুয়ানিয়ার লিথুয়ানীয় ও লাটাবিয়ার লেট্। প্রাচীন প্রুশীয় ভাষা ষোড়শ শতকের শেষের দিকে লুপ্ত হইয়াছিল। আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে লিথুয়ানীয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীনপন্থী। এই ভাষায় কালগত ধ্বনি পরিবর্তন বিশেষ হয় নাই।

স্লাবিক শাখার অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত; তন্মধ্যে দক্ষিণ স্লাবিক ভাষার মধ্যে বুলগারীয় ও সার্বীয় প্রধান। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বুলগারীয় ভাষায় বাইবেল

অনূদিত হইয়াছিল। পশ্চিম স্লাবিক ভাষার অন্তর্গত চেখ্, পোল ও স্লোবাকীয়। পূর্ব-স্লাবিক ভাষার মধ্যে পড়ে রুশ ও তাহার বিভিন্ন উপভাষা। **বর্তমানে ১১ কোটিরও বেশী সংখ্যক অধিবাসী রুশীয় ভাষা মাতৃভাষা রূপে ব্যবহার করে।**

আলবানীয়—

আদ্রিয়াতিক সাগরের পূর্ব উপকূলে আলবানিয়ায় আধুনিক আলবানীয় ভাষা প্রচলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে আলবানীয় ভাষায় রচিত বাইবেলের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে আলবানীয় ভাষার কোন সাহিত্যিক নিদর্শন নাই।

ইউরোপের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের এবং তুর্কী ভাষার বহু শব্দ এই ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

আর্মানীয়—

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আর্মেনিয়া অঞ্চলে আর্মানীয় ভাষা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হয়। আর্মানীয় সাহিত্যে গ্রীসের দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ পাওয়া যায়। আর্মেনিয়ার বাহিরেও কোন কোন অঞ্চলে আর্মানীয় ভাষা কথিত হইয়া থাকে। হিট্টি ভাষার কিছু উপাদান এই ভাষায় মিলে।

ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য—(Indo-Iranian or Aryan)-ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য-শাখার দুইটি প্রধান উপশাখা—ইরানীয় এবং ভারতীয়-আর্য। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ আর্য শাখায় ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যের মধ্যবর্তী "দরদীয়" (Dardic) নামে একটি তৃতীয় শাখার কল্পনা করেন। এই দরদীয় উপশাখার অন্তর্গত ভাষাগুলিতে ইরানীয় ও ভারতীয় উভয়েরই ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই ভাষাগুলির মধ্যে কাশ্মীরী ভাষা উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়-আর্য ভাষার আদিগ্রন্থ যেমন বেদ, ইরানীয় ভাষার আদিগ্রন্থ তেমনি জেন্দ্ আবেস্তা। আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ ঋগ্বেদের পরে রচিত হয়। তবে এই দুইয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। আবেস্তা ব্যাকরণের রচয়িতা জ্যাক্সনের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য "Almost any Sanskrit ward may be changed at once into its Avestan equivalent or vice versa by applying certain phonetic laws"। ইরানীয় উপশাখায় দুইটি প্রধান ভাষা হইতেছে আবেস্তীয় (Avestan) ও প্রাচীন পারসীক (Old Persian)। জরথুশ্‌ত্রীয় মতাবলম্বীদের প্রাচীন শাস্ত্র আবেস্তার ভাষ হইতেছে আবেস্তীয়। ইরানের উত্তর অঞ্চলের কথ্য ভাষার

উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। আবেস্তার প্রাচীনতম অংশের মধ্যে রহিয়াছে কয়েকটি গাথা বা স্তব। আনুমানিক গ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মগুরু জরথুশ্‌ত্র কর্তৃক এই গাথাগুলি রচিত হইয়াছিল। বৈদিকের সঙ্গে গাথিক আবেস্তীয় ভাষার গভীর মিল রহিয়াছে। জরথুশ্‌ত্র কর্তৃক তাঁহার নূতন ধর্ম প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ইরানীয় আর্যরা ভারতীয় আর্যদের মত যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনা করিতেন। আবেস্তায় আর্যদের এই প্রাচীনতম ধর্মের নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম গৃহীত হওয়ার ফলে ইরানীয় আর্যগণ দেব বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন। ফলে আবেস্তীয় ভাষায় "দএব" (=দেব) শব্দের অর্থ দাঁড়াইল অপদেবতা। তেমনি ইন্দ্র, নাসত্য প্রভৃতি দেবতার আসল অর্থ আবেস্তায় রক্ষিত হয় নাই। আবার আবেস্তায় ঈশ্বরের নাম হইতেছে "অহুর মজ্‌দা" (=অসুর মেধাঃ)। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিকে এবং সংস্কৃতে অসুর শব্দের মূল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে "দেব-বিরোধী"।

আবেস্তা যখন সঙ্কলিত হইয়াছিল তখন প্রাচীন ইরানীয় ভাষা দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছিয়াছে। তজ্জন্য অর্বাচীন আবেস্তায় স্বরবর্ণের বাহুল্য, হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের মধ্যে অসঙ্গতি এবং অপিনিহিতির আতিশয্য লক্ষণীয়।

প্রাচীন পারসীক ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অর্থাৎ পারস্যের ভাষা। পরবর্তী-কালে পারসীক সমগ্র ইরানের রাজভাষা হইয়া দাঁড়ায়। গ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বাণমুখ লিপির এক সরলতর রূপে প্রাচীন পারসীকের অনুশাসনগুলি লিখিত হইয়াছিল। প্রাচীন পারসীকের সঙ্গে সংস্কৃতের গভীরতর সাদৃশ্য রহিয়াছে। আনুমানিক গ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাচীন পারসীক ভাষা পরিবর্তিত হইয়া পহ্লবী ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। সংস্কৃত হইতে যেমন প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, পহ্লবীও তদ্রূপ। পহ্লবী ব্যতীত আরো কয়েকটি মধ্য-ইরানীয় ভাষার নিদর্শন মিলিয়াছে। তন্মধ্যে "শক" ভাষা উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক গ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পহ্লবী বা মধ্য-পারসীক হইতে ফারসী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আধুনিক ফারসী এখন ইরান এবং বাহিরের অনেক অঞ্চলের মাতৃভাষা। আধুনিক ফারসীর ব্যাকরণ খুব সহজ ও সরল। ফারসীর শব্দ ভাণ্ডারে বহু আরবী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক ইরানীয় ভাষার মধ্যে ফারসীর পর উল্লেখ্য আফগানিস্থানের ভাষা পশ্‌তো এবং বেলুচিস্থানে বেলুচী। এতদ্ব্যতীত কাস্পিয়ান সাগরতীরে ইরানীর শাখার কয়েকটি ভাষা কথিত হয়।

ইন্দো-ইরানীয় শাখায় ধ্বনিগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে দুইটি—

(ক) মূল ভাষার হ্রস্ব অ, এ, ও>অ এবং দীর্ঘ আ, এ, ও>আ হইয়াছে। মূলভাষার অতি হ্রস্ব অ(ə)>ই হইয়াছে। যেমন, * অপো>সং—অপ, গ্রী—অপো।

* অগো (agō)>সং—অজামি, গ্রী—অগো (agō)।

* এপি সং-অপি, গ্রী—এপি, লা—এপি।

* প্রো>সং-প্র, গ্রী—প্রো।

(খ) হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ-কার, ই-কার, ঈ-কারের পরবর্তী কণ্ঠ্য (veler) ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য (labio-veler) বর্গের ধ্বনি চ-বর্গীয় ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

যেমন * কে (que) সং-চ, আ-চ, প্রা-পা-চা। * গ্বীবোস (gwivos)> সং-জীবস্, প্রা-পা—জীব।

প্রাচীন ইরানীয় ভাষার সহিত তুলনা করিলে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়।

(ক) সংস্কৃতে ইন্দো-ইরানীয় অই>এ, অউ>ও হইল।

(গ) ইন্দো-ইরানীয় উষ্মধ্বনি জ. (z), ঝ (zh), জ.´(z´), ঝ´(z´h) সংস্কৃতে হয় লুপ্ত হইল অথবা র-কারে পরিণত হইল।

(গ) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ এই মূর্ধন্য বর্ণগুলি সংস্কৃতে সৃষ্ট হইল।

(ঘ) পূর্ব অঞ্চলে র>ল হইল।

(ঙ) "য়" বিকরণের সাহায্যে ভাব-কর্ম বাচ্যের এবং "স্য" বিকরণ যোগে ভবিষ্যৎ কালের রূপ গঠিত হইত।

আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য

ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের অন্তর্গত প্রাচীন ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া মূল ভাষার গঠন ও প্রকৃতি নির্ধারিত হইয়াছে।

মূল ভাষায় নিম্নলিখিত স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি ছিল।

(১) হ্রস্বস্বর—অ(a), ই (i), উ (u), এ (e), ও (o)।
দীর্ঘস্বর—আ (ā), ঈ (ī), ঊ (ū), এ (ē), ও (ō)।
অতি হ্রস্বস্বর—অ (ə)।

(২) অর্ধস্বর—য়্ (y), ব্ (w)।

(৩) অর্ধব্যঞ্জন—হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঋ (ṛ,ṝ); হ্রস্ব ও দীর্ঘ ৯ (ḷ,ḹ);
হ্রস্ব ও দীর্ঘ ন্ (ṇ, n̄); হ্রস্ব ও দীর্ঘ ম্ (ṃ, m̄)

(৪) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন

(ক) পুরঃকণ্ঠ্য, (Pa'atal)—ক্´, খ্´, গ্´, ঘ্´, ঙ্´ (k, kh, g, gh, ṅ)

(খ) কণ্ঠ্য বা পশ্চাৎকণ্ঠ্য (Velar)—ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ (q, qh, q, qh, ṅ)

(গ) কণ্ঠৌষ্ঠ্য (Labio-Velar)—ক্ব, খ্ব, গ্ব, ঘ্ব, ঙ্ (qw, qwh, *q*w, *q*wh, ṅ)

(ঘ) দন্ত্য ও দন্তমূলীয় (Dental ও Alveolar)—ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ (t, t , d, dh, n)

(ঙ) ওষ্ঠ্য (labial)—প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ (p, ph, b, bh, m)

(ঙ) কম্পিত-ব্যঞ্জন (trilled)—র (r)

(চ) পার্শ্বিক—(lateral)—ল্ (l)

(ছ) উষ্মব্যঞ্জন—(i) পুরঃকণ্ঠ্য, পশ্চাৎকণ্ঠ্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য—ক্', খ্', গ্', ঘ্- (x, γ)

(ii) দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—স, জ্', থ্', দ্',

(s, z, θ, δ)

মূল ভাষায় প্রথমে অঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনি খ, থ, ফ ছিল না। মূলভাষা হইতে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী বিশ্লিষ্ট হইবার পর এই ধ্বনিগুলির উদ্ভব ঘটে।

গ্রীকে মূল ভাষার অধিকাংশ স্বরধ্বনি অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য-শাখার মূলভাষায় হ্রস্ব অ, এ, ও>অ-কারে এবং দীর্ঘ আ, এ, ও>আ-কারে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য শাখার এই ধ্বনিগুলি প্রায়ই রক্ষিত আছে। যেমন, *১ অগ্রো>সং—অজ্র, গ্রী—অরগোস (argos)।

১* অগো (agō)>সং অজামি, গ্রী—অগো (agō), লা—অগো।

*মেধু (medhu)>গ্রী—মেথু, সং—মধু, লি—মেধু।

* দোমস্ (domos)>সং—দম, গ্রী—দোমস্ (domos)

* দোনম (dōnom)>সং—দানম্, লা-দোনুম্।

* ভ্রাতের (bhrāter)>সং—ভ্রাতা, গ্রী—ফ্রাতের্ (phrāter) লা—ফ্রাতের, ইং—ব্রাদার, প্রাচীন আইরিশ—ব্রাথির্, প্রা-পা-ব্রাতা, আ—ব্রাতা।

* এস্তাই (ēstāi)>সং—আস্তে, গ্রী—এস্তাই (ēstāi)।

ই, ঈ, উ, ঊ, ধ্বনিগুলি প্রায় সব ভাষাগোষ্ঠীতে রক্ষিত আছে। যেমন—*ইধি>সং—ইহি, গ্রী—ইথি; ক্বীবোস্ (qwiwos)>সং—জীবস্, লা—বীবুস (vivus); প্রা-পা—জীব।

* নূ (nu)>সং, গ্রী—নূ; ইং—নাউ (now)

ঋ, ৯—আর্য শাখায় হ্রস্ব ঋ-বজায় আছে, আর হ্রস্ব ৯>ঋ হইয়াছে। অন্যান্য শাখায় এই ধ্বনি দুইটি রক্ষিত হয় নাই। যেমন, * মৃতো (mṛto)>সং—মৃত, লা—মোরেতুস্; ওলক্বোস (wṛqwos)>সং—বৃকঃ, গ্রী—লুকোস, লা—লুপুস; ইং—ওফ্‌ল্

(wolf)। * ম্লগ্‌তোস্ (mlgtos)>সং—মৃষ্টদ্—লা—মুল্‌কতুস, ইং—মিল্‌ক (milk)

দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯ কোন ভাষাতেই পাওয়া যায় না।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ অর্ধব্যঞ্জন "ন্" ও "ম্" (ṇ, ṃ) কোন শাখাতেই বজায় নাই। আর্য ও গ্রীক শাখায় ইহারা যথাক্রমে "অ" এবং "আ" হইয়াছে।

যেমন, *ম্নতোস্ (mṇtos)>সং—মত, গ্রী—মতোস্, লা—মেন্‌তুস (mentus)।

* দেক্‌ম্ (dekṃ) সং—দশ, গ্রী—দেকা, লা—দেকেম্ (decem), ইং—টেন্ (ten)।

অর্ধস্বর "য়", "ব" গ্রীক ছাড়া প্রায় সব শাখাতেই রক্ষিত আছে। যেমন—যুগোম্ (yugom) সং—যুগম্, গ্রী—জুগোন, লা—যুগুম্, ইং-ইয়োক্ (yoke)

* ওইকোস্ (woikos) সং বেশম্, গ্রী—ওইকোস, লা—বীকুস্।

কেন্তুম্ শাখায় পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলি পশ্চাৎকণ্ঠ্য ধ্বনিগুলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু সতম্ শাখার মূল ভাষায় পুরঃকণ্ঠ্য "ক" (K) ধ্বনি "শ" অথবা "স" হইয়াছে।

* কেইতাই (keitāi) সং—শেতে, গ্রী—কেইতাই।

* দেক্‌ম (dekṃ) সং দশ, আ-দস, গ্রী—দেকা, লা-দেকেম্।

* গেনোস্ (genos) সং—জনস্, আ-জনো (zano), লা—গেনুস্ (genus), ইং—কিন্ (kin),

* এঘো(ম্) [egho(m)] সং—অহম্, আ—অজম্ (azem), প্রা-পা-অদম্, গ্রী—এগো, লা—এগো, ইং—আই (I)। পশ্চাৎকণ্ঠ্যধ্বনি সব ভাষাগোষ্ঠীতে প্রায় রক্ষিত। কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য গ্রীক, লাতীন, জার্মানিক প্রভৃতি শাখায় রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পশ্চাৎকণ্ঠ্যধ্বনির সহিত একীভূত হইয়াছে। কিন্তু মূল ভাষার কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি "ই, ঈ, এ" প্রভৃতি তালব্য স্বরধ্বনির অব্যবহিত পূর্বে থাকিলে আর্যশাখায় তালব্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই নূতন সৃষ্ট চ-বর্গের ধ্বনিগুলি **কোলিৎসের সূত্রে** (collitz's law) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন,

* লেউকোস্ (leukos) সং—লোক ; গ্রী—লেউকোস্।

* গৌস্ (gwous) সং—গৌস্, গ্রী—বোউস, লা—বোস্ (bös), ইং—কাউ (cow)।

* ক্বে (qwe) সং—চ, আ—চ, প্রা-পা-চা, গ্রী—তে, লা—ক্বে।

---

১ ভাষাতত্ত্বের বিচারে মূল ভাষায় পদ সৃষ্ট বলিয়া তারকা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে।

* গ্বিওস্ (gwios) সং—জীবস্, প্রা-পা-জীব, গ্রী—বিওস্; লা-বীবুস্, ইং—কুইক্ (quick)।

* ঘ্বেন্-তি (gwhen-ti) সং—হন্তি, আ—জৈন্তি (zainti)। দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য ধ্বনি সব শাখাতেই মোটামুটি বজায় আছে। যেমন—

* এস্তি (esti) সং—অস্তি, আ—অস্তি, গ্রী—এস্তি, লা—এস্ত্ (est), গ—ইস্ত (ist), ইং—ইজ্ (is), প্রা-পা-অস্তিয় (astiy)।

* দিদোমি (didōmi) সং—দদামি, গ্রী—দিদোমি (didōmi)

* মেধু (medhu) সং—মধু, গ্রী—মেথু, আ-মেদু (meδu)।

* এপি (epi) সং—অপি, গ্রী-এপি, আ-অইপি (aipi), লা—এপ্ (ই)।

* এভূৎ (ebhūt) সং—অভূৎ, গ্রী—এফু (ephū)

উষ্মধ্বনির মধ্যে স-কার প্রধান। যেমন,—

* ক্লুতোস্ (klutós) সং—শ্রুতস্—গ্রী—ক্লুতোস্, আ—স্রুতো (Sruto),

* গেনেসেস>গ্রীক গেনেওস, লা-গেনেরিস, সং—জনস।

মূল ভাষায় স্বরাঘাত (Pitch accent) বা শ্বাসাঘাতের (Stress accent) ফলে ধাতুর মূল স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিত। ধাতু, শব্দ অথবা প্রত্যয়ে নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে স্বরধ্বনির এই পরিবর্তনের ধারাকে **অপশ্রুতি** (Ablaut) বলা হয়। অপশ্রুত স্বরধ্বনির তিনটি ক্রম বা স্তর (grade) আছে। ধাতু বা প্রত্যয়-বিভক্তির মূল স্বরধ্বনি প্রথম ক্রমে অবিকৃত থাকে, দ্বিতীয় স্তরে ক্রমে দীর্ঘ হয়। তৃতীয় স্তরে ক্রমে হয় লুপ্ত নতুবা অতি হ্রস্ব স্বরধ্বনিতে (ə) পরিণত হয়। এই তিন ক্রম বা স্তরের যথাক্রমে নাম হইতেছে (ক) গুণিত বা সাধারণ (Strong or normal), (খ) বর্ধিত (Lengthened) এবং (গ) ক্ষয়িত (weak)।

সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ ধাতুস্বরের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এই তিনটি সংজ্ঞা দ্বারা এই পরিবর্তনের ধারাকে অভিহিত করিয়াছেন। য, র, ল, ব এই চারিটি ধ্বনি যদি যথাক্রমে ই, ঋ, ৯, উ তে পরিবর্তিত হয় তবে তাহাকে সম্প্রসারণ (Vocalisation) বলা হয়।

যেমন, ধাতু	গুণ	বৃদ্ধি	সম্প্রসারণ
√বদ্	বদতি	অনুবাদ	অনূদিত
√যজ্	যজতি	যাজয়তি	ইষ্ট

√কৃ—	করণ	কারণ	কৃত
√ভূ—	ভবতি	ভাবয়তি	অভূৎ
√নী—	নয়ন	নায়ক	নীত

ধাতুস্বরের এই পরিবর্তনের ধারা অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতেও মিলে। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মূল স্বরের পরিবর্তন ঘটিত। যেমন,—

	গুণিতক্রম	বর্ধিতক্রম	ক্ষয়িতক্রম
মূলভাষা	* পেদ (ped)	* পেদ (pēd)	প্‌দ>ব্দ (pd>bd)
	* পোদ (pod)	পোদ (pōd)	
গ্রীক—	পোদোস্ (podas)		এপিব্দই (epibdai)
„	টিথেমি (tithemi) ;	থোমস্ (thomos)	থেতোস্ (thetós)
	(সং—দধামি)	সং—ধামঃ)	(সং—হিতঃ)
লাতীন—	পেদিস্	পেস্	
„	দো (dō)	দোনুম্ (dōnum)	দতুস্ (datus)
	(সং—দদামি)	(সং—দানম্)	(সং—দত্তঃ)
সংস্কৃত—	পদস্	পাৎ	উপব্দ
	যজ্ঞ	যাগ	ইষ্টি
	স্বপ্ন	স্বাপ	সুপ্ত
ইংরেজী—	see	saw	seen

ধাতুনিহিত স্বরধ্বনির এইরূপ পরিবর্তন বাংলায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। যেমন,—

পততি	পাতয়তি	পাড়ে ;
চলতি	চালয়তি	চালে ;
ধরতি	ধারয়তি	ধারে ; ইত্যাদি।

হিন্দীতেও এইরূপ পরিবর্তন লক্ষণীয়—

যেমন—মর্‌ণা>মারণা ; নিকল্‌না>নিকাল্‌না ; খিঁচনা>খেঁচ্‌না।

মূলভাষার শব্দরূপে ও ধাতুরূপে বৈচিত্র্য ছিল।

এই বৈচিত্র্যের ধারা সংস্কৃতে ও গ্রীকে অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। শব্দরূপে তিন লিঙ্গ, তিন বচন, সম্বোধন সহ আট কারক। সর্বনামের রূপেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল। ধাতুরূপে তিনবচন, তিন পুরুষ, দুই বাচ্য—আত্মনেপদ (middle) ও পরস্মৈপদ (active) ; তিনকাল :—বর্তমান (Present), অসম্পন্ন (Imperfect) ও সম্পন্ন (Perfect) ; পাঁচ

ভাব—নির্দেশক, অনুজ্ঞা, সম্ভাবক, অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ। বাচ্য ও কাল অনুযায়ী শতৃ-শানচ (Participle) এবং অসংখ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার (Gerund ও infinitive) প্রয়োগ। মূল ভাষায় ক্রিয়ার কাল সময়-নির্দেশক ছিল না। ইহা কেবলমাত্র ক্রিয়ার প্রকৃতি প্রকাশ করিত। সম্পন্ন কালের অর্থ অনেকটা বর্তমানকালের মত ছিল। যেমন—বোইদ (woida) সং—বেদ, গ্রী—ওইদ (oida).

মূলভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীতে ক্রিয়ার সময়দ্যোতক অর্থ আসিয়াছে।

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সমাস (compound) গঠন একটা বিশেষত্ব ছিল। আর একটা বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বরাঘাত (Pitch accent)। বৈদিকে ও গ্রীকে এই স্বর প্রায় যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে স্বরের পাশাপাশি শ্বাসাঘাত ও (stress accent) আসিয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের ভাষাবর্গ

ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলিকে চারিটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়।

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম শাখা ভারতীয়-আর্য (Indo-Aryan); (খ) দ্রাবিড় শাখা (Dravidian family) (গ) অষ্ট্রিক শাখা (Austric family) (ঘ) ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বর্মী শাখা (Tibeto-Burman family); এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে যাহাদিগকে কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইহারা বিচ্ছিন্ন ভাষার (unclassified language) পর্যায়ে পড়ে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতে এই চারিটি ভাষাগোষ্ঠী ছাড়া আরও এক বা একাধিক ভাষাগোষ্ঠী ছিল যেগুলি পরে অবলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সব ভাষার কিছু শব্দ বা ইডিয়ম ভারতে বর্তমানে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই শব্দগুলিকেই দেশী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; কারণ ইহাদের ব্যুৎপত্তি প্রচলিত ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ইরানে ও ভারতে প্রচলিত আর্যভাষাসমূহ তিনটি শাখায় বিভক্ত। (১) ভারতীয়-আর্য (২) দরদীয়-আর্য (৩) ইরানীয়-আর্য। দরদীয় শাখার দুইটি প্রধান ভাষা ভারতে

প্রচলিত—পশ্‌তো (উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও আফগানিস্থান) ও বেলুচি (বেলুচিস্তান)।

॥ প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ॥

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে ভারতে সর্বপ্রথম আর্যদের আগমন ঘটে। তাহারা ইরান হইতে বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, পূর্ব-আফগানিস্থান, পশ্চিম পাঞ্জাবে ও কাশ্মীরে উপনিবিষ্ট হন। ক্রমে ক্রমে পূর্ব-পাঞ্জাব ও মধ্যদেশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। প্রাগার্য জাতিসমূহকে বিতাড়িত করিয়া আর্যদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর-ভারতে, প্রভাব বিস্তার করে এবং এইভাবে আর্যাবর্তের পত্তন ঘটে। কালক্রমে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, বরেন্দ্র-কামরূপে আর্যধর্ম ও ভাষা বিস্তারলাভ করে। দক্ষিণ-ভারতেও আর্যধর্ম ও সভ্যতার প্রসার ঘটিয়াছিল কিন্তু আর্য ভাষাসমূহ দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলিকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয় নাই। উত্তর-ভারতের সিন্ধু-গুজরাট প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে প্রাগার্য সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল বলিয়া ঐসব অঞ্চলে আর্য ভাষা ও ধর্মের প্রসার বিলম্বিত হইয়াছিল। বেদে অন্‌-আর্যগণ দাস, অসুর, কিরাত, চণ্ডাল, রাক্ষস, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

আর্যরা ছিলেন মূলতঃ যাযাবর জাতি। গো-পালন ও কৃষিকার্যই ছিল তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। দেবস্তুতিমূলক বৈদিক সাহিত্য ছিল তাহাদের প্রধান সম্পদ। বস্তুত ভারতবর্ষে আর্যভাষী জাতিসমূহের আগমনের সঙ্গে বৈদিক-সভ্যতার সৃষ্টি হয়। আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। ঋগ্বেদ রচনার সঠিক সময় অজ্ঞাত। ঋগ্বেদের সূক্তের অনেকগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঋগ্বেদের কবিতাগুলি প্রাচীন হইলেও ইহাদের রচনাকাল ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের নিকটবর্তী সময়ে অনুমান করা যাইতে পারে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অবশ্য হিট্টি ভাষায়ও কিছু কিছু প্রাচীন নিদর্শন মিলে। ভারতে আগমনকারী আর্যগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এক ভাষাগোষ্ঠী কথাবার্তায় ব্যবহার করিতেন বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যে কতকগুলি বাহির হইতে আনীত হইলেও অধিকাংশ সূক্ত পাঞ্জাবে রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষার মধ্যে পড়ে বৈদিক ও সংস্কৃত। বৈদিকযুগ তিনটি স্তরে বিভক্ত—(১) বেদ (২) ব্রাহ্মণ (৩) উপনিষদ। বেদ বলিতে সাধারণত চতুর্বেদ

বোঝায়—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। ঋগ্বেদের তুলনায় অন্যান্য বেদের ভাষা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন এবং ব্যাকরণ-রীতিও অনেকটা সহজ ও সরল। ঋগ্বেদের ভাষার সঙ্গে পরবর্তী-কালের বৈদিক যুগের ব্যাকরণগত পার্থক্য লক্ষণীয়। যেমন অর্বাচীন বৈদিকে র>ল হয়। ইহা সম্ভবত প্রগার্য-রীতি। যেমন, রোচন>লোচন; শ্রীর>শ্লীল; রম্বতে>লম্বতে। শব্দরূপে ঋগ্বেদে তৃতীয়ার বহুবচনে "ভিস্" প্রত্যয় হয়, কিন্তু অথর্ব বেদে "ঐস" প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যেমন—দেবেভিঃ; দৈবৈঃ।

বেদের সূক্তগুলি বিভিন্নকালে রচিত হইয়াছে, তবে ঋগ্বেদের সূক্তগুলিই প্রাচীন। প্রত্যেক বেদেরই একাধিক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ প্রধানত গদ্যে লেখা। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে বিবিধ যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ রহিয়াছে। বিভিন্ন উপনিষদ ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের পরিশিষ্ট। উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার অপূর্ব প্রকাশ ও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। ঋগ্বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় এবং কৌষীতকি বা শাঙ্খায়ন। প্রধান ব্রাহ্মণগুলির শেষ অংশ আরণ্যক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশেষ—ঐতরেয় আরণ্যক এবং শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের শাঙ্খায়ন আরণ্যক। ঋগ্বেদের দুইটি উপনিষদ—ঐতরেয় এবং কৌষীতকী। প্রত্যেকটি সূক্তের সঙ্গে রহিয়াছে ঋষি, দেবতা ও ছন্দ। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি ও সোম। ইহাদের উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ সূক্ত রচিত হইয়াছে।

বৈদিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া যজুর্বেদকে "কর্মবেদ" বলা হয়। এই বেদের মন্ত্র প্রধানত গদ্য। ঋগ্বেদের মন্ত্র কবিতা এবং সামবেদের মন্ত্র গীত। যজুর্বেদের দুইটি শাখা—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদে গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ পৃথক; আর কৃষ্ণ যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত। শুক্ল যজুর্বেদের পদ্যাংশ বাজসনেয়ি সংহিতা নামে পরিচিত। শতপথ ব্রাহ্মণ ইহারই অন্তর্গত। ইহা একশত অধ্যায়ে বিভক্ত। শুক্ল যজুর্বেদের দুইটি উপনিষদ্—ঈশ ও বৃহদারণ্যক। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তিনটি উপনিষদ্—তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর। "তৈত্তিরীয় সংহিতা" শাখাই সর্বাধিক প্রচলিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের পরিশেষ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

সামবেদের নয়টি ব্রাহ্মণের মধ্যে জৈমিনীয়, তাণ্ড্য এবং ছান্দোগ্য প্রধান। উপনিষদ্ দুইটি—কেন এবং ছান্দোগ্য। অথর্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত ঋগ্বেদ হইতে সঙ্কলিত। অথর্ব সংহিতায় একটি মাত্র ব্রাহ্মণ—গোপথ ব্রাহ্মণ। কোন আরণ্যক নাই। তিনটি উপনিষদ—প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। যজ্ঞ-কার্যে অথর্ববেদের কোন স্থান ছিল না। অথর্ব বেদে রোগ, শোক ও নানাবিধ ব্যাধি দূরীকরণের মন্ত্র এবং বশীকরণ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের মন্ত্রাদি রহিয়াছে। আর্য ধর্মাচার্যগণ অথর্ববেদ সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞার ভাব

পোষণ করিতেন। অথর্ববেদে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্যদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। বেদে কর্মকাণ্ডের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা মানুষকে ভোগের দিকে আকৃষ্ট করে। যাগযজ্ঞের ভিতর দিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত মানুষকে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত না হইলে শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হওয়া যায় না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই আরণ্যকের সৃষ্টি হইয়াছে। আরণ্যকের পরবর্তী স্তরেই উপনিষদ্‌গুলি রচিত হইয়াছে। উপনিষদে একটি মাত্র দার্শনিক তত্ত্ব স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আত্মা। বস্তুত হিন্দুধর্মের সমস্ত দর্শনের মূলে রহিয়াছে উপনিষদের প্রভাব।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার সাহিত্যিক রূপ ছিল দুইটি—(ক) বৈদিক-সংস্কৃতের ভাষা (খ) অবৈদিক বা লৌকিক আখ্যান উপাখ্যানের ভাষা। যে আর্য-গোষ্ঠী কর্তৃক বৈদিক ধর্ম সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের নিবাস ছিল মধ্যদেশ। তাহাদের শ্রেষ্ঠ কৃষ্টির জন্য তাহারা উত্তর-ভারতের সর্বপ্রধান জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জাতিসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আর্য ও অনার্য জাতির সংমিশ্রণের ফলে অনার্য-ভাষা দ্বারা বৈদিক সংস্কৃতের ধ্বনি ও শব্দসমূহ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইল। আর্যগণ পশ্চিম দিক হইতে যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগত পরিবর্তন দেখা গেল। যজুর্বেদে, অথর্ববেদে, ব্রাহ্মণসমূহে এমন কি ঋগ্বেদের মধ্যেও অনার্য প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষার রীতি অনুযায়ী শব্দ পাওয়া যায়—যেমন, বিকট, শিথিল, ক্ষুল্ল, মল্ল, দণ্ড, গিল্‌ প্রভৃতি। বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়কালে (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬০০ অব্দে) বঙ্গদেশ পর্যন্ত আর্যভাষা ও ধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বদেশে আর্যভাষা আদিম অনার্য জাতির অর্জিত ভাষা। এই হেতু পূর্ব অঞ্চলে আর্যভাষার পরিবর্তন পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বেশি হইল। যখন সমগ্র আর্য-ভারতে কথ্যভাষা প্রাকৃতের রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল, তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এমন একটি ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস পাইলেন, যাহা যথাসম্ভব বেদ ও ব্রাহ্মণ সমূহের প্রাচীন উপভাষাগুলির নিকটতম হয়। মধ্যদেশ ও উদীচ্য অঞ্চলের ভাষাকে ভিত্তি করিয়া এই নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল এবং ইহারই নাম সংস্কৃত (অর্থাৎ, যাঁহার সংস্কার বিধান করা হইয়াছে)। আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে পাণিনি এই ভাষায় তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তিস্বরূপ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করিলেন। পাণিনির ব্যাকরণে লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষারই সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জিত রূপটি নির্ধারিত হইয়াছে। উপনিষদের ভাষার পরবর্তী রূপটিই হইতেছে পাণিনি-নির্ধারিত সংস্কৃত। পাণিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে তক্ষশিলায় জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহার রচিত ব্যাকরণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের যে নিখুঁত বিশ্লেষণ রহিয়াছে তাহার তুলনা মিলে না। বৈদিক ভাষার নাম ছিল ছান্দস্, আর পাণিনি-সৃষ্ট সংস্কৃতের নাম হইল লৌকিক। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে উদীচ্য (উত্তর-পশ্চিম) অঞ্চলের ভাষাই বিধৃত হইয়াছে। মধ্যযুগে ইউরোপে লাতিন সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যও পণ্ডিতগণের সৃষ্টি। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বাহন সংস্কৃত ভাষা। ভারতের প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে যোগ সাধনের প্রধান উপায় হইল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানার্জন। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অপরিবর্তিত থাকিলেও ইহার শব্দ সমষ্টি, বাক্যবিন্যাস (Syntax) ও বাক্‌পদ্ধতিতে (Idiom) অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল। তথাপি ভারতীয় আর্যভাষা ও অনার্যভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত এক অদ্বিতীয় সম্মানের আসন অধিকার করিয়া রহিল। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য হইতে শক্তি ও পুষ্টি লাভ করিয়া প্রভূত পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যে যে নব-অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের অনার্যভাষাগুলিও এইভাবে সংস্কৃত ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ এ. এল. বাশাম সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"যন্ত্র সভ্যতাকে মানবজীবনের উপযোগী করিবার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা অপরিহার্য"।

সংস্কৃতকে মৃত ভাষা বলিয়া মনে করা হইলেও ইহা কখনই মৃত ভাষা ছিল না। ইহা এক সময়ে আর্য-অধ্যুষিত অঞ্চলে কথ্যভাষারূপে প্রচলিত ছিল। ব্যাকরণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার পর কতকগুলি বিষয়ে লৌকিক সংস্কৃত বৈদিক ভাষার ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। পাণিনির যুগে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ তৎকৃত পাণিনির ব্যাকরণ অনুসরণ করিতে পারে নাই। ফলে তাহাদের বোধগম্যের জন্য পুরাণ-কাহিনী ও ধর্মতত্ত্ব অসংস্কৃত লৌকিক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার স্তরে মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রভাষায় তাহাদের ধর্মপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাই **"বৌদ্ধ-সংস্কৃত"** বা **"গাথা-ভাষা"** নামে পরিচিত।

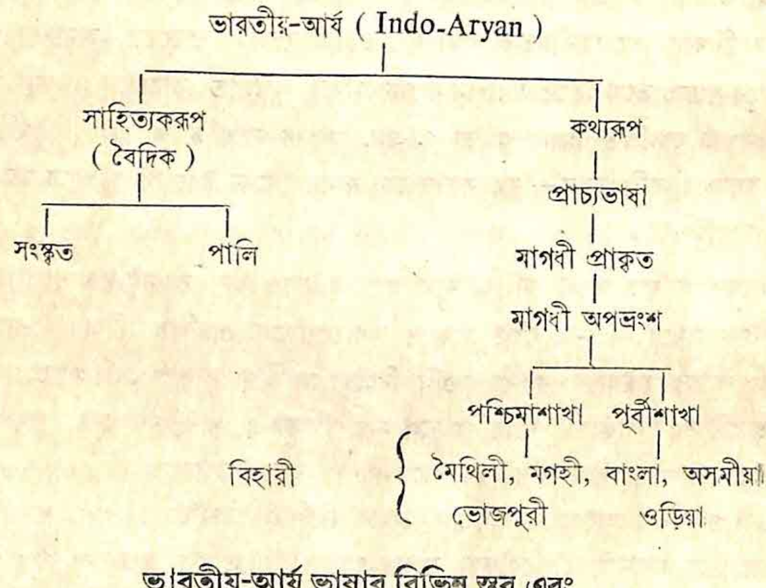
প্রাচীন ভারতীয়-আর্য হইতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি

খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রায় ৫০০ শতাব্দীতে বৈদিকের কথ্য রূপ হইতে অন্তত পাঁচটি পৃথক উপভাষা গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছিল (১) উদীচ্য (২) প্রতীচ্য (৩) মধ্যদেশীয় (৪) প্রাচ্য

(৫) দক্ষিণী বা দক্ষিণা। পরবর্তী কালে এই পাঁচটি মূল বা প্রাচীন প্রাকৃত হইতে (খ্রীষ্ট জন্মের কিছু পরে) মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রাকৃতের উদ্ভব হইল। খ্রীষ্টীয় ৬০০ শতাব্দী হইতে এই প্রাকৃতগুলি বিভিন্ন অপভ্রংশে রূপান্তরিত হয়। কালক্রমে আঞ্চলিক অপভ্রংশসমূহ পরিবর্তিত হইয়া বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষায় পরিণত হয়। আমরা ঋগ্বেদের সময় হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত ভারতীয়-আর্য ভাষার ক্রমবিবর্তনের অবিচ্ছিন্ন ধারাটি পাইতেছি। অতএব ভারতীয়-আর্য ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস।

আধুনিক বাংলা ভাষার উৎপত্তি এইরূপ :—

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য (কথ্যরূপ) > পূর্বী প্রাচ্য > মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ। মাগধী অপভ্রংশের পূর্বী শাখা হইতে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া এবং পশ্চিমা-শাখা হইতে মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী প্রভৃতি বিহারী ভাষাগুলির উদ্ভব হইয়াছে।



ভারতীয়-আর্য ভাষার বিভিন্ন স্তর এবং প্রত্যেক স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ভারতীয়-আর্যভাষার ইতিহাসকে তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে বিভক্ত করা হয়।

(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য (Old Indo-Aryan) (বৈদিক-সংস্কৃত) খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত।

(খ) মধ্য ভারতীয়-আর্য (Middle Indo-Aryan) (পালি, অশোকের অনুশাসন ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, সাহিত্যিক প্রাকৃত ও অপভ্রংশ)—খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত।

(গ) নব্য ভারতীয়-আর্য (New Indo-Aryan) (বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, সিন্ধী কাশ্মীরী প্রভৃতি ভাষা সমূহ)—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্যের বৈশিষ্ট্য

আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আর্যগণের ভারতে আগমনের পর আর্য ভাষা যে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমরা ঋগ্বেদে পাই।

বৈদিকযুগের ভাষার বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হইল :—

(১) ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং তিনটি স-কার সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল।

(২) স্বরধ্বনির গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হইত।

(৩) দুই সন্নিহিত স্বরধ্বনির মিলন অর্থাৎ সন্ধি হইত।

(৪) বৈদিকে স্বরাঘাত (Pitch accent) একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ; এই স্বরের স্থান পরিবর্তনে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিত।

(৫) বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জন বৈদিক বর্ণমালার সম্পদ।

(৬) শব্দরূপেরও বিপুল বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিশেষ্য, সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, তাহাদের আবার স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, ইত্যাদি ভেদে বহুরূপ ছিল। এমন কি একই ক্ষেত্রে কোন শব্দের এক, দুই বা ততোধিক রূপ ছিল। সম্বোধন ব্যতীত সাত কারক ছিল।

(৭) ধাতুরূপেরও বিরাট সমাবেশ দেখা যায়। পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ, দুই বাচ্য (কর্তৃবাচ্য, কর্ম-ভাব বাচ্য,), পাঁচকাল, পাঁচভাব, ও বহু অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল। অতীত কাল ছিল তিন প্রকার—লঙ্ (Present perfect), লঙ্ (Past) ও লিট্ (Past perfect)।

(৮) বৈদিকে প্র, পরা, অপ, আ প্রভৃতি উপসর্গগুলি স্বতন্ত্র পদরূপে ব্যবহৃত হইত।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে বৈয়াকরণ পাণিনি উদীচ্য ও মধ্যদেশীয় ভাষাকে ভিত্তি করিয়া লৌকিক সংস্কৃতের কাঠামোটি গড়িয়া ছিলেন। বৈদিক ও সংস্কৃতের ব্যাকরণে পার্থক্য রহিয়াছে। বৈদিকে শব্দরূপে ও ধাতুরূপে বৈচিত্র্য দেখা যায়। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপে বৈদিকে কতকগুলি অতিরিক্ত পদ আছে।

যেমন নরশব্দের প্রথমা-দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে "নরা", প্রথমার বহুবচনে "নরাসঃ", তৃতীয়ার একবচনে "নরা" ও বহুবচনে "নরেভিঃ" এই অতিরিক্ত রূপগুলি পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদিকে ও সংস্কৃতে শব্দরূপ প্রায় এক। ধাতুরূপে বৈদিকে বৈচিত্র্য আরো বেশি। বৈদিকে (mood) ছয়টি—(১) নির্দেশক (২) অনুজ্ঞা (৩) সম্ভাবক (৪) বিধিলিঙ্ (৫) অভিপ্রায় (৬) নির্বন্ধ (Injunctive)। কিন্তু সংস্কৃতে প্রথম চারিটি ভাব পাওয়া যায়। বৈদিকে অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষের রূপ ছিল না। সংস্কৃতে নির্বন্ধ ভাবের প্রয়োগ নিষেধার্থক "মা" অব্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বৈদিকে অসম্পন্ন (লঙ্), সামান্য (লুঙ্) এবং সম্পন্ন (লিট্) এই তিন অতীত কালেরই প্রয়োগ ছিল। সংস্কৃতে বর্তমান কালের এবং সামান্য অতীত কালের ভাব হয়। কিন্তু বৈদিকে বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই চারিকালেই বিভিন্ন ভাবের রূপ হইত। বৈদিকে শতৃ-শানচ্, ক্বসু-কানচ্, স্যতৃ-স্যমান প্রভৃতি ক্রিয়াজাত বিশেষণের প্রাচুর্য ছিল। এতদ্ব্যতীত ক্ত্বাচ্-ল্যপ্, তুম্-তবৈ প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু সংস্কৃতে এইগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া কয়েকটীতে পরিণত হইল। বৈদিকে উপসর্গগুলি পৃথক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু সংস্কৃতে এইগুলি ক্রিয়ার পূর্বে যুক্ত হইল। বৈদিকে সাধারণত দুইটি পদ নিয়া সমাস গঠিত হইত। কিন্তু সংস্কৃতে সমাসের আড়ম্বর অনেক বেশি ছিল। দুই-এর বেশি পদে সমাস গঠিত হইতে কোন বাধা ছিল না।

মধ্য ভারতীয়-আর্যের বৈশিষ্ট্য

ভাষার পরিবর্তন ধর্মের নিয়ম অনুসারে আর্যগণের ভাষা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে একটা নূতন রূপ প্রাপ্ত হইল। এই যুগকে বলা যায় **মধ্য ভারতীয়-আর্য বা প্রাকৃত।** এই যুগের প্রথম স্তরে **"পালি"** নামক একটি সাহিত্যিক ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর ধর্মীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান নিয়া পালি ভাষা সৃষ্ট হয়।

মধ্য ভারতীয়-আর্যের সাধারণ লক্ষণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

(১) স্বর ও ব্যঞ্জনের সংখ্যা হ্রাস। "ঋ" স্বরধ্বনির অ, ই, উ, এ তে পরিবর্তন। ঐ, ঔ ধ্বনি যথাক্রমে "এ" এবং "ও" ধ্বনিতে পরিবর্তিত। যুগ্মব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী "এ", "ও" ধ্বনির হ্রস্বতা প্রাপ্তি। সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিণত।

(২) পদের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সরলীকরণ। পদমধ্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি স্বরভক্তির সাহায্যে বিশ্লিষ্ট অথবা সমীভবনের ফলে যুগ্মব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত।

(৩) অনুস্বার ব্যতীত পদান্তস্থিত ব্যঞ্জন-ধ্বনির লোপ।

(৪) তিন স-কারের মধ্যে "স" অথবা 'শ' এর ব্যবহার।

(৫) পদমধ্যস্থিত অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন-ধ্বনির লোপ, মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন-ধ্বনির হ্-কারে রূপান্তর।

(৬) শব্দরূপে সরলতা বিধান। দ্বিবচনের লোপ। অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দরূপের পদ-সাধন। ঋ-কারান্ত শব্দরূপের লোপ। অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমা-দ্বিতীয়ার পার্থক্য লুপ্ত। চতুর্থী বিভক্তির লোপ। পঞ্চমীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ।

(৭) ধাতুরূপে দ্বিবচনের লোপ। আত্মনেপদের ব্যবহার লুপ্ত। লিট্ কালের লোপ। লঙ্ ও লুঙ্ কালের মিশ্রণ এবং পরবর্তীকালে লোপ।

(৮) অসমাপিকার বৈচিত্র্য হ্রাস। নিষ্ঠান্ত-ত,-তব্য প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত-কালের পদ-গঠন।

(৯) বিভক্তির অর্থে বিভিন্ন অনুসর্গের প্রয়োগ।

(১০) শ্বাসাঘাতের (Stress accent) পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

(১১) ছন্দঃ পদ্ধতি মাত্রামূলক।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দী হইতে দশম-শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের আরও পরিবর্তন ঘটিল। প্রাকৃত যুগের এই শেষস্তরের নাম দেওয়া হইয়াছে অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট। অপভ্রংশযুগে ব্যাকরণ আরও সহজ হইল। শুধু শৌরসেনী ও নাগরক অপভ্রংশের নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় যে অন্যান্য প্রাকৃতেরও অপভ্রংশ স্তর ছিল। বিভিন্ন অপভ্রংশ হইতে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে।

নব্য ভারতীয়-আর্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

নব্য ভারতীয়-আর্যের সাধারণ লক্ষণগুলি নিম্নে নির্দেশিত হইল :—

১। যুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমীকরণ এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীকরণ।

২। পদমধ্যস্থিত সন্নিকৃষ্ট স্বর-ধ্বনির সন্ধি।

৩। প্রাচীন বিভক্তির স্থলে নূতন বিভক্তির আগম এবং কারকের অর্থ জ্ঞাপনের জন্য অনুসর্গের ব্যবহার।

৪। ক্লীবলিঙ্গের লোপ-প্রবণতা।

৫। প্রাচীনকালের মধ্যে কেবলমাত্র বর্তমান ও অনুজ্ঞার প্রয়োগ। যৌগিক কালের প্রচলন।

৬। নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের পদ গঠন।

৭। ছন্দ পদ্ধতি সমমাত্রিক ও মাত্রামূলক, আবার কখনো কখনো অক্ষরমূলক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার সাধারণ লক্ষণ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতীয়-আর্যভাষা দ্বিতীয়স্তরে প্রবেশ করিল। এই যুগকেই বলা হয় প্রাকৃত-অপভ্রংশের যুগ। প্রাকৃত-ভাষা হইতেছে সাধারণ জনগণের বোধগম্য ভাষা। সংস্কৃত প্রাকৃতে রূপান্তরিত হইলে প্রধানত ধ্বনিতে, শব্দরূপে ও ধাতুরূপে এবং পদক্রমে পরিবর্তন সূচিত হইল।

(১) ধ্বনিগত পরিবর্তন।

(১) স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা হ্রাস। "ঋ" স্বরধ্বনির 'অ, ই, উ, এ-তে পরিবর্তন। যেমন—মৃগ>মিগ, মুগ ; মৃত>মট ; মৃণাল>মুণাল ; গৃহ>গেহ ; বৃদ্ধ> বুড্ঢ।

"ঋ" অনেক সময় 'র, রি, রু' রূপে উচ্চারিত হইয়াছে—বৃক্ষ>রুক্খ, রুচ্ছ ; মৃগ>ম্রিগ, ম্রুগ।

(২) ঐ>এ ; ঔ>ও—শৈল>সেল ; ঔষধানি>ওসধানি।

(৩) অয়>এ ; অব>ও—পূজয়তি>পূজেদি, পূজেই ; ভবতি>ভোদি, হোদি ; অবতার্য>ওদালিঅ।

(৪) সংযুক্ত ব্যঞ্জন এবং পদান্ত অনুস্বারের পূর্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইয়াছে—দীর্ঘ>দিগ্ঘ ; কাব্যং>কব্বং।

(৫) পদান্ত অ-কারের পর বিসর্গ থাকিলে ও-কার হইয়াছে, মাগধী প্রাকৃতে এ-কার হইয়াছে। অন্য স্বরের পর বিসর্গ লুপ্ত হইয়াছে।

যেমন, পুত্রঃ>পুত্তো ; ঈশ্বরঃ>ঈশলে ; দেবেভিঃ>দেবেহি ; ক্ষণঃ>ছণো।

(৬) যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে আ>অ হয়—দীর্ঘ>দিগ্ঘ ; কান্তাম্>কন্তং।

(৭) পদের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সরলীকরণ। পদমধ্যস্থিত যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরভক্তির সাহায্যে বিশ্লিষ্ট অথবা সমীভবনের ফলে যুগ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনিতে পরিণত। যেমন, ত্রীণি>তিন্নি ; স্ত্রী>ইত্থি ; অস্তি>অত্থি ; অগ্নি>অগ্গি ; হস্ত>হত্থ ; সত্য>সচ্চ ; ক্ষুদ্র>খুদ্দ, ছুদ্দ ; দৃষ্টি>দিট্ঠি।

(৮) অনুস্বার ব্যতীত পদান্তস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ—পশ্চাৎ>পচ্ছা ; অপসৃত> ওসরিঅ ; কল্পাৎ>কপ্পা ; তৎ>ত।

(৯) য-কারের লোপ।

(১০) একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্বস্বরের দীর্ঘতা—পরিষৎ>পরিসা; অর্হৎ> অরূহা; সিংহ>সীহ।

(১১) ঋ, র, ষ ধ্বনির সংস্পর্শে দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্য বর্ণে রূপান্তর—কৃত>কত>কট; মৃত্তিকা>মট্টিআ; প্রতিমা>পডিমা।

(১২) অনাদিস্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণ আদিস্বরের লোপ—ইদানীং>দাণিং; অপিহিত>পিহিত; অরণ্যং>রণ্ণং; অপি>পি, বি।

শব্দরূপে অধিকাংশ শব্দের অ-কারন্তের মত রূপ হইল। এক শব্দরূপের সাদৃশ্যে অন্ত শব্দের রূপ গঠন করিবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছিল। চতুর্থী ও ষষ্ঠী মিশিয়া গিয়াছিল। পুংলিঙ্গে দ্বিতীয়ার বহুবচনে সাধারণত ক্লীবলিঙ্গের প্রথমা-দ্বিতীয়ার বহুবচন অথবা পুংলিঙ্গের বহুবচন প্রযুক্ত হইত।

প্রাকৃতের ধাতুরূপে সংস্কৃতের বৈচিত্র্য হ্রাসপ্রাপ্ত। ধাতুর সঙ্গে বিকরণ **(Infix)** একীভূত হইয়াছে। যেমন—জি+না=জিণ।

প্রায় সকল ধাতুরই রূপ ভ্বাদিগণীয় ধাতুর মত। দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষা ব্যতীত অন্যত্র আত্মনেপদ লুপ্ত। লোট্ ও বিধিলিঙ্ ব্যতীত অন্য ভাবগুলিও বিলুপ্ত। অপভ্রংশ-স্তরে বিভিন্ন কারকের অর্থে অনুসর্গের প্রয়োগ। ছন্দঃপদ্ধতি মাত্রামূলক।

মধ্য ভারতীয়-আর্য বা প্রাকৃত (Middle Indo-Aryan)

প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত **"প্রাকৃত"** শব্দটির অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে।

(১) প্রাকৃত জনের অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষা; (২) প্রকৃতির ভাষা অর্থাৎ মূল ভাষা। শিষ্ট সমাজে মনে করা হইত যে সংস্কৃত ভাষাই "প্রকৃতি" (প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্); অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ভাষা ও আদি ভারতীয়-আর্য যুগের সমস্ত উপভাষাকে যদি ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত প্রাকৃতের মূলে রহিয়াছে সংস্কৃত, তাহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত বলিতে যদি আমরা পাণিনি-পতঞ্জলির "লৌকিক" ভাষার কথা বলি, তাহা হইলে প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক বিচারে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, বৈদিক-সংস্কৃতের পাশাপাশি সাধারণ লোকের কথ্য ভাষারূপে প্রাকৃত ভাষাগুলির বিকাশ হইতেছিল। "প্রাকৃত জনানাং ভাষা প্রাকৃতম্"। বৈদিক ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, যাহা লৌকিক সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, তাহা প্রাকৃত ভাষায় লক্ষণীয়। আবার বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে এমন কতকগুলি শব্দ ও প্রয়োগ-রীতি রহিয়াছে যাহার মূলে আছে প্রাকৃত প্রভাব।

মধ্য-দেশীয় প্রাচীন উপভাষা হইতে লৌকিক সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছিল। পাণিনির সময়ে অবশ্য উচ্চশ্রেণীর সম্প্রদায় কথ্য ভাষারূপে সংস্কৃত ব্যবহার করিতেন। কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করিতেন। কালক্রমে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। এই হেতু এই ভাষার কোন বিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। গ্রীয়ার্সন আদ্য ভারতীয় আর্য (OIA), মধ্য ভারতীয়-আর্য (MIA) এবং নব্য ভারতীয়-আর্য (NIA) এই তিনটি স্তরকে যথাক্রমে প্রাথমিক প্রাকৃত (Primary Prakrit), মধ্য প্রাকৃত (Secondary Prakrit) এবং অন্ত্যপ্রাকৃত (Tertiary Prakrit) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মধ্য ভারতীয়-আর্যের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর রহিয়াছে। প্রথম স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। দ্বিতীয় স্তরের স্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী। তৃতীয় স্তরের স্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে দশম শতাব্দী।

প্রথম স্তরের নিদর্শন হইতেছে পালি, অশোকের অনুশাসনসমূহ এবং অন্যান্য প্রত্নলিপি। দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন হইতেছে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম তিন শতাব্দীর বিভিন্ন প্রত্নলিপি, নিয়াপ্রাকৃত এবং মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি সাহিত্যিক প্রাকৃত এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত। তৃতীয় স্তরের নিদর্শন পাই অপভ্রংশে।

প্রথম স্তর—অশোক অনুশাসনগুলির মধ্যে খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর চারিটি প্রধান উপভাষার পরিচয় মিলে—(১) উত্তর-পশ্চিমা (শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মানসেহ্‌রা অনুশাসন); (২) দক্ষিণ-পশ্চিমা (গির্ণার অনুশাসন); (৩) প্রাচ্যা-মধ্যা (কালসী ও অন্যান্য অনুশাসন); (৪) প্রাচ্যা (ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন)। প্রথম দুইটি অনুশাসন খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। অপর অনুশাসনগুলি ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ।

উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য) প্রাকৃতের সহিত বৈদিক সংস্কৃতের বেশী মিল দেখা যায়। কারণ উদীচ্য অঞ্চলেই আর্যগণ প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তাহাদের কথ্য ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের আদর্শ হইতে বেশী ভ্রষ্ট হয় নাই।

(১) **উত্তর-পশ্চিমার** প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই—

(ক) র-কার ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি রক্ষিত আছে। যেমন, প্রিয়, অস্তি, প্রজা।

(খ) য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সমীভবন ও সরলীকরণ—যেমন, কল্যাণম্>কল্লাণং> কলণং; কর্তব্যঃ>কটব্বো>কটবো; প্রিয়স্য>প্রিয়স।

(গ) স্ম, স্ব>স্প—যেমন, স্বামিকেন>স্পামিকেন; বিনীতস্মিন্>বিনিতস্পি।

(ঘ) "শ" এবং ক্বচিৎ "ষ" এর ব্যবহার। যেমন, প্রিয়দশিস, দোষং।

(ঙ) ঋ>রি, রু—মৃগঃ>মুগো, ম্রিগে।

(২) দক্ষিণ-পশ্চিমার সঙ্গেও বৈদিক সংস্কৃতের সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই—

(ক) ব-কার ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বজায় আছে—যেমন, সর্বত্র, অস্তি।

(খ) ত্ব, ত্ম>ৎপ হইয়াছে—যেমন, আত্ম>আৎপ ; চত্বার>চৎপারো।

(গ) অন্তঃস্থ "ব" বর্গীয় "ব" হইয়াছে—যেমন, দ্বাদশ>দবাদস।

(ঘ) দৃ>রি হইয়াছে—যেমন, এতাদৃশ>এতারিশ ; যাদৃশ>যারিস।

(ঙ) শ, ষ>স হইয়াছে।

(চ) সপ্তমীর—স্মিন্>ম্‌হি হইয়াছে—যেমন, তস্মিন্>তম্‌হি ; ধর্মস্মিন্>ধম্মম্‌হি।

(ছ) আত্মনেপদের ব্যবহার কখনো কখনো দৃষ্ট হয়—যেমন, আরভরে, মঞতে।

(জ) অনেক ক্ষেত্রে অয়>এ, অব>ও হয় নাই। ভবতি ও হোতি—দুইটির প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৩। **প্রাচ্য-মধ্যার** বিশেষত্ব হইতেছে এই—

(ক) র>ল হয়—যেমন, রাজা>লাজা ; করোতি>কলেতি।

(খ) শ ও ষ এর কদাচিৎ প্রয়োগ।

(গ) পদান্তস্থিত বিসর্গযুক্ত "অ-কার" "এ-কারে" পরিণত হয়। আবার পদমধ্যস্থিত ও-কারের এ-কারে পরিবর্তন ও ক্বচিৎ দেখা যায়। যেমন—একে মিগে=একঃ মৃগঃ, করোতি>কলেতি।

(ঘ) অনেকস্থলে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সমীভবন হয়। যেমন, সর্বত্র>সব্বত্ত ; অস্তি>অত্থি ; অদ্য>অজ্জ ; সত্য>সচ্চ।

(ঙ) কখনো কখনো ত্য>তিয়, ব্য>বিয় হয়।
যেমন, অপত্য>অপতিয় ; কর্তব্য>কটবিয়।

(চ) স্ফ>প্‌ফ হয়। যেমন, তস্মাৎ>তপ্‌ফা।

(ছ) ক্ষ>ক্‌খ, ভূ>হু হয়। যেমন, ভবতি>হোতি।

(জ) কখনো কখনো ব-ফলার সম্প্রসারণ ঘটে—যেমন, দ্বাদশ>দুবাদশ, শ্বঃ>সুবে।

(ঝ) আত্মনেপদ শানচ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

(ঞ) স্বার্থিক "ক", "কি" প্রত্যয়ের প্রয়োগ—দেবদশিকি>দেবদাসী।

(ট) ক>গ-লোকং>লোগং।

(৪) প্রাচ্য—প্রাচ্য-মধ্যার সঙ্গে প্রাচ্য ভাষার অনেক মিল আছে। বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হইতেছে এই—

(ক) পদান্ত অ-কারের পর বিসর্গ থাকিলে "এ" হয়।

(খ) পদমধ্যস্থিতও>এ হয়।

(গ) র>ল হয়।

(ঘ) তিন স-কারের মধ্যে একমাত্র "স" এর ব্যবহার।

(ঙ) উত্তম পুরুষ সর্বনামের পদ "অহম্" স্থানে "হকং" হয়।

অশোক অনুশাসনের সমসাময়িক রামগড় পাহাড়ে অবস্থিত যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত "সুতনুকা" লিপির সঙ্গে পূর্বী-প্রাচ্য বা মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। যেমন, র>ল, স, ষ>শ ; পুংলিঙ্গ প্রথমবার এক বচনে-"এ" বিভক্তির প্রয়োগ। মাগধী প্রাকৃতের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি এখানে পাওয়া যাইতেছে। প্রত্নলিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শুতনুক নম দেবদশিকি
তং কময়িথ বলন শেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।"

অর্থাৎ—সুতনুকা নামে দেবদাসী। বারাণসী নিবাসী দেবদিন নামে রূপদক্ষ তাহাকে কামনা করিয়াছিল।

ওড়িশায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরি পাহাড়ে হাতিগুম্ফায় প্রাপ্ত খারবেলের অনুশাসনটিও বিশেষ মূল্যবান। ইহা ব্রাহ্মী হরফে লিখিত। ইহাতে প্রাচ্য অঞ্চলের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও পশ্চিমার কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায়। যেমন, শ>স ; পদান্ত বিসর্গযুক্ত অ>ও হয়।

পালি শব্দের অর্থ ঃ—

বুদ্ধ ঘোষের অত্থকথাতে (অর্থকথা) সর্বপ্রথম "পালি" শব্দ পাওয়া যায়। পালি শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান। পালি শব্দের অর্থ পংক্তি। বচন পংক্তি বা অক্ষর পংক্তি এবং মূলগ্রন্থ বুঝাইতে পালি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন পল্লী শব্দ হইতে পালি আসিয়াছে। পালি শব্দের মূল অর্থ "চতুঃসীমা, সীমা বা রেখা"। পালি যে ধর্মগ্রন্থের ভাষা ইহা হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক যে কোন গ্রন্থই পালি নামে আখ্যাত হইয়াছে।

হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ এবং সেই গ্রন্থসমূহের ভাষা পালি নামে পরিচিত হইলেও কোন কোন পণ্ডিত প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাকেই পালি বলিয়া থাকেন। Woolner অশোকের শিলালিপির উপভাষাগুলিকেও পালির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, পালি বলিতে এমন একটি ভাষা বুঝায়, যাহাতে মূল বৌদ্ধবচন ও হীনযান বৌদ্ধাবলম্বীদের ধর্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল ঃ—পালি কোন্ অঞ্চলের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণকে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় ধর্মপ্রচার করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। পালির অপর নাম মাগধী। এই হেতু অনেকে মগধকেই পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। উজ্জয়িনীর অধিবাসী অশোকের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহিন্দ (মহেন্দ্র) পালিভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহ প্রথমে সিংহলে নিয়া যান। Westergard এবং E. Khun মনে করেন, পালি উজ্জয়িনী অঞ্চলের ভাষা। তাছাড়া, গির্ণারস্থিত অনুশাসনের ভাষার সহিত উজ্জয়িনীর ভাষার মিল আছে। R. A. Franke এবং Sten Konow উভয়েই পালিকে বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্তী কোন অঞ্চলের ভাষা বলিয়া মনে করেন। কারণ পালির সঙ্গে পৈশাচী প্রাকৃতের কোন কোন বিষয়ে মিল রহিয়াছে। Oldenberg মনে করেন, পালির উৎপত্তিস্থল কলিঙ্গদেশ। কারণ বৌদ্ধগণ সর্বপ্রথম কলিঙ্গদেশ হইতেই ধর্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত সিংহলে যান। ওড়িশায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরি পাহাড়ে হাথিগুম্ফায় যে অনুশাসন পাওয়া যায়, তাহার সহিত পালি ভাষার মিল আছে। E. Mullerও এই মত সমর্থন করেন। পালির ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে পালির সঙ্গে প্রাচীন শৌরসেনী প্রাকৃতের সাদৃশ্য রহিয়াছে। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কোন উপভাষা হইতে পালিতে অনেক পুরাতন শব্দও গৃহীত হইয়াছে।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, পালি অর্ধমাগধী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাচ্যা-মধ্যার মত পালিতেও র>ল হয় এবং বিসর্গযুক্ত অ-কার>এ-কার হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত কোন মতকেই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত পালিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান রহিয়াছে। এজন্য পালিকে কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা বলা যায় না। একটা ধর্মীয় সাহিত্যিক ভাষারূপেই ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল এবং বৌদ্ধদের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। এই ভাষাতেই বুদ্ধের উপদেশাবলী অনূদিত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন সঙ্ঘারামে যে সকল বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন, তাহাদের সকলের নিকটই পালি ছিল বোধগম্য একটা সাধারণ ভাষা।

সেই যুগের মহাযান-পন্থী বৌদ্ধেরা সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রভাষায় তাহাদের ধর্মপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা **"বৌদ্ধ-সংস্কৃত" বা "গাথা ভাষা"** নামে পরিচিত। 'মহা-বৈপুল্যসূত্রম্', 'ললিত-বিস্তর', 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের প্রত্নলিপিগুলির অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যখন লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা দিল, তখন সর্বসাধারণের

উপলব্ধির জন্য সংস্কৃতের আশ্রয় নেওয়া হইল। এই হেতু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে যে সমস্ত প্রত্নলিপি লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতে লেখা।

মধ্য ভারতীয়-আর্য—দ্বিতীয়স্তর

এই স্তরের ধ্বনিগত একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে স্বরমধ্যস্থিত স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইল এবং মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি হ-কারে পরিণত হইল। যেমন, ধিত>হিত ; *ইধি>ইহি।

প্রাকৃতের মধ্যস্তরকে আবার তিনটি উপস্তরে ভাগ করা হয়। আদি উপস্তরের স্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ। বিভিন্ন প্রত্নলিপি, অশ্বঘোষের নাটক এবং খরোষ্ঠী ধম্মপদে এই সময়কার ভাষার নিদর্শন মিলে। অশ্বঘোষের নাটকের প্রাকৃত অংশে পরবর্তীকালের সাহিত্যিক প্রাকৃত শৌরসেনী-মাগধীর পূর্বরূপটি দৃষ্ট হয়। **খরোষ্ঠী ধর্ম্মপদ** মধ্য এশিয়ার খোটানে পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমার সাদৃশ্য আছে। এই স্তরের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হইতেছে-স্বরমধ্যস্থিত অঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির ঘোষবৎ ধ্বনিতে রূপান্তর। যেমন—ভোদি, হোদি<ভবতি ; জধা<যথা।

মধ্য উপস্তরের কালসীমা হইতেছে আনুমানিক ১০০-৩০০ খ্রীষ্টাব্দ। চীনীয় তুর্কিস্থানে প্রাপ্ত **"নিয়া প্রাকৃতে"** ও শক-কুষাণদের খরোষ্ঠী প্রত্নলিপিতে এই সময়ের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমা বা গান্ধারী উপভাষায় এইগুলি লিখিত। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বর মধ্যস্থিত ঘোষবৎ ব্যঞ্জন ধ্বনির উষ্মবর্ণে পরিবর্তন। যেমন, ভগবতো<ভগ·বতঃ ; নগ·রকস<নগরকস্য।

নিয়া প্রাকৃত প্রধানত খরোষ্ঠীতে এবং অল্পস্বল্প ব্রাহ্মীতে লিখিত। এই প্রাকৃতে স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনির উষ্মীভবন আরো ব্যাপকভাবে হইয়াছে। যেমন—অনেগ·<অনেক, পহুড·<প্রভূত, অবগ·জ·<অবকাশ।

অন্ত্য উপস্তরে স্বরমধ্যস্থিত উষ্মীভূত অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইল এবং মহাপ্রাণ বর্ণ হ-কারে পরিণত হইল।

যেমন, মঅ<মগ·<মৃগ ; সঅল<সগ·ল<সকল ; লহু<লঘু ; জহা<যথা। এই উপস্তরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে সাহিত্যিক প্রাকৃত। প্রাকৃত বলিতে সমগ্র মধ্য **ভারতীয়-আর্য** ভাষাকে বুঝাইলে ও বররুচি, হেমচন্দ্র প্রমুখ বৈয়াকরণেরা সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতেরই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাটকে ও জৈন সাহিত্যে এবং গাথা সপ্তশতী, সেতুবন্ধ, গৌড়বধ প্রভৃতি কাব্যে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতের নিদর্শন পাই। মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী অর্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচী প্রাকৃত হইতেছে মূলত সাহিত্যিক

প্রাকৃত। মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী দক্ষিণ-পশ্চিমা ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্ধমাগধী ও মাগধীর মূলে ছিল যথাক্রমে মধ্য-প্রাচ্যা ও প্রাচ্যা। উত্তর-পশ্চিমার সঙ্গে পৈশাচীর নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। সাহিত্যিক প্রাকৃত কথ্যভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত না।

বৈয়াকরণেরা মহারাষ্ট্রীকে মূল প্রাকৃত ধরিয়া অন্যান্য প্রাকৃতের বিচার করিয়াছেন। দণ্ডী কাব্যাদর্শগ্রন্থে বলিয়াছেন—মহারাষ্ট্র দেশের ভাষাকেই উত্তম প্রাকৃত বলিয়া জানিবে। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত কবিতাগুলির অধিকাংশই মহারাষ্ট্রীতে লেখা। গাথা সপ্তশতী (গাহা সত্তসঈ), রাবণবধ (রাবণবহো), গৌড়বধ (গৌউড়বহো) প্রভৃতি প্রাকৃত কাব্যের ভাষাও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। গোদাবরী প্রদেশের কথ্য ভাষা অবলম্বনে এই প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীতে স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যাপক লোপ ঘটিয়াছে। শব্দও ধাতুরূপে কিছু কিছু প্রাচীনত্বের নিদর্শন এই প্রাকৃতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রীর সঙ্গে শৌরসেনীর বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে শৌরসেনীতে সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষণীয়। মধ্যদেশ সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানেই শৌরসেনী প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল। শৌরসেনীতে স্বরমধ্যস্থিত দ-কার ও ধ-কার লুপ্ত হয় নাই। এখানেই মহারাষ্ট্রীর সঙ্গে শৌরসেনীর মৌল তফাৎ রহিয়াছে। যেমন, গচ্ছদি (শৌ), গচ্ছই (মহা) <গচ্ছতি; কধেদি (শৌ), কহেই (মহা) <কথয়তি। শৌরসেনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে সপ্তমীর একবচনে—ম্হি<—স্মিন্ (মহারাষ্ট্রীতে-ম্মি) বিভক্তির প্রয়োগ।

মহারাষ্ট্রীতে বৈদিক স্বরাঘাত এবং শৌরসেনীতে লৌকিক সংস্কৃতের শ্বাসাঘাত রক্ষিত হইয়াছে। স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মাধুর্য সমধিক। এজন্য নাটকে প্রাকৃত গানগুলি এই প্রাকৃতে রচিত। কারণ গানে সুর, মাধুর্য এবং আবেগই প্রধান বিচার্য।

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে নির্দেশিত হইল :—

(ক) স্বরমধ্যবর্তী অল্পপ্রাণ অঘোষ ব্যঞ্জনের লোপ।

যথা—প্রাকৃত>পাউঅ; লতা>লআ; প্রভৃতি>পহুই; হৃদয়>হিঅঅ।

(খ) স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ বর্ণের হ-কারে রূপান্তর।

যেমন, কথম্>কহং; মুখ>মুহ; মেঘ>মেহ; অভিনব>অহিনব; নাথ>ণাহ; রুধির>রুহির।

(গ) ক্ষ>চ্ছ হয়।

যেমন, ইক্ষু>উচ্ছু; কুক্ষি কুচ্ছি; প্রেক্ষতে>পেচ্ছই।

(ঘ) স>হ—তস্য>তাহ ; পাষাণ>পাহাণ।

(ঙ) কর্মবাচ্যের 'য' বিকরণ>ইজ্জ হয়।

যথা, গম্যতে>গমিজ্জই ; যুজ্যতে>জুজ্জই।

(চ) সপ্তমী বিভক্তির স্মিন্>স্মি হয়।

যথা, পুত্রস্মিন্>পুত্তস্মি।

(ছ) তুম্>উম্—কর্ত্তুম্>কাউং।

শৌরসেনী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য ঃ—

(ক) স্বরমধ্যবর্তী দ-কার ও ধ-কার রক্ষিত।

যথা—মরকত>মরগদ ; প্রভৃতি>পহুদি ; কথম্>কধং ; নাথ>ণাধ।

(খ) ক্ষ>ক্খ—ইক্ষু>ইক্খু ; প্রেক্ষতে>পেক্খদি ; দক্ষিণ>দক্খিণ।

(গ) কর্মবাচ্যের 'য' বিকরণ>ঈয় হয়—গম্যতে>গমীয়দি ; দীয়তে>দিজ্জদি ; যুজ্যতে>জুজ্জদি।

(ঘ) ক্ত্বা>ইয়, উঅ—কদুঅ, করিত=কৃত্বা।

(ঙ) তুম্>দুম্—কর্ত্তুম্>করিদুং ; গন্তুম্>গমিদুং।

মথুরার নিকটবর্তী শূরসেন অঞ্চলের ভাষাই শৌরসেনী প্রাকৃত নামে অভিহিত। সংস্কৃত নাটকে মহিলাগণ, বিদূষক এবং দৈবজ্ঞ শৌরসেনী প্রাকৃতে কথাবার্তা বলিতেন। কর্পূরমঞ্জরী নাটকে রাজা ও এই প্রাকৃতে কথা বলিয়াছেন। একই কথ্যভাষা হইতে লৌকিক সংস্কৃত ও শৌরসেনী প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে। এজন্য অন্যান্য প্রাকৃত অপেক্ষা শৌরসেনী প্রাকৃতে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বৈয়াকরণেরা **আবন্তী** নামে আর একটি প্রাকৃতের কথা বলিয়াছেন। এই প্রাকৃতে মহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনী এই উভয় প্রাকৃতেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

মাগধী প্রাকৃত—পূর্ব অঞ্চলের প্রাকৃতের নাম মাগধী। প্রাচীন মগধই এই ভাষার উৎস স্থল বলিয়া অনুমিত হয়। নাটকে মাগধী প্রাকৃত অশিক্ষিত নিম্নস্তরের লোকের ভাষা। মাগধীর কতকগুলি উপভাষাও রহিয়াছে—যেমন, মৃচ্ছকটিকের **ঢক্কী বা টাক্কী** ভাষা। তাছাড়া **শাবরী, চাণ্ডালী, শাকারী** প্রভৃতি উপভাষারও পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্বনি-পরিবর্তন রীতিতে অন্যান্য প্রাকৃত হইতে মাগধী প্রাকৃতের কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। মনে হয় অপভ্রংশ যুগে পূর্বাঞ্চলের শিক্ষিত লোকেরা মাগধীর পরিবর্তে শৌরসেনী অপভ্রংশ বা অবহট্ট সাহিত্যে ব্যবহার করিতেন। মাগধী প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই—

(ক) স, ষ>শ—ভবিষ্যতি>ভবিশ্শদি ; পুত্রস্য>পুত্তশ্শ ;

(খ) র>ল—পুরুষঃ>পুলিশে ; গরুড়>গলুড় ; শমরে>শম্‌লে , চারুদত্ত>চালুদত্ত। র>ল এ পরিবর্তন পালিতে এবং বৈদিক সংস্কৃতেও লক্ষণীয়।

(গ) বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ>এ হয়—ঈশ্বরঃ>ঈশলে।

(ঘ) "য" এর কোন পরিবর্তন হয় না এবং জ>য হয়। যেমন, যথা>যধা ; জানাতি>যাণদি ; জনপদ>যণবদ।

(ঙ) দ্য, র্জ, র্য>য্য হয়—অদ্য, আর্য>অয্য ; মদ্য>ময্য ; দুর্জন>দুয্যণ।

(চ) ণ্য, ন্য, জ্ঞ, ঞ্জ>ঞ্ঞ—পুণ্য>পুঞ্ঞ ; কন্যকা>কঞ্ঞকা ; রাজ্ঞঃ> লঞ্ঞো ; অঞ্জলি>অঞ্ঞলি।

(ছ) পদমধ্যস্থিত চ্ছ>শ্চ হয়—পৃচ্ছদি>পুশ্চদি ; ইচ্ছতি>ইশ্চীঅদি।

(জ) ষ্ট, ষ্ঠ>স্ট, শ্ট—সুষ্ঠু>শুস্টু বা শুশ্টু ; কষ্ট>কস্ট, কশ্ট।

(ঝ) ক্ষ>স্ক, শ্ক—প্রেক্ষতে>পেস্কদি, পেশ্কদি ; পক্ষ>পশ্ক।

(ঞ) শৌরসেনীর মত পদমধ্যস্থিত দ ও ধ মাগধীতে বজায় থাকে।

(ট) মৃচ্ছকটিক নাটকে **শকারের ভাষা শাকারী**। এই উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য—ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ' বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন, পুলিশাহ<পুরুষস্য ; চালুদত্তাহ< চারুদত্তস্য।

(ঠ) স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার—ভস্টকে<ভর্তৃকাঃ।

(ড) অতীতকাল বাচক কৃদন্ত ত>ড হয়—কড<কৃত।

জৈন প্রাকৃত—বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হীনযানপন্থীদের নিকট পালিভাষা যেমন পবিত্র, প্রাচীন জৈন সম্প্রদায়ের নিকট ও প্রাকৃত ভাষা ছিল সেইরূপ পবিত্র। অর্ধমাগধী, জৈন মহারাষ্ট্রী, ও জৈন শৌরসেনীতে জৈনগ্রন্থ সমূহ রচিত হইয়াছে। জৈনধর্মাবলম্বী বৈয়াকরণেরা অর্ধমাগধীকে তাঁহাদের শাস্ত্রের ভাষা বলিয়া **আর্য প্রাকৃত** নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অর্ধ মাগধী—প্রাচীনতম জৈন সূত্রগুলি অর্ধ মাগধীতে রচিত। শূরসেন ও মগধের মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপভাষা হইতে অর্ধমাগধী উদ্ভূত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী অপেক্ষা এই প্রাকৃতে প্রাচীন ব্যাকরণের লক্ষণ বেশী মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। অশ্বঘোষের নাটকে প্রাচীন অর্ধ মাগধীর ব্যবহার পাওয়া যায়। জৈনেরা মনে করেন, মহাবীর যে অর্ধমাগধীতে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই মূল ভাষা এবং অন্যান্য ভাষাসমূহ এই প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অর্ধমাগধীতে শৌরসেনী ও মাগধী উভয় প্রাকৃতেরই লক্ষণ রহিয়াছে। যেমন,

(ক) র, ল দুয়েরই প্রয়োগ পাওয়া যায়।

(খ) ষ, শ>স হয়।

(গ) বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ-কার 'এ' এবং 'ও' দুইই হয়।

(ঘ) স্বর মধ্যবর্তী 'গ' কখনও কখনও রক্ষিত ঃ—লোগংসি<লোকস্মিন্ ; অসোগ< অশোক ;

(ঙ) স্ম>ংস—অংসি<অস্মি।

(চ) স্বরমধ্যবর্তী লুপ্ত ব্যঞ্জনের ফলে য়-শ্রুতির আগম ঘটে—যেমন, হৃদয়>হিয়অ ; সাগর>সায়র ; শত>শয়।

(চ) শানচ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার ও কদাচিৎ মিলে। যেমন, পুচ্ছমানো

(জ) মূর্ধন্যীভবনের প্রয়োগ ও লক্ষণীয়—ঔষধ>ওসড (শৌরসেনী ওসহ)

জৈন মহারাষ্ট্রী—শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রবহির্ভূত গ্রন্থসমূহ যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেরই একটি রূপ। এজন্য ইহাকে বলা হয় জৈন মহারাষ্ট্রী। জৈন মহারাষ্ট্রীতে অর্ধমাগধীর অনেক বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, তুমর্থের-ইত্তু, এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার—ইত্তা প্রত্যয়। তাছাড়া ক>গ হয়।

জৈন শৌরসেনী—দিগম্বর সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষার সঙ্গে শৌরসেনী প্রাকৃতের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কর্তৃকারকের একবচনে 'ও' বিভক্তি ; ত, থ স্থানে যথাক্রমে দ, ধ হয়। এই হেতু ইহাকে বলা হয় জৈন শৌরসেনী। তবে জৈন শৌরসেনীর সঙ্গে অর্ধমাগধীর ও কতকাংশে সাদৃশ্য রহিয়াছে।

পৈশাচী প্রাকৃত—পৈশাচী শব্দটি নিম্নলিখিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—(ক) ভূত ভাষা (অর্থাৎ দানবের ভাষা)। (খ) বর্বরদের ভাষা এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি অপভ্রংশ ভাষা ; (গ) বৈয়াকরণিকদের মতে পৈশাচী উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি উপভাষা। **চুলিকা পৈশাচী** ইহার অন্তর্গত একটি বিভাষা। লোক সাহিত্যে এই প্রাকৃতের ব্যবহার ছিল। উত্তর-পশ্চিমা বা গান্ধারী প্রাকৃতের সঙ্গে পৈশাচীর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত ব্যাকরণে পৈশাচী প্রাকৃতের লক্ষণ আলোচিত হইলেও সাহিত্যে পৈশাচী ভাষায় রচিত কোন লেখা পাওয়া যায় না। মনে হয়, লোকসাহিত্যে এই প্রাকৃতের ব্যবহার ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুণাঢ্য বিভিন্ন রূপ কাহিনী একত্রিত করিয়া পৈশাচী প্রাকৃতে "বড্ডকহা" (বৃহৎ কথা) রচনা করিয়াছিলেন। মূল গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইলেও কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে কাহিনীগুলি রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে ও সোমদেবের "কথাসরিৎ সাগরে" এই গ্রন্থের সংস্কৃত রূপান্তর পাওয়া যায়। কবি বাণভট্ট, দণ্ডী ও সুবন্ধু গুণাঢ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। গোবর্ধন আচার্য আর্যাসপ্তশতীতে গুণাঢ্যের বন্দনা করিয়াছেন।

পৈশাচীর প্রধান লক্ষণগুলি এই :—

(ক) স্বর মধ্যবর্তী ঘোষবৎ ব্যঞ্জনের অঘোষবর্ণে পরিবর্তন—রাচা<রাজা ; নকর< নগর ; কন্তপ্প<কন্দর্প ; মাথপো<মাধবো ।

(খ) ণ>ন হয়—তলুনী<তরুণী ।

(গ) ক্ত্বা>তূন—কাতূন<কৃত্বা । গন্ত্‌ন<গত্বা ।

(ঘ) স্বর ভক্তির উদাহরণও মিলে—ভারিয়া<ভার্যা ; কসটং<কষ্টং ।

(ঙ) পৈশাচীতে স্বর মধ্যস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হয় না । মহাপ্রাণবর্ণ হ-তে পরিবর্তিত হয় নাই । ল স্থানে ল় হয় । মাগধী প্রাকৃতের মত জ্ঞ, ন্য>ঞ্ঞ হয় । যেমন, পুঞ্ঞ= পুন্য ; রঞ্ঞো=রাজ্ঞঃ ।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতে প্রাকৃতের নির্বাধ ব্যবহার যে হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । কারণ নাট্য শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপের মধ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতের ব্যাপক ব্যবহার ছিল । শিষ্ট সমাজে মার্জিত ভাষার সহিত প্রাকৃত জনের অমার্জিত ভাষার বৈষম্যহেতু চরিত্রগত বিভিন্ন ভূমিকায় সংলাপের ভাষা ও ছিল ভিন্ন । সংস্কৃত নাট্যকারগণ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক প্রাকৃতকে তাঁহাদের রচনায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটক । বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সংলাপ ছিল সাহিত্যিক—প্রাকৃত জনের কথ্য ভাষার সহিত তাহার পার্থক্য ছিল প্রচুর ।

অপভ্রংশ—বৈয়াকরণ **পতঞ্জলি** "অপভ্রংশ" বা "অপভ্রষ্ট" শব্দটি মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় কথ্য ভাষার অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । অপভ্রংশ কথাটির অর্থ সংস্কৃতের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট । ইহাকে ইতর জনের ভাষা রূপেই গণ্য করা হইত । প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা এই অর্থেই অপভ্রংশ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন । ওড়িশার অধিবাসী বৈয়াকরণ **মার্কণ্ডেয়ের** (সপ্তদশশতক) "প্রাকৃতসর্বস্ব"তে অপভ্রংশের বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে । কিন্তু গ্রীয়ার্সন এবং অন্যান্য ভাষাবিদ্‌গণ মধ্য-ভারতীয় আর্যের শেষ স্তরকে অপভ্রংশ নাম দিয়াছেন, এবং প্রত্যেকটি আঞ্চলিক প্রাকৃত ও তদ্ভূত আধুনিক ভাষার মধ্যবর্তী এক একটি অপভ্রংশের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন ।

যেমন—মাগধী প্রাকৃত>মাগধী অপভ্রংশ>বাংলা ; শৌরসেনী প্রাকৃত>শৌরসেনী অপভ্রংশ>হিন্দী ; মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত>মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ>মারাঠী ; সৌরাষ্ট্রী, লাটি> নাগরক অপভ্রংশ>রাজস্থানী ভাষাবর্গ ; অর্ধমাগধী প্রাকৃত>অর্ধমাগধী অপভ্রংশ> অবধী>পূর্বীহিন্দী । প্রাকৃত ব্যাকরণে অপভ্রংশের যে নমুনা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন এবং কিছু অংশ অর্বাচীন । কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে কয়েকটি গান অপভ্রংশে

রচিত। নিয়া (Niya) প্রাকৃত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতের সঙ্গে সাহিত্যিক অপভ্রংশের ঘনিষ্ঠ মিল আছে। বৈয়াকরণেরা **"নাগরক"** অপভ্রংশকেই মুখ্য ধরিয়াছেন। অন্যান্য আঞ্চলিক অপভ্রংশগুলির নাম হইতেছে **ব্রাচড়ক, বৈদর্ভী, উপনাগরক, পাঞ্চালী, গৌড়ী** প্রভৃতি। এই অপভ্রংশগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নাগরক ও শৌরসেনী অপভ্রংশের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

অর্বাচীন অপভ্রংশই আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষার অব্যবহিত পুর্বরূপ। ইহাকেই **লৌকিক বা অবহট্‌ঠ** বলা হয়।

অপভ্রংশে সংস্কৃতের প্রভাব খুবই কম। সপ্তম শতক হইত চতুর্দশ শতক পর্যন্ত অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্ট সমগ্র উত্তর ও পূর্ব-ভারতে লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাপতি অবহট্টে কীর্তিলতা রচনা করিয়াছিলেন। অপভ্রংশের একটা প্রধান লক্ষণ পদান্ত ও-কারের সংবৃত উচ্চারণ। দ্বিতীয় লক্ষণ পদ্যে অন্ত্যানুপ্রাস। তৃতীয় লক্ষণ শব্দের প্রয়োগে বিভক্তিহীনতা। **অপভ্রংশের** ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে এই—

(ক) প্রথমার একবচনে বিভক্তিহীনতা ; কখনো কখনো "উ" বিভক্তির প্রয়োগ।

(খ) ক্ষুদ্রার্থক "ইক" প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ-গঠন।

(গ) শব্দরূপের সরলীকরণ।

(ঘ) ষষ্ঠীর একবচনে "-হ" বিভক্তির ব্যবহার।

(ঙ) স্বার্থিক প্রত্যয়ের বহুল প্রয়োগ।

(চ) বিভিন্নকালের অর্থে শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ।

(ছ) স্বরমধ্যবর্তী ম>বঁ—কমলং>কবঁলু।

(জ) অ-কার ও উ-কারের পূর্বে ম-কারের লোপ—যমুনা>জউনা ; দুর্গম> দুগ্‌গউ।

(ঝ) ব>উ—স্বভাব>সহাউ ; আহব>আহউ।

(ঞ) দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা—বাণিজ্য>বণিজ্জ ; কারণ>করণ।

(ট) অন্ত্য 'ই' ও 'উ' আনুনাসিক রূপে উচ্চারিত—ভণতি>ভণই।

সংস্কৃত একটি সুসংবদ্ধ মার্জিত এবং শিষ্ট জনসাধারণের ভাষা। ব্যাকরণের কৃত্রিম শাসনের কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে ইহা বাঁধা। অপভ্রংশ ছিল জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত একটা লোকায়ত ভাষা। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রবানের সাধু ভাষা, অপভ্রংশ শাস্ত্রহীনের চলিত ভাষা। ভাষা যতই বিশ্লেষণমূলক (analytical) হইয়া উঠে, প্রত্যয় ও বিভক্তি স্বাভাবিক নিয়মে পরিহার করিতে থাকে। বিভক্তিহীন শব্দের প্রয়োগ

জার্মানিক ভাষা গোষ্ঠীতেও লক্ষণীয়। অপভ্রংশের জঠর হইতে নব্য ভারতীয়-আর্যভাষাগুলি উদ্ভূত হওয়ার পর ও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অপভ্রংশ ভাষা সাহিত্যের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপভ্রংশ যখন বিবর্তনের ফলে অবহট্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তখনও তাহাতে সাহিত্য রচিত হইয়াছে। অপভ্রংশ একদিকে সাহিত্যিক প্রাকৃতের পরবর্তী, অন্যদিকে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার পূর্বরূপ। একমাত্র শৌরসেনী ও নাগরক অপভ্রংশ ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতের অপভ্রংশ স্তরে রচিত কোন সাহিত্য আমরা পাই না।

(১) বররুচির **"প্রাকৃত প্রকাশে"** অপভ্রংশের উল্লেখ নাই। হেমচন্দ্রের **"সিদ্ধ হেমশব্দানুশাসন"** গ্রন্থে অপভ্রংশের আলোচনা রহিয়াছে। হেমচন্দ্রের সমসাময়িক পুরুষোত্তমদেব (দ্বাদশ শতাব্দী) তাহার **"প্রাকৃতানুশাসন'** গ্রন্থের সপ্তদশ-অষ্টাদশ অধ্যায়ে নাগরক, ব্রাচড়ক ও উপনাগরক অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য সমূহ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

(১) নাগরক অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য—

(ক) শ, ষ>স ; য>জ ; ন>ণ।

(খ) লিঙ্গ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই।

(গ) তৃতীয়ার একবচনে এঁ বিভক্তি (<এন)।

(ঘ) অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কর্তৃকারক ও কর্মকারকের একবচনে "উ" বিভক্তি হয়।

(ঙ) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কর্তৃকারক ও কর্মকারকের বহুবচনে "উ" বিভক্তি হয়।

(চ) স্বার্থিক প্রত্যয় ডা, ডি, উল্ল ব্যবহৃত হয়।

(ছ) আত্মনেপদের প্রয়োগ নাই ; সর্বত্রই পরস্মৈপদের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়।

(জ) বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালে শতৃ প্রত্যয়ের ব্যবহার।

(২) ব্রাচড়ক অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য—

(ক) ষ, স>শ।

(খ) পদের আদিতে ত>ট, ড>দ রূপে উচ্চারিত হয়।

(গ) চ-বর্গের ধ্বনি সমূহ তালব্যবর্ণরূপে উচ্চারিত হয়।

(৩) উপনাগরক অপভ্রংশে নাগরক ও ব্রাচড়ক উভয়েরই বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়।

সপ্তম অধ্যায়

নব্য ভারতীয়-আর্য

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্ত্যস্তর অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্রংশ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা রূপে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া অসমীয়া, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, সিন্ধী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব ঘটিল। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রথম লেখকগণ লৌকিক ভাষা অবহট্‌ঠে ও সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন।

নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার সাধারণ লক্ষণ

(১) মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার যুগ্ম ব্যঞ্জন প্রায়ই একটি ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হইল এবং পূর্বের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হইল।

যেমন, বল্গা>বগ্‌গা>বাগ ; কক্ষ>কক্‌খ>কংখ>কাঁখ। কিন্তু পাঞ্জাবী ও পশ্চিমা হিন্দীর কোন কোন উপভাষায় যুগ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনি রক্ষিত আছে—অদ্য>অজ্জ>অজ্‌ ; অষ্ট>অট্‌ঠ>অট্‌ঠ ; রক্ত>রত্ত>রত্‌।

সরলীকরণের ফলে সিন্ধীতে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় নাই—যেমন, অদ্য>অজ্জ>অজু ; রক্ত>রত্ত>রতু।

(২) যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী নাসিক্য বর্ণ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করিয়া লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবী ও সিন্ধীতে এই পরিবর্তন হয় নাই। যেমন, কণ্টক> কণ্টঅ>কাঁটা ; কিন্তু সিন্ধীতে কণ্ডো ; দন্ত>দান্‌ত (প্রা-বা)>দাঁত ; কম্প>কাঁপ ; কিন্তু সিন্ধী ও পাঞ্জাবীতে কম্ব্‌ ; হেমন্ত>হেবঁন্ত (প্রা)>হেঁওং—পাঞ্জাবীতে-হিউন্দ্‌।

(৩) পদমধ্যস্থিত ই, ঈ+অ, আ>ই (ঈ) ; উ, ঊ+অ, আ>উ (ঊ) হইল। যেমন, মৃত্তিকা>মট্টিআ>মাটি ; ঘৃত>ঘিঅ>ঘী।

(৪) পদান্ত স্বরধ্বনি বিকৃত অথবা লুপ্ত হওয়ার ফলে লিঙ্গ পার্থক্য বহু ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় নাই। কতকগুলি ভাষায় শুধু পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার আছে কিন্তু লিঙ্গ পার্থক্য সংস্কৃতের অনুগামী নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে।

যেমন—অগ্নি>অগ্‌গি>আগি (প্রা-বা) ; হিন্দী আগ, পাঞ্জাবী অগ্‌গ। আবার কোথাও কোথাও একই শব্দের পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের রূপ পাওয়া যায়।

যেমন, ইক্ষু>ইক্‌খ (পুংলিঙ্গ—পাঞ্জাবী), উস (মারাঠী) ; পুংলিঙ্গ ইক্ষু (*উক্ষু)> উখ, ইখ, স্ত্রীলিঙ্গ (হিন্দী) ; পুংলিঙ্গ দেহ>দেহ, স্ত্রীলিঙ্গ (হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী,)। দধি>দহী (পুংলিঙ্গ—হিন্দী) ; দধি>স্ত্রীলিঙ্গ দহী, দহঁী (পাঞ্জাবী) ; দধি>স্ত্রীলিঙ্গ ডহী (সিন্ধী)।

(৫) পদান্ত স্বরধ্বনির পরিবর্তনের জন্য সংস্কৃতের শব্দরূপের বিভক্তির নিদর্শন যাহা অপভ্রংশ স্তর পর্যন্ত বজায় ছিল তাহাও প্রায় লুপ্ত হইল। প্রাচীন বিভক্তির মধ্যে কর্তৃকারকে ই, উ, এ ; করণে এঁ, এ ; অধিকরণে ই, এ বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায়। অনুসর্গ ও অনুসর্গ জাত নূতন বিভক্তির দ্বারা বিভিন্ন কারকের অর্থ জ্ঞাপিত হইল। প্রাচীন ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ক্বচিৎ পাওয়া যায়।

যেমন, ক্ষণস্য>খণহ (প্রা-বা) ; গগনস্য>গঅণহ (প্র.-বা) ; চৌরস্য>চুরস (কাশ্মীরী) ; চৌরাণাম্>চুরন (কাশ্মীরী) ; গৃহাণাম্>ঘরন্, ঘরউ, ঘরোঁ (হিন্দী) ; ঘরাঁ (পাঞ্জাবী, গুজরাটী, রাজস্থানী)।

(৬) নবজাত কয়েকটি বিভক্তির উৎস হইতেছে স্থানবাচক বা অঙ্গবাচক শব্দ। যেমন, সপ্তমীতে-ত<অন্তঃ (বাংলা-অসমীয়া) ; -আঁত<অন্তঃ (পাঞ্জাবী) ; -মঁ,-মা, -মেঁ<মধ্য (হিন্দী ও গুজরাটী) ; তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতে প্রযুক্ত -সোঁ,-সে<সম (হিন্দী) ; তৃতীয়া—-নেঁ<কর্ণ, পর্ণ (হিন্দী ও গুজরাটী)।

(৭) অন্যান্য বিভক্তিগুলি কৃ, দা বা অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অথবা নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

যেমন, ষষ্ঠী বিভক্তি-জী,-জো<কার্য (সিন্ধী) ; -চা,-চী-চে<কৃত্য (ষষ্ঠী বিভক্তি, মারাঠী) ;-আর<কার ; -এর<কের, -অর<কর (ষষ্ঠী—বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া)। বাংলা ও ওড়িয়ায়-ক<কৃত (ষষ্ঠী-চতুর্থী) ; হিন্দীতে-কা,-কী,-কো<কৃত (ষষ্ঠী) ; -দা< *দাত (=দত্ত) (ষষ্ঠী, পাঞ্জাবী)।

(৮) ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় কারক প্রধানত দুইটি—**কর্তা বা মুখ্য কারক ও তির্যক বা (oblique) গৌন কারক।** প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি মুখ্য কারকের অন্তর্গত। ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি মিলিত হইয়া গৌণ কারক হইয়াছে। অনুসর্গজাত বিভক্তি সমূহ গৌণ-কারকের অন্তর্ভুক্ত।

(৯) মুখ্য কারকে একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য না থাকায় পূর্ব অঞ্চলের ভাষাগুলিতে বহুত্ব বোধক শব্দ দ্বারা কিংবা সম্বন্ধ পদ হইতে প্রাপ্ত বিভক্তি দ্বারা বহুবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়।

যেমন, বাংলায়—শিশুগণ, মানুষেরা ; ওড়িয়ায়—পণ্ডিতমান (মান<মানব) ; অসমীয়ায়—বোর<বহুল ; মৈথিলী—লোকনি<লোকানাম্ ; পূর্বী হিন্দী—ঘোড়বন্< ঘোটকানাম্ ইত্যাদি। সিন্ধী, মারাঠী এবং পশ্চিমা হিন্দীতে প্রথমার বহুবচনের পদ প্রাচীন রীতি অনুযায়ী গঠিত হয়। যেমন, হিন্দীতে বাং<বার্তা (একবচন) ; বাতেঁ< বার্তাঃ (বহুবচন) ; মারাঠীতে মাল্<মালা (একবচন), মালাঃ<মালাঃ (বহুবচন) ; রাং<রাত্রিঃ (একবচন) ; রাতী<রাত্রয়ঃ (বহুবচন) ; সিন্ধীতে-পিউ<পিতা (একবচন) ; পিউর<পিতরঃ (বহুবচন)।

(১০) কোন কোন ভাষায় তৃতীয়ার বহুবচনের পদ রক্ষিত আছে।

যেমন, পশ্চিমা হিন্দী—ঘোড়ে<ঘোটকৈঃ ; পূর্বী হিন্দী—ঘোড়বে<ঘোটকৈঃ ; ওড়িয়ায়—পুরুষে<পুরুষৈঃ।

(১১) ক্রিয়া রূপের মধ্যে শুধু বর্তমান কাল ও অনুজ্ঞার রূপ রক্ষিত আছে। ক্বচিৎ ভবিষ্যৎ কালের রূপ ও পাওয়া যায়। নিষ্ঠা কিংবা শতৃ প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎ কালের পদ গঠিত হয়।

যেমন, চলি (চল্) ; চল্লিআ (পাঞ্জাবী) ; চলিল (বাংলা, অসমীয়া ওড়িয়া) ; চলল্ (বিহারী) ; চাল্লা (মারাঠী) ; চালেল্ (গুজরাটী) ; চলিব<চলিতব্য (বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া) ; চলব (মৈথিল) ; হইত<ভবন্ত্ (বাংলা), হোত্ (মৈথিলী)। পাঞ্জাবী ও গুজরাটীতে ভবিষ্যৎ কালের প্রাচীন রূপ রক্ষিত আছে। যেমন, মরেসী< মারয়িষ্যতি (পাঞ্জাবী) ; মার্‌শো (গুজরাটী)।

(১২) নব্য ভারতীয়-আর্যের মধ্যস্তর হইতে যৌগিককালের পদ সৃষ্টি হইল। যেমন, বাংলায়-গিয়াছে, গিয়াছিল ; হিন্দীতে-গয়া যা, জান্‌তা হৈ ; পাঞ্জাবী-জান্‌দাসী।

নব্য ভারতীয়-আর্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিভাগ (Inner and outer classification of New Indo-Aryan Languages).

গ্রীয়র্সন নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিকে **অন্তরঙ্গ** ও **বহিরঙ্গ** এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি হোর্নলকে (Hoernle) অনুসরণ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ ভাষাগুলির মধ্যে পড়ে পশ্চিমা হিন্দী ও পাঞ্জাবী। কাশ্মীরী, সিন্ধী, মারাঠী, বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাসমূহ বহিরঙ্গ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীয়র্সনের মতে বহিরঙ্গ ভাষা গোষ্ঠীর আর্যগণ ভারতে সর্বপ্রথম আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, আর অন্তরঙ্গভাষী আর্যরা পরে আসিয়া বহিরঙ্গভাষী আর্যগণকে তাহাদের বাসস্থান হইতে হটাইয়া দিয়া সেখানে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

বহিরঙ্গ গোষ্ঠীর নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে এই ঃ—

(১) পদান্ত ই-কার, উ-কার রক্ষিত আছে।

যেমন, বাংলা—আঁখি<অক্ষি ; বিহারী আঁখি, সিন্ধী অখি ; কাশ্মীরী অছি।

(২) ই-কার ও উ-কারের যথাক্রমে এ-কার এবং ও-কার রূপে উচ্চারণ।

(৩) উ-কারের ই-কার রূপে পরিবর্তন।

(৪) অপিনিহিতির প্রয়োগ।

(৫) ঐ>অই, ঔ>অউ রূপে পরিবর্তিত।

(৬) ঙ, ঞ ধ্বনি রক্ষিত।

(৭) চ>ৎস, জ>(জ়) রূপে উচ্চারিত।

(৮) ল>র, ড>ড়, দ>ড, দ>জ, স্ব>ব, স>হ, স, ষ>শ রূপে পরিবর্তন।

(৯) যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি।

(১০) মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণ হীনতা।

(১১) স্ত্রীলিঙ্গে "ই" প্রত্যয়ের ব্যবহার।

(১২) অনুসর্গের সাহায্যে বহুবচনের পদগঠন।

(১৩) ভূ ও স্থা ধাতু হইতে উদ্ভূত শব্দের দ্বারা পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপন।

(১৪) সকর্মক ক্রিয়াপদে অতীত কালে কর্তায় তৃতীয় বিভক্তির প্রয়োগ।

(১৫) কর্মের বিশেষণ রূপে নিষ্ঠান্ত পদের প্রয়োগ।

(১৬) "আছ্" ধাতুর প্রয়োগ।

(১০) তদ্ধিত "ল" প্রত্যয়ের ব্যবহার।

কিন্তু গ্রীয়র্সনের এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির দুইটি মাত্র উপভাষা বা উপভাষাগুচ্ছ হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বহিরঙ্গ ভাষা গোষ্ঠীর উপরি উক্ত ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে সাধারণ লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কারণ, মারাঠী ও সিন্ধীতে অপিনিহিতি নাই।

উ>ই, ঐ>অই, ঔ>অউ রূপে পরিবর্তন পশ্চিমা হিন্দীতেও লক্ষণীয়। চ>ৎস, জ>জ় রূপে উচ্চারণ শুধু পূর্ববঙ্গের উপভাষায়, অসমীয়ায় ও মারাঠীতে দেখা যায়।

ল>র, ড>ড় রূপে উচ্চারণ সিন্ধী-বিহারীর মত পশ্চিমা হিন্দীতেও দুর্লভ নয়। স, ষ>শ কেবলমাত্র পূর্ব-মগধীয় ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণহীনতা

পশ্চিমা হিন্দীতেও লক্ষণীয়। তদ্ধিত "ল" প্রত্যয় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় ভাষাগুচ্ছেই পাওয়া যায়।

স্ত্রীলিঙ্গ "ই" প্রত্যয়ের ব্যবহার অন্তরঙ্গ ভাষাগুলিতেও মিলে।

নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার বিবরণ।

দরদীয় প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কাশ্মীরে প্রচলিত কাশ্মীরী ভাষা উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরী ভাষার প্রাচীন নিদর্শন খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের রচনায় মিলে। কাশ্মীরী ভাষা পূর্বে ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত শারদা লিপিতে লেখা হইলেও বর্তমানে ফারসী হরফে লেখা হয়।

পাঞ্জাবের মুখ্য ভাষা দুইটি, **লহন্দী বা পশ্চিমা পাঞ্জাবী, হিন্দকী বা পূর্ব পাঞ্জাবী।** পাঞ্জাবী ভাষায় প্রাকৃতের যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির এখনও ব্যবহার রহিয়াছে। পশ্চিমা পাঞ্জাবী লেখা হয় শারদা লিপি হইতে প্রাপ্ত লণ্ডা অক্ষরে, আবার কোথাও কোথাও ফারসী লিপিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্বী পাঞ্জাবী লেখা হয় গুরুমুখীতে। পূর্বী পাঞ্জাবীতে রচিত কিছু সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্বী পাঞ্জাবীতে রচিত শিখদের ধর্ম পুস্তক "আদিগ্রন্থ" ষোড়শ শতকে রচিত। এই পুস্তকের ভাষার উপর পশ্চিমা হিন্দীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

সিন্ধু ও কচ্ছের ভাষা **সিন্ধী** সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল। ইহাতে পদের অন্তস্থিত ই-কার ও উ-কার রক্ষিত আছে। র-কার যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অনেক ক্ষেত্রে সমীভবন হয় নাই। সমীভূত যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্ব-স্বর দীর্ঘ হয় নাই। পূর্ববঙ্গের উপভাষার মত মহাপ্রাণ-বর্ণ কণ্ঠনলীয় স্পর্শবর্ণে পরিণত হইয়াছে।

রাজস্থানে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে **পশ্চিমা রাজস্থানী বা মাড়োয়াড়ীই** প্রধান। ইহার সঙ্গে গুজরাটীর সম্পর্ক নিকট। পশ্চিম রাজস্থানীতে রচিত কিছু কিছু পুরানো গাথার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ষোড়শ শতকে গুজরাটী পশ্চিম রাজস্থানী হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হয়। গুজরাটী ভাষায় লিখিত গদ্য ও পদ্য রচনার সন্ধান মিলে চতুর্দশ শতকে।

হিমালয়ের পশ্চিম ও মধ্য অংশে **পাহাড়ী ভাষা** প্রচলিত। **কুমায়নী, গাড়োয়ালী ও নেপালী** পাহাড়ী ভাষাবর্গের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে নেপালী বা খস্‌কুরা উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমী হিন্দীর কয়েকটি উপভাষা আছে। যেমন, **বঙ্গারু বা হরিয়ালী, হিন্দুস্থানী** (কথ্যরূপ), **ব্রজভাখা, কনৌজী, বুন্দেলী।**

এই ভাষাগুলির মধ্যে মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে **ব্রজভাখা** (ব্রজভাষা) সাহিত্য-গৌরবে শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন সাহিত্যের বেশীর ভাগ ব্রজভাষাতেই রচিত। ত্রয়োদশ শতকে চন্দ্‌বর্দাই এর রচিত "প্রিথীরাজরাসৌ" কাব্যে অর্বাচীন অপভ্রংশের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে।

"উর্দু"র সঙ্গে হিন্দুস্থানীর মূলত কোন পার্থক্য নাই। উর্দু ফারসী হরফে লেখা হয়। এই ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ বেশি।

পূর্বী হিন্দী বা কোশলী ভাষাবর্গের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য—**অবধী, বঘেলী** ও **ছত্তিশগড়ী**। প্রাচীন অবধী সাহিত্য গৌরবে সমৃদ্ধ। অবধী ভাষাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। সুফী লেখকগণ এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষায় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত মালিক মুহম্মদ জৈসীর "পদ্মাবতী" এবং ঐ শতকের শেষার্ধে রচিত তুলসী দাসের "রামচরিত মানস" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দ্বাদশ শতকে লিখিত কয়েকটি অনুশাসন পত্রে মারাঠী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। জ্ঞানদেব বিরচিত গীতার টীকা মারাঠী ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ। **কোঙ্কনী** মারাঠীর অন্যতম উপভাষা। ষোড়শ শতকে এই ভাষার উদ্ভব ঘটে।

পশ্চিম-মগধীয় ভাষা **ভোজপুরী** কাশী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। মধ্য-মগধীয় ভাষা হইতেছে দুইটি—**মগহী** ও **মৈথিলী**। মগহী মগধ অঞ্চলের ভাষা। এই ভাষায় কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। মিথিলার ভাষা মৈথিলীতে উমাপতি ওঝার "পারিজাত হরণ" নাটকের পদাবলী রচিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের **"বর্ণরত্নাকর"** গদ্যে রচিত।

বাংলার সঙ্গে ওড়িয়া ও অসমীয়ার নিকট সম্পর্ক। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ওড়িয়া মূল উৎস হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্র শাসনে প্রাচীন ওড়িয়ার কিছু কিছু নমুনা খাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদ করেন। পূর্ববঙ্গের উপভাষার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মাধব কন্দলী, শঙ্করদেব প্রমুখ লেখকগণের পদাবলী সাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণ কাহিনী, রামায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রাচ্য উপভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া **সিংহলী** একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিণত হয়। আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে যে সমস্ত আর্য সিংহলে প্রথম উপনিবিষ্ট হন, তাহাদের দ্বারাই প্রাচ্য উপভাষা সেখানে নীত হয়। সিংহলীর প্রাচীনতম রূপ হইতেছে **এলু** **(Elu)**। সিংহলীর উপর সংস্কৃত, পালি ও তামিলের প্রভাব লক্ষণীয়।

আর্মেনিয়ায়, তুর্কীতে ও সিরিয়ায় ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্তর্গত **জিপ্‌সী** (Gypsy) বা **যাযাবরী** ভাষা প্রচলিত। যাযাবরদের পূর্ব পুরুষ খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-পঞ্চম শতকের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে ইউরোপ ও পশ্চিম-এশিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করেন। জিপসী ভাষায় ইউরোপ ও এশিয়ার ঐ সব অঞ্চলের ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

মগধীয় ভাষাসমূহ (Magadhan Languages)

প্রাচ্য প্রাকৃতের পূর্বী শাখা হইতে মাগধী প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে। এই মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের মধ্য দিয়া বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী—এই ছয়টি মগধীয় ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। মগধীয় ভাষাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

(ক) পূর্ব-মগধীয়—বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া।

(খ) মধ্য-মগধীয়—মৈথিলী, মগহী।

(গ) পশ্চিম-মগধীয়—ভোজপুরী (নাগপুরিয়া)।

মগধীয় ভাষাসমূহ

পশ্চিম-মগধীয়	মধ্য-মগধীয়	পূর্ব-মগধীয়
(ভোজপুরী)	(মৈথিলী, মগহী)	(বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া)

মগধীয় ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ :—শ, ষ, স—এর মধ্যে "শ" পূর্ব-মগধীয় অঞ্চলে এবং "স" পশ্চিম ও মধ্য মগধীয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। অসমীয়ায় ক-ধ্বনির জিহ্বামূলীয় উষ্মধ্বনি "খ." (x) রূপে উচ্চারণ। অপিনিহিতি "ই" ভোজপুরী ব্যতীত সমস্ত মগধীয় ভাষাগুলিতে রক্ষিত)

করণে-এ,-এঁ বিভক্তি, ষষ্ঠীতে "কর" বিভক্তি, তির্যককারকের বহুবচনে -ন, -না (নি) বিভক্তি ও সপ্তমীতে -এ বিভক্তি প্রযুক্ত হয়।

অতীতে "ল" এবং ভবিষ্যতে "ব" বিভক্তির প্রয়োগ। সংস্কৃতের ভবিষ্যতের স>হ রূপে ব্যবহার। অতীতকালে সকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ এবং পুরুষবাচক প্রত্যয়গুলির ব্যবহার।

যেমন, দেখিলি, দেখিলাহোঁ>দেখিলুঁ, দেখিলাম।

বিশেষ্যপদে কর্তায় ও তির্যক কারকে পার্থক্য নাই।

পূর্ব-মগধীয় ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য :—ওড়িয়া ও অসমীয়ার সঙ্গে বাংলার অতি নিকট সম্পর্ক। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের পর ওড়িয়া মূল উৎস হইতে পৃথক হইয়া পড়ে।

ত্রয়োদশ শতকের তাম্রশাসনে ওড়িয়ায় প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে অসমীয়া বাংলা হইতে বিছিন্ন হইয়া নূতন ভাষার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। এই সময়েই এই ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন মিলে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের উপভাষার সঙ্গে অসমীয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

এই অঞ্চলের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হইতেছে—অ-কারের "c" রূপে উচ্চারণ প্রতিষ্ঠিত। মাগধী প্রাকৃতের "শ" উচ্চারণ যথাযথভাবে রক্ষিত। "ই, উ" অপিনিহিতি সুপ্রতিষ্ঠিত। "ক্ষ" এর উচ্চারণ (ক্)খ্য। ষষ্ঠীতে-র<অর,-এর<কের বিভক্তির প্রয়োগ। অতীতে-ইল এবং ভবিষ্যতে-ইব (-অল,-অব এর পরিবর্তে) প্রত্যয়ের ব্যবহার।

কর্মবাচ্যে নিষ্ঠান্ত অসমাপিকা (Passive Participle)—"আ" প্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন, দেখা (seen)। অহ্ ও হো ধাতুর প্রয়োগের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই। কর্তায় –এ, অধিকরণে-তে এবং ক্রিয়াপদে বচনের মধ্যে পার্থক্য না থাকার রীতি বাংলা এবং অসমীয়ার বৈশিষ্ট্য। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ায় অতীতের পার্থক্য শুধু প্রথম পুরুষে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সে দিলে, সে গেল। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় শ>হ; চ, ছ, জ যথাক্রমে ৎস, স, জ' রূপে উচ্চারিত। চলিত ভাষায় আদিস্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে; কিন্তু অসমীয়া ও ওড়িয়ার অনাদ্য শ্বাসাঘাতও লক্ষণীয়। যেমন, গছ<গাছ; রজা<রাজা। পূর্ববঙ্গের উপভাষায়ও সময় সময় অনাদ্য শ্বাসাঘাত দেখা যায়। বাংলায় বহুবচনের বিশেষ প্রত্যয়গুলি হইতেছে—"রা, দিগ, গুলা"; অসমীয়ায় "বিলাক, বোর, হাত"; উড়িয়ায় "এ, মানে"। সংযোজক অব্যয় (Conjunctive indeclinable) "ইন" এর প্রয়োগ কেবল ওড়িয়া ভাষায় দৃষ্ট হয়।

মধ্য-মগধীয় ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য :—অ-কারের উচ্চারণ অনেকটা পূর্ব-মগধীয় "অ" এর মত, উত্তর-ভারতের অ-কারের উচ্চারণ নয়। ক্রিয়াপদে কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদের বহুল প্রয়োগ। ভবিষ্যৎকালে অৎ<শতৃ প্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন—মৈথিলী ও মগহীতে দেখত্ (দেখিবে)। এইরূপ প্রয়োগ পূর্ববঙ্গের উপভাষায়ও পাওয়া যায়। যেমন, সে কি যাইত? (অর্থাৎ সে কি যাইবে?)। মধ্যম পুরুষে সম্ভ্রমসূচক সর্বনামের পদ "অহাঁ" কেবলমাত্র মৈথিলীতে পাওয়া যায়। অস্ত্যর্থক ক্রিয়া "আছ্" "থিক্" কেবল মৈথিলী ভাষার বৈশিষ্ট্য, মগহীতে নাই। "অহ্, হ্, হো" ধাতুর প্রয়োগ কেবলমাত্র মগহী ভাষায় দৃষ্ট হয়, মৈথিলীতে নাই। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর পঞ্চদশ শতকের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের **"বর্ণরত্নাকর"** চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে গদ্যে রচিত হইয়াছিল। মগধ অঞ্চলের ভাষা মগহীতে বিশেষ কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই।

পশ্চিম-মগধীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য

অ-কারের উচ্চারণ উত্তর-ভারতীয় অ-কারের অনুরূপ। ক্রিয়াপদে প্রথম পুরুষের একবচনে "অস্" প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় (অবধীর প্রভাবে)। যেমন—দেখে, দেখস্ ; দেখ্লে, দেখ্লস। ভবিষ্যতে স্য>হ রূপে প্রয়োগ মিলে। অস্ত্যর্থক "বৃৎ" ধাতুর ক্রিয়ার রূপ বাট, বাড ও বা। পশ্চিম মগধের অন্তর্গত ভোজপুরী ভাষা কাশী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। এই ভাষায় তেমন কিছু সাহিত্য লেখা হয় নাই।

পূর্ব-মগধীয় ও মধ্য-মগধীয় ভাষা সমূহের বৈশিষ্ট্য ঃ—

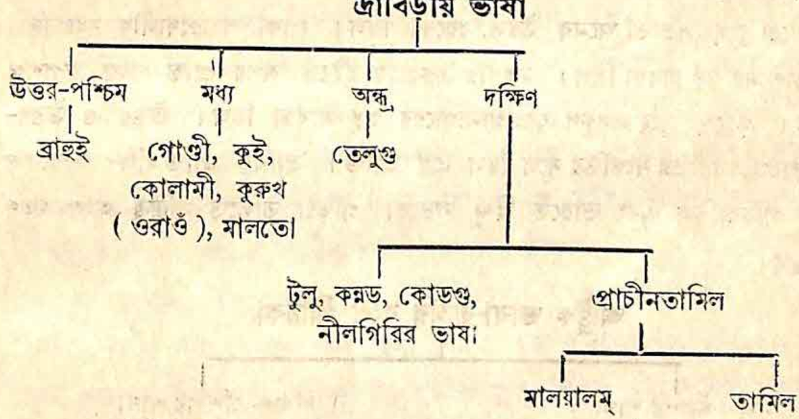
ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "ক" প্রত্যয়ের ব্যবহার উভয় অঞ্চলের ভাষাগুলিতে দেখা যায়। যেমন, দেখিলেক, দেখিলাক (প্রাচীন ওড়িয়া), দেখলক (মৈথিলী- মগহী)। শব্দমধ্যস্থিত ব>ম রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, বাংলায় দিমু-দিব ; ওড়িয়ায় দেখিমি—দেখিবি ; অসমীয়ায় দিমু-দিব ; মগহীতে লেমা-লেবা। অস্ত্যর্থক "আছ" এবং "থ" ধাতুর ব্যবহার উভয় অঞ্চলে রহিয়াছে। বিভক্তির স্থলে অনুসর্গের ব্যবহার হয়। নির্দারক-টা<গোটা, -টি<গুটি প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে। উত্তম পুরুষ সর্বনামে "রা" প্রত্যয়ের ব্যবহার সর্বত্রই পাওয়া যায়। যেমন, বাংলায়—আমরা সব, সভ ; মৈথিলী—হমরা সভ ; মগহী—হমর-নী। সর্বনামের বিশেষণ পদে "হ" এর প্রয়োগ বাংলা, অসমীয়া ও মৈথিলীর বৈশিষ্ট্য। যেমন, বাংলায় যেন, কেন<যেহেন, কেহেন ; অসমীয়ায়—যেনে, কেনে ; মৈথিলীতে—যেহেন, কেহেন।

নবম অধ্যায়

দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান চারিটি ভাষা তেলুগু (Telugu), তামিল (Tamil), কানাড়ী (Kannada) ও মালয়লাম্ (Malayalam) দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। তাছাড়া ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে দ্রাবিড় শাখায় অন্তর্ভুক্ত কিছু ভাষা রহিয়াছে। বেলুচিস্থানে কথিত **ব্রাহুই** আর বাংলায় রাজমহল পাহাড়ে প্রচলিত **মালতো** (মাল পাহাড়ী) দ্রাবিড় শাখার মধ্যে পড়ে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে তামিল সর্বাপেক্ষা উন্নত। ইহা ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তের পূর্বাংশের ভাষা। সিংহলে ও তামিল ভাষা কথিত হয়। দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন তামিলে পাওয়া যায়। তেলুগু

ভাষা অন্ধ্রপ্রদেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। এই ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব বেশি। তেলুগু ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। কানাড়ী ভাষা মহীশূর প্রদেশ ও ডেকানের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশে কথিত হয়। এই ভাষায়ও সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষণীয়। মালয়ালম্ কেরল প্রদেশেয় ভাষা। কানাড়ী ও মালয়ালামে উন্নত ধরণের সাহিত্য লেখা হইয়াছে। টোডা ও কোডা বলা হয় নীলগিরি অঞ্চলে, আর কোডগু কূর্গে প্রচলিত। কূর্গ ও মহীশূর প্রদেশের মধ্য অঞ্চলে টুলু ভাষা ব্যবহৃত হয়। মধ্য ভারতে, ওড়িশায় ও বিহারেয় প্রান্তিক অঞ্চলে খোঁড়, গোঁড়, কুরুখ (ওরাওঁ), কুই ইত্যাদি ভাষা প্রচলিত আছে। এই সব ভাষার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নাই।



আর্য ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব

আর্য-ভাষীদের ভারতে আগমনের পূর্বেই দ্রাবিড়-ভাষীরা এদেশে বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে আর্য-অনার্য মিলনের ফলে নূতন সভ্যতার পত্তন ঘটে এবং অনিবার্য কারণেই আর্য ভাষার উপর অনার্য প্রভাব আসিয়া পড়ে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে সংস্কৃত মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ড়, ঢ়, ষ দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে। শব্দের ও বাক্যের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের রীতি ও দ্রাবিড় প্রভাব-জাত।

সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে নিষ্ঠান্ত ও শত্রন্ত নাম পদের প্রয়োগের মূলে ও দ্রাবিড়ীয় প্রভাব বিদ্যমান। যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব রহিয়াছে। বাংলায় বহুবচনের বিভক্তি "গুলা, গুলি" তামিল ভাষার বহুবচনের বিভক্তি "গল" হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নিম্নলিখিত শব্দগুলি সম্ভবত দ্রাবিড়ীয় ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে—অনল, অগুরু, কজ্জল, কটু, কঠিন, কাক, কাল, কুটি, কুণ্ড, কুণ্ডল, কুন্তল, কোরক, খল, গণ্ড, ঘুণ, চিক্কণ, চতুর, চন্দন, চূড়া, তাল,

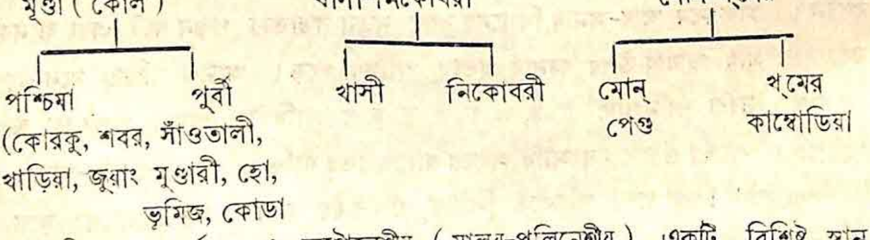
নিবিড়, নীর, পটোল, পণ্ডিত, পল্লী, পিণ্ড, বল, বিড়াল, বিল, ময়ূর, মহিলা, মীন, মুকুট, মুকুল, মুক্তা, মুটক, বলয়, বল্লী, শঠ, শব, হিন্তাল, হেরম্ব প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি দেশী শব্দও দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। যেমন, উলু, পিলে, কুড়া, খাল।

গ্রামের নামের সঙ্গেও বহু দ্রাবিড় শব্দ মিশিয়া আছে। যেমন, শোল, জোল, শোলী, জোলী, পোল, গুড়া, গুড়ি, কুণ্ড, কুণ্ডী, ভিটা, ভিটি ইত্যাদি।

সম্প্রতি কয়েকজন রুশীয় পণ্ডিতের গবেষণার ফলে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার মূলে রহিয়াছে দ্রাবিড়ীয় উপাদান। ইহা খুবই সম্ভব যে দ্রাবিড়ীয় জাতি মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার নগর সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। মহেঞ্জোদরো যুগের সভ্যতা অনেক উন্নত ধরণের ছিল। পাকা পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া জল নিষ্কাশনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা ছিল। নগরীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সুপ্রশস্ত পথ ছিল। গৃহস্থের গৃহে নলকূপ এবং স্নানাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির মূলে ছিল এই জাতি। দ্রাবিড় জাতি দক্ষিণ ভারতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ভারতে হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

অষ্ট্রিক ভাষা-বর্গের বংশ পীঠিকা



পৃথিবীর ভাষাবর্গের মধ্যে অষ্ট্রোনেশীয় (মালয়-পলিনেশীয়) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এই বর্গের বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। এই ভাষাগুলির কোনটিরই বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। তবে সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে এক সময় অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল। সেজন্য নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় অষ্ট্রিক ভাষার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণ রহিয়াছে। আমাদের সমাজ-

জীবনেরও নানান্তরে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আর্য ও অনার্যগণের সংমিশ্রণের ফলে হিন্দু ধর্ম, রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে মিশনারীগণ মুণ্ডা ভাষার চর্চা আরম্ভ করিয়াছেন। সংস্কৃতে মুণ্ডা ভাষা হইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি গৃহীত হইয়াছে। অলাবু, কদলী, কার্পাস, তাম্বুল, মরিচ, লাঙ্গুল, সর্ষপ, জম্বাল, উন্দুরু (=ইঁদুর), গুবাক। "বঙ্গ" শব্দও অষ্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বাংলার শব্দভাণ্ডারে দেশী শব্দগুলির অধিকাংশই অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠী হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যেমন—খোকা, খুকি, কুঁড়ি, ঝাঁটা, ঝান্থ, ঝোঁপ, টাঙ্গা, টিকুলী, টোপর, ডাঙ্গা, ডোঙ্গা, ডালা, ডাব, ডাবর, ডাঙ্গ, ডঙ্ক, ঢিল, ঢেঁকী, ঢোল, ঢেঁকুর ইত্যাদি।

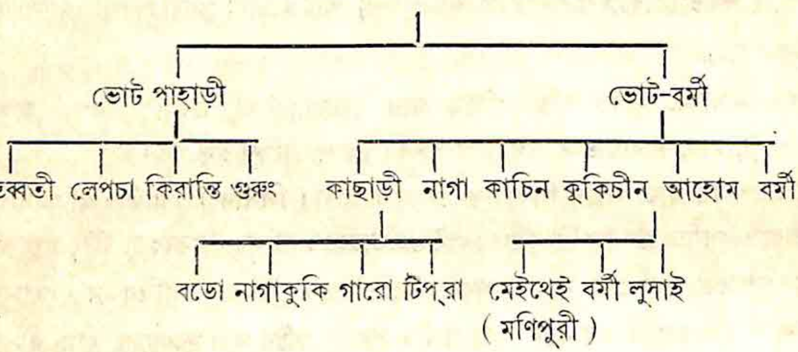
দ্রাবিড় জাতি ছাড়া অষ্ট্রিক শাখাভুক্ত কোল বা মুণ্ডা (**নিষাদ**) গোষ্ঠীর অধিবাসীগণ উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর ভারতের গাঙ্গের উপত্যকায় হিন্দু সভ্যতার পত্তনের পশ্চাতে তাহাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। দ্রাবিড় জাতির মত তাহারা নগর সভ্যতা স্থাপন করে নাই বটে, কিন্তু গ্রামীণ সভ্যতা সৃষ্টির মূলে তাহাদের দান স্বীকার করিতেই হইবে। গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে তাহারা উন্নততর করিয়াছিল। লাঙ্গল, কোদাল এবং বলদের সাহায্যে কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ধান, সরিষা, পিপুল, রসুন, হরিদ্রা, বেগুন, লাউ, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন কোল জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহারা কার্পাস হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বুনন করিত। মুরগী পালন করিত এবং হাতীকেও পোষ মানাইত। ঘোড়া ও তাহাদের নিকট অপরিচিত ছিল না।

সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে (Archaeological excavations) প্রস্তর যুগের মানুষের শিল্প উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসাবে ভুপালের সন্নিকটে এক প্রাগৈতিহাসিক চিত্রশালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অরণ্য অঞ্চলে অতিকায় শিলাস্তম্ভের নিম্নে একটি প্রাকৃতিক গুহায় এই চিত্রশালাটি অবস্থিত। পাহাড়ের সানুদেশে প্রায় দশ কিলোমিটার স্থান ব্যাপিয়া ছয় শতাধিক গুহার সন্ধান মিলিয়াছে। গুহা-প্রাচীরে শাদা, লাল ও সবুজ বর্ণে অঙ্কিত ছবিগুলিতে যৌথ সমাজ জীবনের নিদর্শন রূপে নৃত্য এবং পশু শিকারের দৃশ্যও রহিয়াছে। প্রস্তর যুগের সেই বিলুপ্ত মানব গোষ্ঠীর প্রযুক্তি বিদ্যার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের কিছু নিদর্শন মির্জাপুর পাহাড়েও রহিয়াছে। কিন্তু ভীম বৈঠক নামে পরিচিত পাহাড়ের এই গুহাচিত্রগুলির বৈচিত্র্য এবং প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ

নাই। ইহার মূলে প্রত্ন-অষ্ট্রিক জাতির অবদান থাকিতে পারে। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে দেশ বিদেশের অনেক অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও শিল্পী ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন।

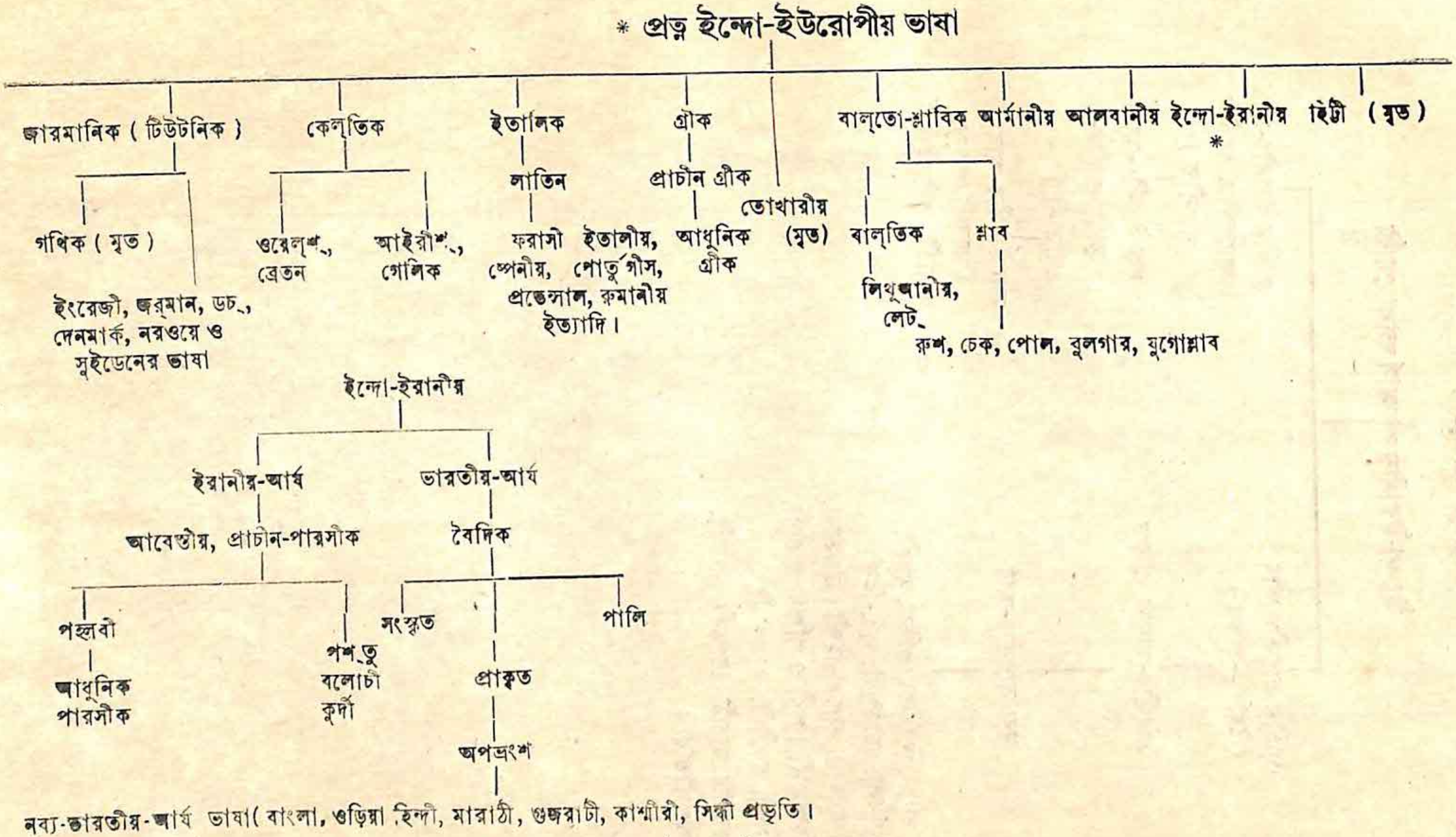
ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বর্মী শাখা

(Tibeto-Burman Branch of the Tibeto-Chinese or Sino-Tibetan Family)



ভোট-চীনীয় বর্গের অন্তর্গত **ভোট-বর্মী** শাখার ভাষাগুলি বর্তমানে হিমালয়ের পাদদেশে, আসাম, চীন ও বর্মার সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত। ভোটবর্মী শাখার ভাষার প্রভাব অসমীয়া, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষাগুলির উপর পড়িয়াছে। এই গোষ্ঠীর শতাধিক ভাষা ও উপভাষা খুব কম সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আসাম ও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোট-বর্মী ভাষীরা আস্তে আস্তে আর্য ভাষা গ্রহণ করিতেছে। বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে কিছু সংখ্যক ভোট-বর্মী ভাষার শব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে। গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত "চঙ্গ" (বসতি), চা, চী, প্রভৃতি শব্দ বা শব্দাংশ সম্ভবত ভোট-বর্মী ভাষা হইতে আসিয়াছে।

যেমন, বানিয়াচঙ্গ, সানাইচা, কুরচা ইত্যাদি। ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীভূক্ত মোঙ্গোলীয় জাতি **(কিরাত)** যাহারা বর্তমানে হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে বাস করে, তাহারা এক সময়ে মধ্য ভারত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং ভারতে জাতিগত, ধর্মগত এবং ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে তাহাদের খানিকটা ভূমিকা থাকিতে পারে। নেপালে নেওয়ার, মণিপুরে মেইথেই, ত্রিপুরায় বড়ো এবং আসামে অহোম জাতির মধ্যে ভোট-চীনীয় জাতির প্রভাব রহিয়াছে।

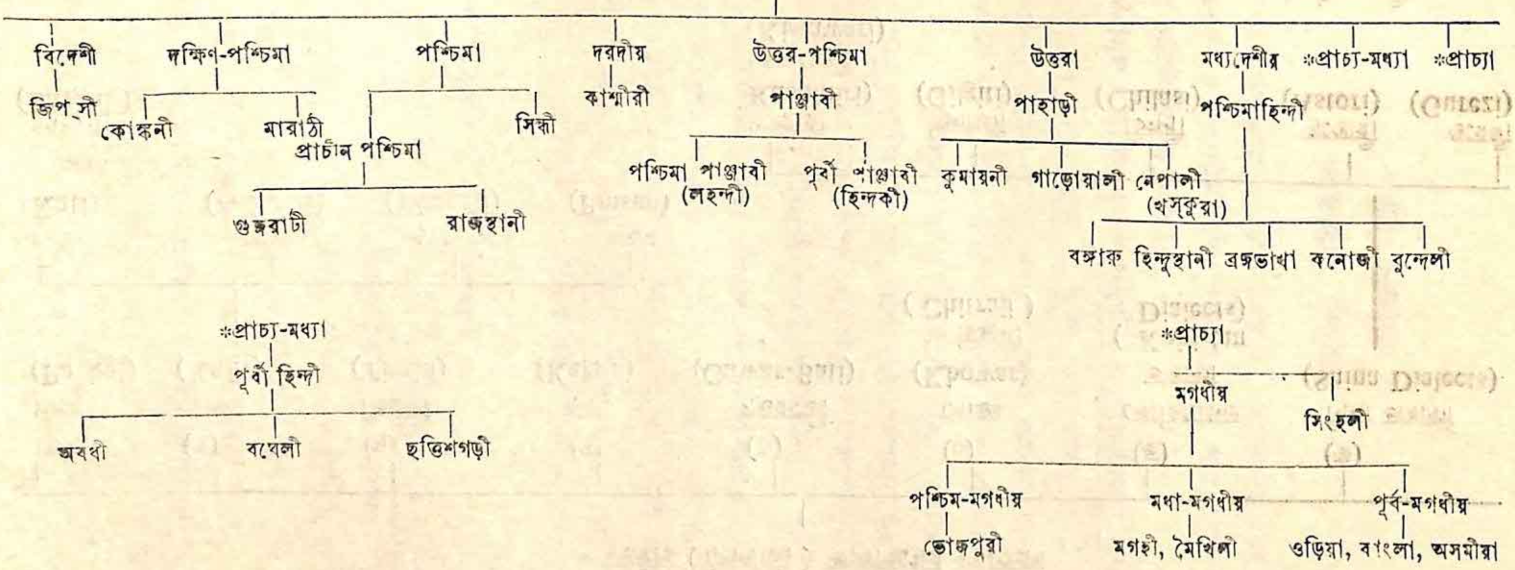

* প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা
জারমানিক (টিউটনিক)
কেল্‌তিক
ইতালিক
গ্রীক
বাল্‌তো-শ্লাবিক
আর্মানীয়
আলবানীয়
ইন্দো-ইরানীয়
হিট্টী (মৃত)
*
গথিক (মৃত)
ইংরেজী, জর্‌মান, ডচ্‌, দেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের ভাষা
ওয়েল্‌শ্‌, ব্রেতন
আইরীশ্‌, গেলিক
লাতিন
ফরাসী ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগীস, প্রভেন্সাল, রুমানীয় ইত্যাদি।
প্রাচীন গ্রীক
আধুনিক গ্রীক
তোখারীয় (মৃত)
বাল্‌তিক
লিথুআনীয়, লেট্‌
শ্লাব
রুশ, চেক, পোল, বুলগার, যুগোশ্লাব
ইন্দো-ইরানীয়
ইরানীয়-আর্য
ভারতীয়-আর্য
আবেস্তীয়, প্রাচীন-পারসীক
বৈদিক
পহ্লবী
আধুনিক পারসীক
পশ্‌তু বলোচী কুর্দী
সংস্কৃত
পালি
প্রাকৃত
অপভ্রংশ
নব্য-ভারতীয়-আর্য ভাষা(বাংলা, ওড়িয়া হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, কাশ্মীরী, সিন্ধী প্রভৃতি।

* ODBL হইতে গৃহীত।

ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ভাষা গোষ্ঠী

- প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক-সংস্কৃত)
  - মধ্য ভারতীয়-আর্য বা প্রাকৃত
    - নব্য ভারতীয়-আর্য
      - [বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মগহী, মৈথিলী, ভোজপুরী, পূর্বী-হিন্দী (অবধী), পশ্চিমা-হিন্দী (ব্রজভাষা, হিন্দুস্থানী) পূর্বী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কাশ্মীরী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী, কোঙ্কনী, সিংহলী, জিপ্‌সীভাষা]
- প্রাচীন ইরানীয়-আর্য (আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসীক)
  - মধ্য ইরানীয়-আর্য (পহ্লবী, প্রাচীন-খোতানী)
    - নব্য ইরানীয়-আর্য (ফারসী, পশ্‌তু, বলোচী, কুর্দী, ইত্যাদি)

* নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা সমূহ



* ODBL হইতে গৃহীত।

* দরদীয় (পৈশাচী) ভাষাবর্গের বর্গীকরণ

- (ক) পশই (Pashai)
- (খ) কাফির (Kafir)
  - কতী (Kati) বা বসগালী (Basgali)
  - অস্কুন্দ (Askund)
  - ওইগেলি (Waigeli)
  - প্রস্থন (Prasun)
- (গ) তিরাহী (Tirahi)
- (ঘ) কলস (Kalasa)
- (ঙ) গওরবতী (Gawar-Bati)
- (চ) খোওর (Khowar) বা চিত্রালী (Chitrali)
- (ছ) কোহিস্তানের ভাষাবর্গ (Kohistan Dialects)
- (জ) সিনা ভাষাবর্গ (Shina Dialects)
  - কাশ্মীরী Kashmiri) কিস্তওয়ারী (Kistawari)
  - গিলগিটী (Gilgiti)
  - চিলসী (Chilasi)
  - অস্তোরী (Astori)
  - গুরেজী (Gurezi)

* ODBL (তৃতীয় খণ্ড) হইতে গৃহীত

দশম অধ্যায়

ব্যাকরণের বিভাগ

"ব্যাকরণ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল বিশ্লেষণ। ব্যাকরণের কাজ হইল কোন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠন রীতি সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করা। ভাষা-বিজ্ঞানে ব্যাকরণের চারিটি বিভাগ আছে :—

বর্ণনাত্মক বা বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive or Synchronic Grammar)

এই ব্যাকরণে বিশেষ কোন কালের বা যুগের কোন ভাষার গঠনরীতি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা থাকে। যেমন—সংস্কৃত ব্যাকরণ, পালি ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের বিভিন্ন স্তরের বা অবস্থার বর্ণনা না করিয়া কোন একটি স্তরের বিশ্লেষণ করা হয়। **বর্ণনামূলক ভাষা বিশ্লেষণের (Descriptive Lingustics)** মধ্যে কোন ভাষার গঠন-প্রণালীর দিকটাই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। একটি ভাষা বা উপভাষার বর্তমান পর্যায়ের বা বিশেষ কোন স্তরের ভাষাতত্ত্বগত অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রকারের বিশ্লেষণকে **(Synchronic Description)** ও বলা হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical or Diachronic Grammar)

কোন ভাষায় উচ্চারণ রীতি, ধ্বনিতত্ত্ব, প্রত্যয়াদি আলোচনা করিবার সময় ভাষার প্রাচীনতর অবস্থায় ইহাদের কি রূপ ছিল সেই রূপান্তরের ধারাটি অনুসন্ধান করা ঐতিহাসিক ব্যাকরণের কাজ। যেমন, বাংলা ব্যাকরণের ঐতিহাসিক দিকের আলোচনায় প্রাচীন বাংলা, মধ্যবাংলা ও আধুনিক বাংলার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক আলোচনা থাকিবে।

তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar)

এই জাতীয় ব্যাকরণে কোন ভাষার প্রয়োগ রীতির সঙ্গে সমগোত্রীয় অন্যান্য ভাষার তুলনামূলক আলোচনা থাকে। যেমন, সংস্কৃতের তুলনামূলক ব্যাকরণে সংস্কৃতের সঙ্গে আবেস্তা, প্রাচীন পারসীক, গ্রীক, লাতিন, গথিক, লিথুয়ানীয় প্রভৃতি ভাষা সমূহের আলোচনা থাকিবে। বাংলার তুলনামূলক ব্যাকরণে বাংলার সঙ্গে অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার আলোচনা করিতে হইবে।

দার্শনিক-বিচারমূলক ব্যাকরণ (Philosophical or Psychological Grammar)

কোন ভাষার অন্তর্নিহিত চিন্তাধারাকে অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার উৎপত্তি ও ধারাবাহিক রূপান্তরের দিকটি আবিষ্কার করা এই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য।

ভাষাতত্ত্বগত প্রত্নবিদ্যা (Linguistic Palaeontology)

ভাষাতাত্ত্বিক প্রত্ন বিদ্যায় কোন জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের সহিত (Anthropology) এই শাখার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভাষার প্রাচীন রূপের পুনর্গঠনের ফলে প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও কিছু আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত নিদর্শনের অভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এই ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখাগুলিতে তুষারের কথা রহিয়াছে। বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকিলেও অর্থের পার্থক্য সুস্পষ্ট। গরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য জন্তুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই। সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র "শত" পাওয়া যায়। পারিবারিক সম্পর্কে কেবল নারীর আত্মীয়দের নাম দেখা যায়। বিবাহের পর কন্যা স্বামীর পরিবারের সঙ্গে বাস করিত। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে, আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি ঐ সমস্ত ধাতুর ব্যবহার জানিত। বিভিন্ন প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা সম্ভব হয়।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাকরণকে সাধারণত চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে :

(১) ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিবিচার (Phonemics) ও ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ; (২) রূপবিচার Morphemics), রূপতত্ত্ব (Morphology), রূপ-মূলক ধ্বনিতত্ত্ব (Morphophonemics) ; (৩) বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও (৪) শব্দার্থ-তত্ত্ব (Semantics) ।

কোন ভাষার ধ্বনি সমষ্টির শ্রেণীবিভাগ এবং ইহাদের প্রকৃতি বিচার ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত। ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচারের মধ্যে কোন ভাষার বিশেষ সময়ে ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির সম্যক আলোচনা করা হয়। আর ধ্বনিতত্ত্বে ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা থাকে। অর্থাৎ মূলভাষার ধ্বনিসমূহ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পরবর্তী ভাষাসমূহে কিভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হয়।
ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান **(Point of articulation)** এবং উচ্চারণরীতি **(Manner of articulation)** বিশ্লেষণ করিয়া ধ্বনিগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিতে বিন্যস্ত করা হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির উচ্চারণ স্থান বিশ্লেষণ **(Articulary Phonetics)** এবং শ্রুতিরূপ নির্ধারণ (Accoustic Phonetics) করা হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানের পরবর্তী স্তর হইতেছে ধ্বনির ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করা **(Phonemic analysis)**। এই পর্যায়ে

ধ্বনিসমূহের অবস্থান ও পরিবেশ (Environment) সম্বন্ধে আলোচিত হয়। কারণ অবস্থান বা পরিবেশ অনুযায়ী একই স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। মূলধ্বনি **(Phoneme)** এবং অন্তরধ্বনির **(Allophone)** অবস্থান যথাযথ বিশ্লেষিত হয়।

Phoneme-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যিয়া ভাষাতাত্ত্বিক Gleason বলিয়াছেন—"A phoneme is a class of sounds which : (1) are phonetically similar and (2) show certain characteristic patterns of distribution in the language or dialect under consideration."

রূপতত্ত্বে কোন ভাষার পদ সমূহের গঠন প্রণলী সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ আলোচনা থাকে। এই রীতি অনুযায়ী পদগুলিকে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় প্রভৃতি অংশে ভাগ করা হয়। বর্ণনামূলক ব্যাকরণে ভাষার রূপ সংগঠনের ক্ষেত্রে রূপমূলকে (Morpheme) অর্থযুক্ত ন্যূনতম ধ্বনি একক (Minimum meaningful sound unit) রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে, যেমন ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিমূলকে **(Phoneme)** অর্থশূন্য ন্যূনতম ধ্বনি একক (Minimum meaningless sound unit) ধরা হইয়াছে। একটি রূপমূল এক বা একাধিক অক্ষর নিয়া গঠিত হইতে পারে। রূপতত্ত্বে রূপমূল ও সহ রূপমূলসমূহকে (Allomorphs) তাহাদের অবস্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়। আর **রূপগত ধ্বনিতত্ত্বের শাখায়** (Morphophonemics) রূপমূলের মধ্যে ধ্বনিমূলের যদি কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে, তবে তাহার সম্যক বিশ্লেষণ করা হয়।

Gleason Phoneme ও Morpheme এর পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"A morpheme is typically composed of one to several phonemes. The morpheme differs fundamentally from the phoneme, which has no such relationship with content. That is, phonemes have no meanings ; morphemes have meanings."

এক বা একাধিক সহরূপমূলের সমন্বয়ে রূপমূল গঠিত হয়। Gleason এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—' A morpheme is a group of one or more allomorphs which conform to certain usually rather, clearly definable, criteria of distribution and meaning."

অতিরিক্ত রূপমূল (suprasegmental morpheme) [যতি এবং ধ্বনিতরঙ্গ] বাক্য গঠনে অর্থপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

বাক্যরীতি বলিতে আমরা বুঝি—বাক্যে পদসমূহ কিরূপে প্রযুক্ত হয় তাহার সম্যক বিশ্লেষণ। **বাক্যতত্ত্বে** রূপমূলসমূহের সংযোগে গঠিত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। **শব্দার্থতত্ত্বে** শব্দের অর্থ-বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়া থাকে।

ধ্বনি-বিজ্ঞান (Phonetics)

প্রত্যেক ভাষাতেই কয়েকটি মূলস্বর ধ্বনি ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি আছে। এই ধ্বনিমূল (Phoneme) হইল সে ভাষার প্রাণ। ধ্বনি-প্রবাহ অর্থনির্দেশক কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইলে এক একটি বাক্যের সৃষ্টি হয়। এক একটি বাক্য হইতেছে ভাষার ইউনিট (Sentence is the unit of language)। একটি অক্ষর যেমন শব্দ হইতে পারে, তেমনি একটি শব্দ ও একটি বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। অনর্গল কথাবার্তার সময় এক একটি ধ্বনির নানাপ্রকার পরিবর্তন হইতে পারে।

ধ্বনির উৎপত্তি বিচার

বাগ্‌যন্ত্রের (larynx) মধ্যে দুইটি স্বরতন্ত্রী (vocal cords) সমান্তরালভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। কথা বলিবার সময় স্বরতন্ত্রী দুইটি নানাভাবে কার্যকরী হইয়া উঠে। ফুসফুস তাড়িত নিঃশ্বাস বায়ু শ্বাসনালীদ্বয়ের (trachea) মধ্য দিয়া কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়ে। পরে কণ্ঠ, মুখবিবর অথবা নাসিকাপথে বাহির হয়। এই কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাস বায়ু বহির্গত হওয়ার সময় মুখবিবরে কোথাও না কোথায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বাধার স্থান ও প্রকৃতি অনুসারে ধ্বনিসমূহের শ্রেণীবিভাগ ঘটে। কথা বলিবার সময় স্বরতন্ত্রী দুইটির কম্পন কখনও মৃদু কখনও তীব্র হয়।

ধ্বনি-গঠনকালে স্বরযন্ত্রের এই কম্পন অব্যাহত থাকিলে অনুরণনজনিত সুরের উৎপত্তি হয়। তখনই আমরা সঘোষ (Voiced) ধ্বনিগুলি পাই। আর কম্পন ব্যাহত হইলে যে ধ্বনিগুলির উদ্ভব হয় সেইগুলি হইল অঘোষ (unvoiced); অর্থাৎ অঘোষধ্বনি উচ্চারণ করিবারকালে কণ্ঠতন্ত্রী শিথিলভাবে অবস্থান করে; ফলে কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু সহজে নির্গত হয়। স্বরধ্বনি স্বাধীনভাবে এবং ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরাশ্রিত হইয়া উচ্চারিত হয়।

বাংলার সমস্ত স্বরধ্বনি ঘোষবৎ। মুখবিবরের সম্মুখ বা পশ্চাৎভাগ যেখান হইতেই এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হউক না কেন, স্বরতন্ত্রীর প্রকম্পন অটুট থাকে। স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে ফুসফুস প্রেরিত বাতাস মুখবিবর দিয়া নির্গত হওয়ার সময় কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না। স্বরতন্ত্রীর মধ্য দিয়া বাতাস নির্গত না হইলে স্বরতন্ত্রীয় (Glottal) ধ্বনিগুলির উদ্ভব হয়।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বাংলা হরফ মোটামুটি ধ্বনিমূলক (Phonetic); আর সূক্ষ্মবিচারে মূলধ্বনিমূলক (Phonemic)। লিপির সাহায্যে ধ্বনি সমূহের বাহিক রূপটি

প্রকট হইলেও প্রত্যেক ধ্বনির অন্তর্নিহিত বিভিন্ন গুণের কিংবা এক ধ্বনির সংস্পর্শে অন্যধ্বনির রূপান্তরের ধারাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করার পদ্ধতি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। আজকাল কাইমোগ্রাফি, পালটোগ্রাফি, স্পেক্‌টোগ্রাফি ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনিসমূহের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা চলিতেছে। আবার টেপরেকর্ড বা ডিস্কের সাহায্যে কোন ভাষার কথোপকথন এবং উচ্চারণ পদ্ধতি যথাযথভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়।

সেজন্য কোন ভাষারই বর্ণমালা সেই ভাষার ধ্বনিসমূহ যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত নহে। অনেক সময় একই বর্ণমালার সাহায্যে একাধিক ধ্বনি রূপায়িত হয়, আবার একই ধ্বনির দ্যোতনার জন্য একাধিক বর্ণের প্রচলন রহিয়াছে। বাংলার বর্ণমালা মোটামুটি সংস্কৃতের অনুসারী হইলেও বাংলার ধ্বনি সমষ্টিতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাহার যথার্থরূপ দেওয়ার জন্য বাংলা লিপির প্রয়োজনমত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

ভাষা পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে ভাষা পরিবর্তিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা নির্বাহের বিচিত্র প্রণালীর জন্য ভাষার পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃত ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলি কণ্ঠ্যবর্ণ ছিল। সাড়ে তিন হাজার বৎসরের বিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষার যে রূপ আমরা পাই, তাহাতে এই দেশের আবহাওয়ায় এই ধ্বনিগুলি কণ্ঠ-নিঃসৃত (uvular) না হইয়া জিহ্বামূলীয় (velar) ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে।

সেইরূপ সংস্কৃতের তালব্য বর্ণগুলি বাংলায় আর তালব্যধ্বনি নহে, এইগুলি এখন ঘৃষ্টবর্ণ।

প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ যখন কথাবার্তার সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করে, তখন ধ্বনিগুলিকে বা ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত শব্দগুলিকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করে না। ফুসফুস তাড়িত বাতাসের সাহায্যেই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। সেজন্য প্রত্যেকটি ধ্বনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি নিঃশ্বাসবায়ুর স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তাহাই হইল **অক্ষর** (syllable)। অক্ষরের সমন্বয়ে শব্দ সৃষ্ট হইয়া সেইগুলি পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয়। স্থানবিশেষে এক একটি ছোট শব্দ দ্বারাও একটি পূর্ণ বাক্যের অর্থ দ্যোতিত হইতে পারে।

প্রত্যেকটি ধ্বনিই হইল ভাষার মূল ভিত্তি। প্রত্যেক ভাষারই মূলধ্বনিগুলির (Phoneme) একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থান রহিয়াছে। কিন্তু শ্রুত ধ্বনিগুলির কোন নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থান নাই। দ্রুত কথোপকথনে কিংবা বক্তৃতার সময় মানুষের মুখ দিয়া যখন

অনর্গল কথা বাহির হয়, তখন কোন কোন ধ্বনির উচ্চারণে পরিবর্তন দেখা যায়। আবার কোন ধ্বনিই বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হয় না। কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনিমূল মৌল একক, কিন্তু লেখ্য ভাষারক্ষেত্রে মৌল একক হইতেছে বর্ণ বা অক্ষর।

ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ দুইভাগে করা হয়। প্রথম বিভাগ হইতেছে—

(১) অঘোষ (unvoiced, voiceless, breathed)

(২) সঘোষ বা ঘোষবৎ (voiced)

অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার কালে কণ্ঠতন্ত্রী শিথিলভাবে অবস্থান করে; ফলে কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু সহজে নির্গত হয়। স্বরতন্ত্রীর কম্পন অনুভূত হয় না। আবার শ্বাসবায়ু বাধা অপসারিত করিয়া বহির্গত হইবার সময় কণ্ঠতন্ত্রীর অনুরণনের ফলে ঘোষ বা স্বরের উৎপত্তি হয়। তখনই আমরা ঘোষবৎ ধ্বনিগুলি পাই, অর্থাৎ ঘোষধ্বনির উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে।

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স হইতেছে অঘোষ ধ্বনি (Voiceless বা Unvoiced sounds) অথবা শ্বাসধ্বনি (Breath sounds, Hard sounds বা Tenues)। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ ঘোষ-বর্ণ (Voiced sounds) বা নাদ-বর্ণ (Soft sounds বা Mediae)। আর সমস্ত স্বরধ্বনিগুলি ঘোষবৎ বর্ণ। কোন কোন ভাষায় **অঘোষ স্বরধ্বনির (Whispered vowels)** ও অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিবার সময় এই ধ্বনিগুলি শোনা যায়।

ধ্বনি সমূহের দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইতেছে স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণকালে নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে কোথাও কোন প্রকার বাধা পায় না। বায়ুপ্রবাহ অনায়াসে মুখের মধ্য দিয়া নির্গত হয়। কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে বাধার সৃষ্টি হয়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে **"বিভাজিত ধ্বনিমূল" (Segmental Phonemes)** বলা হয়; কারণ শব্দের প্রত্যেকটি ধ্বনিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

আধুনিক চলিত বাংলায় ব্যবহৃত ধ্বনি মূলের তালিকায় **সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি, উনত্রিশটি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং দুইটি অর্ধস্বর পাওয়া যায়।**

বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা তেরটি—যথা, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ। কিন্তু **সাধু ও চলিত** ভাষায় ব্যবহৃত বিশিষ্ট স্বরধ্বনি হইল সাতটি— অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা' ও।

এইগুলি আন্তর্জাতিক ধ্বনি নির্দেশক বর্ণমালায় (International Phonetic Scripts)—যথাক্রমে ɔ, *a*, i, u, e, æ, o রূপে দ্যোতিত হয়। এ ছাড়া **প্রাদেশিক উচ্চারণে** আমরা **আরো দুইটি** স্বরধ্বনি পাই—আ' (a), এ' (e')। তাহা হইলে বাংলায় **মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal Vowels)** হইল মোট নয়টি। প্রত্যেকটিই **এক একটি মূলধ্বনি** (Phoneme)। মূল স্বরধ্বনিগুলি নানাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে। বাংলায় মৌলিকধ্বনি বিচারে দীর্ঘ ঈ বা দীর্ঘ ঊ-এর কোন স্থান নাই। আবেগের তারতম্য অনুসারে ক্ষেত্র বিশেষে একই শব্দের স্বরধ্বনির উচ্চারণ হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে। জিহ্বার এবং ওষ্ঠদ্বয়ের অবস্থানের উপর স্বরধ্বনির স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন তিনভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে—(১) জিহ্বাকে সম্মুখভাগে প্রসারিত করিয়া বা পশ্চাদ্ভাগে আকৃষ্ট করিয়া, (২) জিহ্বাকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া কিংবা নীচে নামাইয়া, (৩) ওষ্ঠদ্বয়কে কুঞ্চিত বা প্রসৃত করিয়া।

(১) জিহ্বার প্রসারণ ও আকর্ষণ—

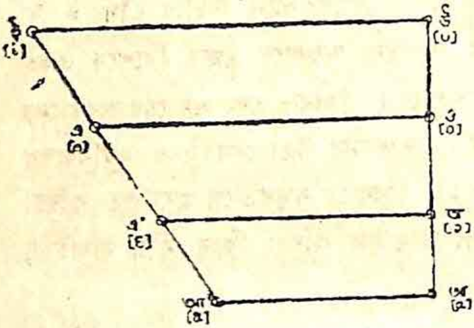
ই, এ, এ', অ্যা', আ—এই ধ্বনি কয়টির উচ্চারণের সময় জিহ্বা সম্মুখভাগে চলিয়া আসে বলিয়া ইহাদিগকে সম্মুখ বা সম্মুখাবস্থিত **(Front vowels)** স্বরধ্বনি বলা হয়। এই স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণকালে জিহ্বার সম্মুখের অংশ তালুর শক্ত (hard palate) দিকে উঁচু করিতে হয় বলিয়া এগুলিকে তালব্য স্বরধ্বনি **(Palatal vowels)** বলা হয়। সম্মুখাবস্থিত স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় ওষ্ঠদ্বয় অল্পবিস্তর প্রসৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **প্রসৃত স্বরধ্বনি (Spread** বা **Rotracted vowels)** ও বলা হয়।

ই-কারের উচ্চারণের সময় জিহ্বা সর্বাপেক্ষা উচ্চে অবস্থান করে, সেজন্য ইহা উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনি (High vowel)। এ-কারের উচ্চারণকালে জিহ্বা আরো একটু নীচে নামিয়া যায় বলিয়া ইহাকে উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি (High-mid vowel) বলা হয়। এ' এবং অ্যা'-এর উচ্চারণকালে জিহ্বা আরো একটু নীচে অবস্থান করে, এইহেতু ইহারা নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি (Low-mid vowel); আর আ' হইতেছে নিম্নস্বরধ্বনি (Low vowel)। এ, অ্যা'র উচ্চারণের সময় জিহ্বার পশ্চাদংশ খানিকটা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেজন্য এই দুইটিকে কণ্ঠ-তালব্য (Palato-guttural vowel) বলা হয়। উ, ও, অ (ও')—এই ধ্বনি কয়টির উচ্চারণের সময় জিহ্বা পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদিগকে **পশ্চাৎ বা পশ্চাদবস্থিত স্বরধ্বনি (Back vowels)** বলা হয়। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় প্রলম্বিত হইয়া বর্তুল বা গোলাকার প্রাপ্ত হয়; এইহেতু এই ধ্বনিগুলিকে ওষ্ঠ্য (Labial), বর্তুল বা কুঞ্চিত (Rounded) ধ্বনি বলা হয়।

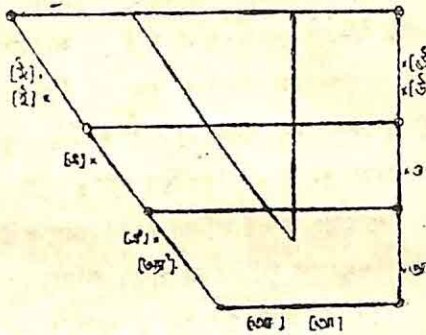
ও-কার এবং অ-কারের উচ্চারণে জিহ্বা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া এই দুইটি কণ্ঠোষ্ঠ্য স্বরধ্বনি (Labio-guttural)। এই ধ্বনিগুলির মধ্যে "উ" ই-কারের মত উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনি, "ও" উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি, "অ" নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি।

মুখের সম্মুখ এবং পশ্চাভাগের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত বলিয়া বাংলা 'আ' কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত (Low Central) ধ্বনি।

১নং চিত্র



২নং চিত্র



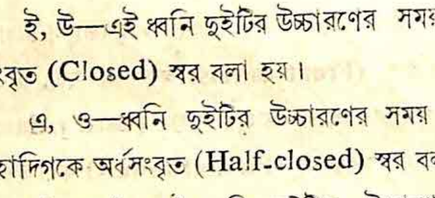
ই, উ—এই ধ্বনি দুইটির উচ্চারণের সময় মুখবিবর সংবৃত থাকে বলিয়া ইহাদিগকে সংবৃত (Closed) স্বর বলা হয়।

এ, ও—ধ্বনি দুইটির উচ্চারণের সময় মুখবিবর অনেকটা সংবৃত থাকে বলিয়া ইহাদিগকে অর্ধসংবৃত (Half-closed) স্বর বলা হয়।

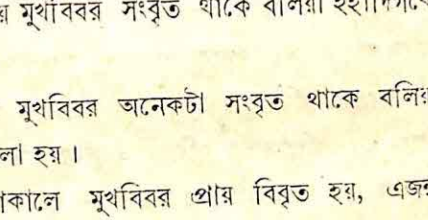
এ', অ্যা'—এই ধ্বনি দুইটির উচ্চারণকালে মুখবিবর প্রায় বিবৃত হয়, এজন্য ইহাদিগকে অর্ধবিবৃত (Half-open) বলা হয়।

আ', আ—এই ধ্বনি দুইটির উচ্চারণের সময় মুখবিবর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে বলিয়া এই ধ্বনি দুইটিকে বিবৃত (open) স্বর বলা হয়।

নিম্নলিখিত ১নং চিত্রে মৌলিক স্বরধ্বনি ও ২নং চিত্রে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বাংলার ব্যবহৃত স্বরধ্বনি দেখানো হইল।



জিহ্বা সম্মুখ ভাগে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি



জিহ্বা পশ্চাৎ ভাগে আকর্ষণ করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি

বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী বর্গীকরণ।

	সম্মুখাবস্থিত (front) প্রসৃত (spread)	কেন্দ্রীয় (Central) বিবৃত (Open)	পশ্চাদবস্থিত (Back) বর্তুল (Rounded)
উচ্চ (High)	ই, (ঈ) i		উ (ঊ) u
উচ্চ-মধ্য High-mind	এ (e)		ও (o)
নিম্ন-মধ্য (Low-mind)	এ' (e') অ্যা' (æ)		অ (ɔ)
নিম্ন (Low)	আ' (ȧ)	আ (*a*)	

সংবৃত	ই, উ
অর্ধ-সংবৃত	এ, ও
অর্ধ-বিবৃত	এ', অ্যা', অ
বিবৃত	আ', আ

যৌগিকস্বর, সন্ধ্যক্ষর, দ্বি-স্বর ধ্বনি বা দ্বৈতস্বর (**Dipthongs**)—দুইটি স্বরধ্বনির সংযোগে বিভিন্ন যৌগিকস্বর বা সন্ধ্যক্ষরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাংলা বর্ণমালায় আমরা মাত্র দুইটি যৌগিক স্বর পাই :—

ঐ (=ওই); ঔ (=ওউ)। সংস্কৃতে ঐ-এর উচ্চারণ ছিল আ+ই=আই।

যথা— নৈ+অক>নাই+অক>নাইঅক=নায়ক ;

গৈ+অক>গাই+অক>গাইঅক=গায়ক।

তদ্রূপ সংস্কৃত ঔ-এর উচ্চারণ ছিল আ+উ=আউ।

যথা—নৌ+ইক>নাউ+ইক=নাবিক।

বাংলা বর্ণমালায় অন্যান্য যৌগিক স্বরধ্বনির জন্য পৃথক বর্ণ নাই। মৌলিক স্বরগুলিকে পাশাপাশি লিখিয়া কিংবা য়-কারের সহিত যুক্ত করিয়া অন্যান্য যৌগিক স্বরধ্বনিগুলি প্রকাশ করা হয়।

চলিত ভাষায় অন্তত **পঁচিশটি** যৌগিক স্বরধ্বনির প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা—

(১) ইই (i-i)—দিই, করিই।

(২) ইউ (iu)—পিউ, মিউ-মিউ।

(৩) ইআ (ia)—নিয়া, গিয়া।

(৪) ইয়ে (ie)—নিয়ে, দিয়ে।

(৫) ইও (io)—নিও, দিও।

(৬) এআ (*ea*)—খেয়া, দেয়া।

(৭) এও (eo)—মেও, চেয়ো।

(৮) এউ (eu)—কেউ, ঘেউ-ঘেউ।

(৯) এ্যা'ও (æo)—ম্যাও, হ্যাও।

(১০) এ্যায় (æe)—হ্যায়, ন্যায়।

(১১) আই (ai)—খাই-দাই, যাই।

(১২) আও (ao)—যাও, গাও।

(১৩) আউ (*a*u)—দাউ-দাউ, কাউ-কাউ (কথ্য ভাষায়)

(১৪) আয় (*a*e)—গায়, যায়, নায়।

(১৫) অও (ɔo)—কও, হও।

(১৬) অয় (ɔe)—হয়, সয়, নয়।

(১৭) অআ, অওয়া (ɔ*a*)—সআ, সওয়া।

(১৮) ওআ (o*a*)—ধোয়া, মোয়া।

(১৯) ও-ও (o-o)—শোও, বোও।

(২০) ওউ, ঔ (ou)—বউ, বৌ, মউ, মৌ।

(২১) ওই, ঐ (oi)—বই [বোই], দৈ।

(২২) ওয় (oe)—ধোয়, শোয়।

(২৩) উই (ui)—যূঁই, পূঁই।

(২৪) উঅা, উয়া (u*a*)—কূয়া, জুআ

(২৫) উও, উয়ো (uo)—কূয়ো, ধুয়ো।

এতদ্ব্যতীত বাংলায় তিনটি, চারিটি এবং পাঁচটি স্বরধ্বনির মিশ্রণে ও যৌগিক-স্বর গঠিত হইতে পারে।

যেমন, তিনটি স্বরধ্বনি (tripthongs)

ইয়েই (iei)—দিয়েই, নিয়েই।

এইএ (eie)—বেইএ (=বাহিয়া)

এইও (eio)—হেঁইয়ো।

আউআ (*a*u*a*)—কাউআ। (উপভাষায়)

আইও (aio)—যাইও, খাইও।

চারিটি স্বরধ্বনির (tetrapthongs) সমবায়ে উৎপন্ন যৌগিক স্বর—

আও আয় (*a*o*a*e) (কথ্য ভাষায়), গাওআয়।

পাঁচটি স্বরধ্বনি (Pentapthongs)—

আওআইও (*a*oaio), আওআইআ (*a*oaia)—যেমন, খাওআইও, খাওয়াইয়া ইত্যাদি।

একটি সরল অথবা যৌগিক স্বরধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া শব্দে প্রযুক্ত এক একটি **অক্ষর (syllable)** হয়।

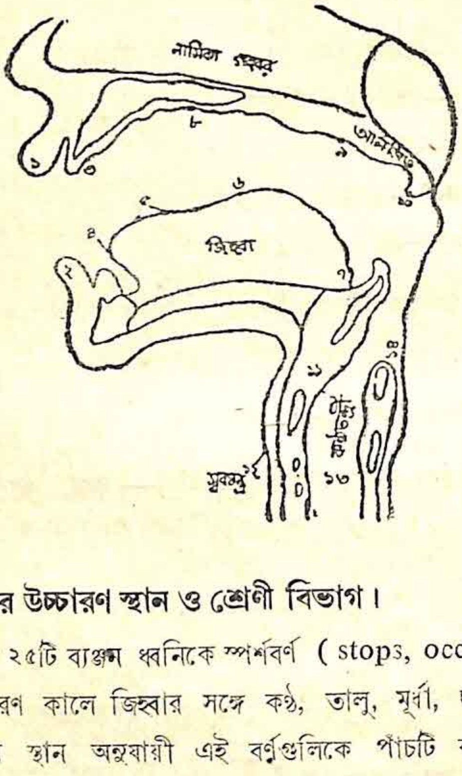
অক্ষর দ্বিবিধ—(ক) **স্বরান্ত (open)** (খ) **ব্যঞ্জনান্ত (closed)**।

আনুনাসিক বা সানুনাসিকস্বর (Nasalised Vowels)

বাংলায় স্বরধ্বনিগুলিকে সানুনাসিক করিয়া উচ্চারণ করা যায়। এই স্বরধ্বনিগুলি একই সঙ্গে মুখবিবর ও নাসিকার মিলিত দ্যোতনায় উচ্চারিত হয়। বাংলায় চন্দ্রবিন্দু (ँ) দিয়া সানুনাসিক ভাব প্রদর্শিত হয়। ইংরেজীতে সানুনাসিক স্বরধ্বনি নাই—কিন্তু ফরাসী ভাষায় সানুনাসিক স্বরের আধিক্য দেখা যায়। সাধু ও চলিত ভাষায় আনুনাসিক স্বরধ্বনির প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে। পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে সাধারণত আনুনাসিক স্বরের প্রয়োগ নাই, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের (নোয়াখালী-চট্টগ্রাম) উপভাষাগুলিতে আনুনাসিক ধ্বনির বিশেষ প্রাচুর্য দেখা যায়। যেমন, আঁই<আমি; আঁশ<আকাশ; কুঁর< কুকুর ইত্যাদি।

স্বরধ্বনি সানুনাসিকত্ব প্রাপ্ত হইলে অনেক ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। যেমন, কাদা (কর্দম অর্থে); কাঁদা (ক্রন্দন অর্থে); কুড়ি (বিশ অর্থে); কুঁড়ি (কোরক); বাধা (বিঘ্ন); বাঁধা (বন্ধন)।

বাগ্‌যন্ত্রের চিত্র



১। ওষ্ঠ
২। অধর
৩। দন্তমূল
৪। জিহ্বামুখ
৫। অগ্রজিহ্বা
৬। পশ্চাৎজিহ্বা
৭। জিহ্বামূল
৮। শক্ততালু
৯। নরমতালু
১০। আলজিভ
১১। কণ্ঠমূল
১২। স্বরযন্ত্র
১৩। কণ্ঠতন্ত্রী
১৪। গলনালী

বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও শ্রেণী বিভাগ।

ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত ২৫টি ব্যঞ্জন ধ্বনিকে স্পর্শবর্ণ (stops, occlusives) বলা হয়। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ কালে জিহ্বার সঙ্গে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, দন্তমূল ও ওষ্ঠের স্পর্শ ঘটে। স্পর্শের স্থান অনুযায়ী এই বর্ণগুলিকে পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বর্গে পাঁচটি করিয়া ধ্বনি আছে।

(১) ক-বর্গ বা কণ্ঠ্যবর্ণ (Gutturals, Velars)—ক, খ, গ, ঘ, ঙ

(২) চ-বর্গ বা তালব্যবর্ণ (Palatals)—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

(৩) ট-বর্গ বা মূর্ধন্য বর্ণ (Cerebrals, Cacuminals বা Retroflex sounds) —ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

(৪) ত-বর্গ বা দন্ত্যবর্ণ (Dentals)—ত, থ, দ, ধ, ন

(৫) প-বর্গ বা ওষ্ঠ্য বর্ণ (Labials)—প, ফ, ব, ভ, ম

এই বর্ণগুলির মধ্যে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম নাসিক্য ধ্বনি। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণকালে মুখবিবরস্থ বায়ু মুখপথে বহির্গত না হইয়া নাসিকা দিয়া নিঃসৃত হয়, কিংবা যুগপৎ মুখ

ও নাসা-পথে ও বাহির হইতে পারে। মূল গহ্বরকে চারিটি অংশে ভাগ করা যায়—(ক) দন্তমূল (Alveolae, teeth ridge) ; (খ) শক্তভালু (hard palate) ; (গ) নরম তালু (velum, soft palate) (ঘ) আলজিভ (uvula)।

মুখ বিবরে ধ্বনির বিভিন্ন উচ্চারণ স্থান হইতেছে—(১) ওষ্ঠ, (২) দন্ত, (৩) দন্তমূল, (৪) কঠিনতালু—সম্মুখভাগ, (৫) কঠিনতালু—পশ্চাদ্ভাগ (মূর্ধা), (৬) কোমলতালু, (৭) অলিজিহ্বা (আ'লজিভ) (৮) কণ্ঠস্থিত শ্বাস-নালী (Trachea, Windpipe), (৯) অধর, (১০) জিহ্বাগ্র, (১১) জিহ্বার অধোভাগ, (১২) জিহ্বামূল। (১৩) কণ্ঠতন্ত্রী (Vocal cords)।

মুখ গহ্বরের মত জিহ্বাকে চারিটি অংশে ভাগ করা যায়।

(১) জিহ্বামুখ (Apex) ; (২) জিহ্বাগ্র (front) ; (৩) পশ্চাৎজিহ্বা (Back, dorsum) ; (৪) জিহ্বার গোড়ালি (Root)।

জিহ্বামুখ দন্ত, দন্তমূল ও কঠিন তালুকে স্পর্শ করে। এ জন্য দন্ত্য, দন্তমূলীয় ও মূর্ধন্য বর্ণগুলিকে **জিহ্বামুখ্য ধ্বনি (Apical)** বলা হয়।

জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূল, কঠিন তালু কিংবা নরম তালুকে (Velum, soft palate) স্পর্শ করে। এই হেতু তালুদন্তমূলীয় ও অগ্রতালব্য ধ্বনিগুলিকে **অগ্রজিহ্ব্যধ্বনি (frontal)** বলা হয়। [য়, শ, ঞ]

জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ নরম তালুর যে কোন অংশ কিংবা অলিজিহ্বাকে স্পর্শ করে। এজন্য তালব্য, কণ্ঠ্য ও কণ্ঠমূলীয় ধ্বনিগুলিকে **পশ্চজিহ্ব্যধ্বনি (Dorsal)** বলা হয়। [ক, গ, য়]।

বাংলার উচ্চারণ স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যায়।

(১) কণ্ঠনালীয় বা স্বরযন্ত্রীয় (Glottal, Laryngeal)—ঃ, হ (h)

(২) জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত (Velar)—ক, খ, গ, ঘ, ঙ

(৩) তালব্য (Palatal)—য়

(৪) অগ্রতালব্য (Pre-palatal) চ, ছ, জ, শ

(৫) মূর্ধন্য বা প্রতিবেষ্টিত (Cacuminal, Retroflex)—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ড়, ঢ়

(৬) দন্ত্য (Dental)—ত, থ, দ, ধ

(৭) দন্তমূলীয় (Alveolar)—ন, র, ল, ব, স

(৮) ওষ্ঠ্য (Labial)—প, ফ, ব, ভ, ম

(৯) দন্তৌষ্ঠ্য (Labio-dental)—ফ, ভ

কণ্ঠনালীয়—কণ্ঠনালীর সঙ্কোচনের ফলে পেশী যখন বাধা প্রাপ্ত হয় তখন কণ্ঠনালীয় বা গলনালীয় ধ্বনির উৎপন্ন হয়। ঃ ও হ কণ্ঠনালীয় ধ্বনি। কণ্ঠনালীতে সৃষ্ট হ-কার উষ্মঘোষ ধ্বনি। ঃ হইতেছে হ-কারের অঘোষ ধ্বনি। যেমন আঃ, উঃ, ওঃ ইত্যাদি। আরবী (') [আলিফ্ হাম্‌জা] কণ্ঠনালীয় ধ্বনি।

জিহ্বামূলীয় (পশ্চাত্তালুজাত)—জিহ্বার মূল বা গোড়ালি দ্বারা তালুর কোমল অংশ স্পর্শিত হইলে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। ক-বর্গের ধ্বনিগুলি জিহ্বামূলীয়। সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে বাংলা ব্যাকরণে এই বর্ণগুলিকে কণ্ঠ্যবর্ণ রূপে লেখা হয়। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় ক-বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান কণ্ঠই ছিল। কিন্তু ভাষার পরিবর্তনের ফলে বাংলায় এই ধ্বনিগুলি কণ্ঠ নিঃসৃত (uvular) না হইয়া জিহ্বামূলীয় হইয়াছে।

তালব্যবর্ণ—জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা তালুর পশ্চাৎ অংশ স্পর্শিত হইলে তালব্যধ্বনি উচ্চারিত হয়। বাংলায় "য়" তালব্য বর্ণ। ইহা পশ্চজিহ্ব্য (Post-palatal বা dorsal) ধ্বনি। সংস্কৃত চ-বর্গের ধ্বনিগুলি স্পৃষ্ট বর্ণ ছিল। কিন্তু বাংলায় ইহারা স্পৃষ্টধ্বনি নহে, ঘর্ষণজাত ধ্বনি। জিহ্বা ও তালুর ঘর্ষণের ফলেই এই ধ্বনিগুলির উৎপত্তি হয়। সেজন্য ইহাদিগকে ঘৃষ্টবর্ণ (Affricate) বলে। চলিত বাংলায় চ, ছ, জ, শ প্রভৃতি বর্ণগুলি তালুদন্তমূলীয় (Alveo-palatal)। জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূল ও তাহার সংলগ্ন অংশ স্পর্শ করিলে এই ধ্বনিগুলি শ্রুত হয়। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক চ, ছ, জ; ধ্বনি ত্রয়কে প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি (Dorso-Alveolar) এবং "শ" কে পশ্চাৎদন্তমূলীয় (Post-alveo'ar) ধ্বনি বলিয়াছেন। তবে আঞ্চলিক উপভাষায় এই ধ্বনিগুলি বিশুদ্ধ ঘৃষ্ট। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে চ, ছ, জ, ঝ দন্তঘৃষ্টবর্ণ রূপে (Dental affricate) উচ্চারিত হয়। [চ=ts, ছ=s, জ=dz, ঝ=z']। আবার জিহ্বার অগ্রভাগদ্বারা তালুর সম্মুখ অংশ স্পর্শিত হইলে অগ্রতালব্য (Pre-palatal) ধ্বনি পাওয়া যায়। তালুদন্তমূলীয় ও অগ্রতালব্য ধ্বনিগুলিকে অগ্রজিহ্ব্য (Frontal) ধ্বনি বলা হয়। জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ তালুর নীচের অংশ (Velum) স্পর্শ করিলে কণ্ঠ্য (Velar), আর আলজিভে বা তৎসংলগ্ন স্থান স্পর্শ করিলে কণ্ঠমূলীয় বা আলজিহ্ব্য (uvular) ধ্বনির উদ্ভব হয়। সংস্কৃতে ক-বর্গের ধ্বনি কণ্ঠ্য। আরবী "q" কণ্ঠমূলীয়।

তালব্য, কণ্ঠ্য ও কণ্ঠমূলীয় ধ্বনিগুলিকে পশ্চজিহ্ব্য ধ্বনি (Dorsal) বলা হয়।

মূর্ধন্যবর্ণ

জিহ্বার অগ্রভাগ প্রতিবেষ্টিত করিয়া তালুর কঠিন অংশ স্পর্শ করিলে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। মূর্ধায় স্পর্শ ঘটে বলিয়া ইহাদিগকে মূর্ধন্যবর্ণ বলা হয়। কঠিন ও নরম

তালুর সঙ্গম স্থলকেই মূর্ধা বলা হয়। জিহ্বার অগ্রভাগকে উল্‌টাইয়া এই ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ করা হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রতিবেষ্টিত (Retroflex) ধ্বনি বলে। দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গোষ্ঠীতে ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলি মূর্ধন্যধ্বনিরূপে উচ্চারিত হইলেও বাংলায় এই ধ্বনিগুলি বিশুদ্ধ মূর্ধন্যধ্বনি নহে ; এখন ইহারা দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনি (Alveolo-Retroflex)। ইংরেজী t, d ধ্বনি বাংলা মূর্ধন্য ধ্বনি ট, ড নহে। t, d এর উচ্চারণ-কালে জিভের ডগা উল্‌টানো হয় না ; উচ্চারণ স্থান মূর্ধার অনেক নীচে দন্তমূলের উপরিভাগ (Alveolam বা Teeth-ridge)।

দন্ত্যবর্ণ

উপরের পাটির দাঁতের দ্বারা নিম্নভাগ স্পর্শিত হইলে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। দাঁতের সঙ্গে জিহ্বার স্পর্শ ঘটে বলিয়া ইহাদের নাম দন্ত্যবর্ণ।

দন্তমূলীয়

জিহ্বার অগ্রভাগ যখন দন্তমূলে স্পর্শ করে, তখন এই ধ্বনিগুলিকে দন্তমূলীয় বলা হয়।

দন্ত্য, দন্তমূলীয় ও মূর্ধন্যধ্বনি জিহ্বামুখ্যধ্বনি (Apical)।

ওষ্ঠ্যবর্ণ

এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ কালে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। দুইটি ওষ্ঠের স্পর্শ-জনিত ধ্বনি হইতেছে বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Bilabial)। বাংলায় প-বর্গের ধ্বনিগুলি (প, ফ, ব, ভ, ম) ওষ্ঠ্য বর্ণ।

দন্তৌষ্ঠ্য

অধর ও উপরের পাটির দাঁতের স্পর্শের ফলে এই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। বাংলায় ফ, ভ বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃষ্টবর্ণ নহে। এই বর্ণ দুইটি এখন উষ্মধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ এই ধ্বনিগুলিকে টানিয়া প্রলম্বিত করা যায়। বাংলায় ফ ও ভ এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী f ও v এর মত। চলতি বাংলায় এই ধ্বনি দুইটি **দন্তৌষ্ঠ্য উষ্মধ্বনি (Labio-Dental or Denti-Labial fricative sound)** ।

ওষ্ঠ্যকে সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিয়া যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাহাকে সম্মুখ প্রসারিত ওষ্ঠ্যধ্বনি (Protruded) বলা হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনির গঠনভিত্তিক শ্রেণী —স্পৃষ্ট, ঘৃষ্ট ও উষ্মধ্বনি সমূহ বিঘ্নিত শ্রেণীভুক্ত (obstruent system) ; নাসিক্য, পার্শ্বিক, কম্পনজাত ও অর্ধস্বর—এই ধ্বনিগুলি অনুরণন গত (Sonarant system)।

উচ্চারণ-কালে শ্বাসবায়ুর নির্গমনের বাধার প্রকৃতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি সমূহের রূপভেদ ঘটে। শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইলে **স্পৃষ্ট (Plosive, mute** বা **stop) ধ্বনি,** আংশিক বাধা পাইলে **উষ্মধ্বনির (Fricative, spirant) উদ্ভব হয়।** নাসা কিংবা মুখবিবরে প্রতিধ্বনিত হইয়া নাসাপথে অথবা মুখপথে কিংবা যুগপৎ নাসা এবং মুখ পথে শ্বাসবায়ু বহির্গত হইলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাহাকে বলা হয় **রণিত (Resonant)**।

স্পৃষ্টবর্ণ—ক, গ; ত, দ, প, ব ইত্যাদি।

উষ্মবর্ণ—শ, ষ, স, হ।

রণিত—ন, ম, র, ল।

উচ্চারণ-রীতি অনুসারে নিম্নলিখিত ভাবে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

(১) স্পৃষ্ট (Plosive)

অঘোষ অল্পপ্রাণ—ক, ট, ত, প

" মহাপ্রাণ—খ, ঠ, থ, ফ

ঘোষ অল্পপ্রাণ—গ, ড, দ, ব

" মহাপ্রাণ—ঘ, ঢ, ধ, ভ

(২) ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্ট—(affricate)

অল্পপ্রাণ—চ, জ

মহাপ্রাণ—ছ, ঝ

(৩) নাসিক্য

ঘোষ অল্পপ্রাণ—ঙ, ন, ম

" মহাপ্রাণ—হ্ন (ন্‌হ), হ্ম (ম্‌হ)

(৪) পার্শ্বিক—ঘোষ অল্পপ্রাণ বা তরল (Liquid)—ল

" মহাপ্রাণ হ্ল (ল্‌হ)

(৫) কম্পন-জাত (trilled)—ঘোষ অল্পপ্রাণ বা তরল—র

ঘোষ মহাপ্রাণ হ্র (র্‌হ)

(৬) তাড়ন-জাত (Flapped)—অল্পপ্রাণ ঘোষ—ড়

মহাপ্রাণ ঘোষ—ঢ়

(৭) উষ্ম বা শ্বাসধ্বনি (শিশ্ধ্বনি)

(ক) দন্তমূলীয়—স

(খ) তালুদন্তমূলীয়—শ

(গ) দন্তৌষ্ঠ্য মহাপ্রাণ অঘোষ—ফ (f)

(ঘ) দন্তৌষ্ঠ্য মহাপ্রাণ ঘোষ—ভ (v)

(ঙ) কণ্ঠ্য বা গলনালীয় অঘোষ হ (h.)—বিসর্গ-ঃ

(চ) ,, ,, ঘোষ—হ (h)।

(৮) অর্ধ-স্বর—য়, ওয় (y, w)

স্পর্শ বা স্পৃষ্টবর্ণ—উচ্চারণের স্থানে নিঃশ্বাস বায়ুপ্রবাহ কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া পরক্ষণে সশব্দে নির্গত হইলে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির উৎপত্তি হয়। ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ স্পৃষ্ট বর্ণ।

ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত বর্ণ—জিহ্বা এবং দন্তমূল এই দুইএর সাহায্যে এই ধ্বনিগুলির উদ্ভব হয়। উচ্চারক অংশ দুইটি পৃথক হওয়ার সময় উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজাত ধ্বনির সৃষ্টি হয়। উষ্মধ্বনির মত এই ধ্বনিগুলিকেও প্রলম্বিত করা যায়। স্পৃষ্ট ও উষ্মধ্বনি একই সঙ্গে উচ্চারিত হইলে এই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। যেমন চ=চ+শ।

অঘোষ বর্ণ বা শ্বাসবর্ণ—(Breath sounds, Hard sounds, Tenues)-বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ মৃদু ও গাম্ভীর্যবিহীন। এই ধ্বনিধ্বলির উৎপাদনের সময় কণ্ঠস্থিত স্বরোৎপাদক যন্ত্রের কম্পন অনুভূত হয় না।

ঘোষবর্ণ, সঘোষ বা নাদবর্ণ (Voiced sounds, soft sounds বা Mediae) বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণকে ঘোষবৎবর্ণ বলা হয়; কারণ এই বর্ণগুলির উচ্চারণ-কালে স্বরোৎপাদক যন্ত্রের কম্পন হয়।

* **মহাপ্রাণবর্ণ—(Aspirates)** বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণবর্ণ বলে। প্রথম বর্ণের সঙ্গে প্রাণ বা নিঃশ্বাস সহযোগে দ্বিতীয় বর্ণ এবং তৃতীয় বর্ণের সঙ্গে অনুরূপ ভাবে প্রাণ বা নিঃশ্বাস যুক্ত হইয়া চতুর্থ বর্ণ উচ্চারিত হয়। মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত হইয়া বাধা সৃষ্টি করে।

---

* অনেক ভাষা-বিজ্ঞানী মনে করেন যে মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণের মূলে দুইটি বর্ণের মিলিত ধ্বনি হয়। এই ধ্বনিগুলি অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য। তা ছাড়া "হ" ঘোষবৎ ধ্বনি। বর্গের চতুর্থ বর্ণ নিঃশ্বাস বা প্রাণসহযোগে (হ-ধ্বনি) সৃষ্ট হয়। ইহা স্বীকার করিয়া নিলেও দ্বিতীয় বর্ণের সঙ্গে ঘোষ ধ্বনি "হ" কিরূপে যুক্ত হইতে পারে? তাহা হইলে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ ও ঘোষবৎ ধ্বনির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণগুলি অঘোষ ধ্বনি; এ বিষয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন।

অল্পপ্রাণ বর্ণ—বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণকালে প্রাণ (Aspiration) থাকে না বলিয়া ইহাদিগকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলা হয়। বাংলা ব্যাকরণে খ=ক্‌হ, ঘ=গ্‌হ লেখা হয়।

নাসিক্যবর্ণ (Nasals)—সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে বাংলা ব্যাকরণে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এই পাঁচটি বর্ণকে নাসিক্য ধ্বনি বলা হয়। কারণ এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ-কালে মুখ-বিবরস্থ বায়ু মুখ দিয়া বহির্গত না হইয়া নাসা পথে নিঃসৃত হয়। আবার নিশ্বাস বায়ু একই সঙ্গে মুখ ও নাসিকার মধ্য দিয়াও বাহির হইতে পারে। এই পাঁচটি বর্ণের মধ্যে বাংলায় মূল নাসিক্যধ্বনি তিনটি—ঞ, ন্, ম্।

ঙ—বালায় উঅ রূপে উচ্চারিত হয়। রঙ্, সঙ্, ঢঙ্ প্রভৃতি শব্দে এই ধ্বনিটির যথার্থ ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী "King" এর মত। বাংলায় ঙ এবং ং অভিন্ন।

ঞ—সানুনাসিক য়ঁ বা ইয়ঁ রূপে উচ্চারিত হয়। যথা—মিঞা>মিয়াঁ। চ-বর্গের বর্ণগুলির সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহার উচ্চারণ দন্ত্য "ন" এর মত হয়। যেমন, বঞ্চনা (=বন্‌চনা); বাঞ্ছা (=বান্‌ছা); ঝঞ্ঝা (=ঝন্‌ঝা); ইত্যাদি।

ন—বাংলায় ইহা দন্তমূলীয় মূল নাসিক্যধ্বনি। বাংলায় ন ও ণ এর উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু শব্দমধ্যস্থিত ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে "ণ" এর মূর্ধন্য উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কণ্টক, পাণ্ডা, লণ্ঠন।

ম—ওষ্ঠ্য ঘোষবৎ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

ল—পার্শ্বিকধ্বনি (Lateral)—জিহ্বাগ্রভাগকে মুখবিবরের মাঝামাঝি স্থানে দন্তমূলে আনিবার পর বায়ু প্রবাহ জিহ্বার দুই পাশ দিয়া যখন নির্গত হয় তখন ল-কারের উচ্চারণ হয়। উচ্চারক দুইটি পৃথক না হইয়া জিহ্বা এবং চোয়ালের পার্শ্বোদ্ভূত ফাঁক দিয়া বাতাস নির্গত হয় বলিয়া এই ধ্বনিটিকে ইচ্ছামত প্রলম্বিত (continuant) করা যায়। দুই পাশ ঘেঁসিয়া বায়ু নিষ্কাশিত হয় বলিয়া এই ধ্বনিকে পার্শ্বিক বা পার্শ্বজাত-ধ্বনি বলে। এই ধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কম্পন হয়। সেজন্য ধ্বনিটি ঘোষবৎবর্ণ (Voiced)। জিহ্বাগ্র এবং দন্তমূলের স্বল্পতম প্রয়াসে এই ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে তরল ধ্বনি (liquid) বলে।

র—কম্পিত বা কম্পন জাত ধ্বনি—জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত হইয়া দন্তমূলে একাধিকবার আঘাত করিলে র-ধ্বনির উৎপত্তি হয়। বাংলা "র" ইংরেজী "r" হইতে পৃথক।

ড়, ঢ়—তাড়ন জাত ধ্বনি—জিহ্বার অধোভাগ দ্বারা দন্তমূলে তাড়ন বা আঘাত করিলে এই ধ্বনি দুইটির উদ্ভব হয়। সেজন্য ইহাদিগকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখবিবর দিয়া বাহির হইবার সময় জিহ্বার কিংবা অলিজিহ্বার ঘন ঘন কম্পন হইলে এই ধ্বনিদ্বয়ের সৃষ্টি হয়। ড়-কারের মহাপ্রাণ রূপ ঢ়-কার।

বাংলায় ড়, ঢ় বর্ণ দুইটি নূতন ; শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে পীড়া, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ছিল পীডা, মূঢ।

ন, ম, র, ল—আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানে এই ধ্বনি চতুষ্টয়কে রণিত (Resonant) বলা হয়। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে প্রতিধ্বনিত হইয়া মুখ কিংবা নাসাপথে নির্গত হয়।

শ, ষ. স, হ—উষ্ম বা শ্বাস-জাত ধ্বনি।

শ্বাস বায়ু আংশিক বাধাপ্রাপ্ত হইলে উষ্মধ্বনিগুলির উদ্ভব হয়। উষ্ম অর্থাৎ শ্বাস যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ প্রলম্বিত করা যায়। এই হেতু এই ধ্বনিগুলিকে **নিঃশ্বাসাশ্রয়ী ধ্বনি** (spirant) বলা হয়। ঘর্ষণজাত শ্বাস হইতে এই কয়টির উৎপত্তি বলিয়া ইহাদিগকে ' Frictive'' ও বলা হয়।

সংস্কৃতে শ তালু হইতে, ষ মূর্ধা হইতে এবং স দন্ত্য হইতে উচ্চারিত হইত। বাংলায় এই ধ্বনি তিনটির উচ্চারণ "শ" এর মত। আমিষ, আশা, আসা, আশি প্রভৃতি শব্দে "শ" ধ্বনির উচ্চারণ শোনা যায়।

ট্রেনের ইঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়িবার সময় আমরা শ্ শ্ শ্ শ্ জাতীয় শব্দ শুনি। সেই হিস্ ধ্বনির সঙ্গে অথবা শিশ্ দেওয়ার ধ্বনির (Hissing sound) এগুলির আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। সেজন্য এই ধ্বনিত্রয়কে শিশ্ধ্বনি (Sibilant) বলা হয়।

শ, ষ, স,—অঘোষ ধ্বনি। ইহাদের উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রীতে কোন কম্পন অনুভূত হয় না।

শ-ধ্বনির ঘোষরূপ ইংরেজী Pleasure (Plezhar), measure (mezhar) প্রভৃতি শব্দে শোনা যায়।

ষ-এর ঘোষরূপ "zh" ধ্বনি তামিল, মালয়লাম্ প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষার দৃষ্ট হয়। স-এর ঘোষরূপ "z" বাংলায় কখনো কখনো শোনা যায়। যেমন—মেজ্‌দা (mezda), জ়মা (zama) প্রভৃতি শব্দে। চলিত বাংলায় শ তালুদন্তমূলীয় উষ্মধ্বনি(Alveo-palatal Fricative) এবং স দন্তমূলীয় উষ্মধ্বনি (Alveolar Fricative)। চলিত বাংলায় ফ ও ভ ধ্বনি দুইটি দুইটি দন্তৌষ্ঠ্য উষ্মধ্বনি।

হ—কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন "হ" ধ্বনির উচ্চারণেও শ্বাস বা শিশ্‌ধ্বনির মত প্রলম্বিত করা যায়। গঠন ও শ্রুতির দিক হইতে "হ" মহাপ্রাণ ঘোষ উষ্মধ্বনি। বাংলায় হ-কারের অঘোষ রূপ ও আছে। ঃ—হ-এর অঘোষ ধ্বনি। শোকে, দুঃখে ও বেদনায় অধীর হইলে কিংবা আনন্দের অতিশয্য ঘটিলে আঃ, ইঃ, উঃ, ওঃ প্রভৃতি বিস্ময়াদিসূচক অব্যয়ে বিসর্গের ধ্বনি শ্রুত হয়। এই ধ্বনিটির উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী ফাঁকের (glottis) ভিতর দিয়া বাতাস বাহির হইয়া যায়।

অনুস্বার ও অঘোষ "হ" ধ্বনি তথা বিসর্গকে (ঃ) **অযোগবাহ বর্ণ** বলা হয়। কারণ কোন স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনির সহিত ইহাদের যোগসূত্র নাই। আবার বিসর্গ পূর্বাবস্থিত স্বরধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হয়। সেজন্য ইহাকে আশ্রয়স্থানভাগী ধ্বনিও বলা হয়। যেমন, ইঃ-এখানে তালব্য ই-কারের সংস্পর্শে বিসর্গ তালব্য ধ্বনি শ্‌-তে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ই্‌ শ্‌ শ্‌ শ্‌]; তদ্রূপ উঃ তে বিসর্গ ওষ্ঠ্য শিশ্‌ধ্বনি ফ (f) জাতীয় [উ-ফ্‌ ফ্‌ ফ্‌] বলিয়া শোনা যায়।

বাংলায় বিসর্গ পদের অন্তে থাকিলে বিসর্গের উচ্চারণ প্রায়ই হয় না। পদমধ্যস্থিত বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিকে দ্বিত্ব করে। যেমন দুঃখ=দুক্‌খ। অধঃপতন=অধপ্‌পতন।

ইংরেজীতে "হ" অঘোষ ধ্বনি (hut, hat প্রভৃতি শব্দে)। কিন্তু দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী "হ" ঘোষবৎ হয়। যেমন, behind।

আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানে উষ্মধ্বনিগুলির শ্রেণী বিভাগ নিম্নলিখিত ভাবে করা হইয়া থাকে। ওষ্ঠ ও জিহ্বা ঈষৎ প্রসৃত হইলে যে উষ্মধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে **প্রশস্ত** (Slit) উষ্মধ্বনি বলে। যেমন, হ, ফ, ভ (f, v, θ, δ) প্রভৃতি ধ্বনি। জিহ্বার আকুঞ্চনজনিত যে উষ্মধ্বনিগুলির উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে **সংকীর্ণ** (groove) উষ্মধ্বনি বলা হয়। যথা—শ, স, জ' (z)। ইংরেজীতে f, h, th, r, s, sh, z, ź প্রভৃতি ধ্বনিগুলি উষ্ম।

য, র, ল, ব—এই চারিটি ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। সংস্কৃতে য-এর প্রকৃত উচ্চারণ "ইঅ" এবং ব-এর উচ্চারণ "উঅ" বা "ওয়" (অনেকটা ইংরেজী w-এর মত)। সেজন্য এই ধ্বনি দুইটিকে **অর্ধ-স্বর (Semi-Vowels)** বলা হয়। ই-কার ও উ-কার এই স্বরধ্বনি দুইটির উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ অধিকতর উচ্চ এবং ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া বায়ুপথ খানিকটা রুদ্ধ করিলে অর্ধস্বর ধ্বনি দুইটির উদ্ভব হয়।

ল, র—এই ধ্বনি দুইটিকে **তরলস্বর (liquid)** বলে।

এই অক্ষর চতুষ্টয়ের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি অ-কার লুপ্ত হইলে আমরা শুদ্ধ স্বরধ্বনি পাই। যেমন, ই (=য়); ঋ (=র্); ঌ (=ল্); উ (=ব্)। য-কারের ইঅ উচ্চারণ বাংলায় বিন্দুযুক্ত য়-তে রক্ষিত হইয়াছে। বাংলায় য ও জ এর উচ্চারণ অভিন্ন। অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব ধ্বনিদ্বয়ের জন্য বাংলায় পৃথক বর্ণমালা নির্দিষ্ট নাই; ফলে আকৃতিগত ও উচ্চারণগত দিক হইতে বাংলায় অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব অভিন্ন। সংস্কৃত অন্তঃস্থ "ব" দন্তৌষ্ঠ্য উষ্ম-ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হইত (অর্থাৎ উপর পাটির দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট চাপিলে যে ধ্বনির উদ্ভব হয়)। সংযুক্ত বর্ণে ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে অন্তঃস্থ ব যুক্ত হয়। বাংলায় ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব হয়। যেমন—পক্ব=পক্‌ক; বিদ্বান=বিদ্‌দান।

মূলধ্বনি (Phoneme) হইতে অন্তরধ্বনি, সহধ্বনি বা পূরকধ্বনির (Allophone) সৃষ্টি।

ধ্বনির সংস্পর্শ জনিত পরিবর্তন—কোন একটি ধ্বনি ক্ষেত্র বিশেষে অপর ধ্বনির সংস্পর্শে আসিয়া কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত হয়। এই ভাবে রূপান্তরিত ধ্বনিকে ধ্বনিবিজ্ঞানে বলা হয় অন্তরধ্বনি, সহধ্বনি বা পূরকধ্বনি। প্রত্যেক ধ্বনিমূলের একাধিক অন্তরধ্বনি থাকিতে পারে। বাকপ্রবাহের নির্দিষ্ট পরিবেশেই মূলধ্বনির এক একটি অন্তরধ্বনির উদ্ভব হয়। গ্লিসন (Gleason) "Phoneme" এবং "Allophone" এর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"Any sound or sub class of sounds which is in complementary distribution with another so that the two together constitute a single phoneme is called an allophone of that phoneme".

নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে।

(ক) দন্তমূলীয় মূলধ্বনি "ন" এর তিনটি সহধ্বনি বা অন্তরধ্বনি পাওয়া যায়। ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় "ন" দন্তবর্ণ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—সন্তান, পন্থা, মন্দা, বন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দে আমরা "ন" এর যথার্থ দন্ত্য উচ্চারণ পাই। আবার চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে "ঞ" দন্তমূলীয় না হইয়া প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, বঞ্চি, বাঞ্ছা, সঞ্জাত, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শব্দে "ঞ"-এর প্রশস্ত দন্তমূলীয় উচ্চারণ পাই। তদ্রূপ ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় "ন" এর মূর্ধন্যধ্বনি রূপে উচ্চারণ লক্ষণীয়। যেমন, কণ্টক, লুণ্ঠন, গণ্ডার প্রভৃতি। সুতরাং মূলধ্বনি "ন" এর তিনটি অন্তরধ্বনি। মূলধ্বনি "ল" এর দুইটি অন্তরধ্বনি আছে—একটি দন্ত্য "ল", আর একটি মূর্ধন্য "ল"; ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে

"ল" দন্তবর্ণ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, আলতা, সলতে, হলদে প্রভৃতি শব্দে। আবার উলটা, পালটা প্রভৃতি শব্দে "ট" ধ্বনির পূর্বে ব্যবহৃত "ল", ট এর সহজাত (homorgenic) ব্যঞ্জনা লাভ করে। তদ্রূপ ইংরেজী "l" এর ও দুইটি সহধ্বনি আছে। একটি স্বচ্ছ (clear) "ল", অন্যটি গভীর (dark) "ল"। ইংরেজী স্বচ্ছ "ল", বাংলা "ল" এর মতই উচ্চারিত হয়। শব্দের আদিতে ও মধ্যে স্বচ্ছ 'l' এবং শব্দের অন্তে গভীর 'l' উচ্চারিত হয়।

স্বচ্ছ 'l'—যেমন, like, late প্রভৃতি শব্দে।

গভীর 'l'—fall, all, call প্রভৃতি শব্দে।

বাংলায় "শ" শিশ্ জাতীয় মূলধ্বনি (Phoneme)। এই ধ্বনিটির ও একাধিক অন্তরধ্বনি আছে। ত, থ, ও ন এর পূর্বে এই ধ্বনিটি দন্তবর্ণ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, বস্তা, আস্থা, অস্থি, স্নান প্রভৃতি শব্দে আমরা "স" এর উচ্চারণ পাই। অন্য কোথাও দন্ত্য "স" এর উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং এখানে "স" হইতেছে মূলধ্বনি "শ" এর অন্তরধ্বনি। আবার র, ল ও ন এর পূর্বে ব্যবহৃত "শ" এর উচ্চারণ অগ্রদন্তমূলীয় (Pre-alveolar)। যথা,—শ্রাবণ, শ্রী, শ্লীল প্রভৃতি শব্দে। সুতরাং অগ্রদন্তমূলীয় "শ" মূল "শ" ধ্বনিরই আর একটি সহধ্বনি। ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে মূলধ্বনি "শ" এর মূর্ধন্য ধ্বনিরূপে উচ্চারণ পাই। যথা—কষ্ট, তেষ্টা। সুতরাং "ষ" হইল "শ" এর আর একটি সহধ্বনি।

তদ্রূপ অঘোষ "হ" বা বিসর্গ ঘোষবৎ মূলধ্বনি "হ" এর অন্তরধ্বনি।

দেখা যাইতেছে, যে মূলধ্বনির প্রত্যেকটি পূরক ধ্বনির উচ্চারণের জন্য একই নির্দিষ্ট পরিবেশ থাকে। যে পরিবেশে একটি পূরকধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেই পরিবেশে অন্য পূরকধ্বনি উচ্চারিত হইতে পারে না। এই ব্যাপারকেই ধ্বনি বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় **প্রতিপরিপূরক অবস্থান (complementary distribution)**। একটি ভাষার ধ্বনি মূল সমূহ নির্ধারণের জন্য প্রথমে ধ্বনিলিপি প্রস্তুত করিতে হইবে (Phonetic Transcription)। পরবর্তী স্তরের কাজ ধ্বনিমূল লিপি (Phonemic Transcription) প্রণয়ন। ধ্বনিলিপির মধ্যে যে সব শব্দ বা শব্দের অংশ থাকে সেইগুলিকে পৃথক করিয়া **"ন্যূনতম শব্দজোড়"** বাহির করা হয়। এই ভাবেই তুলনামূলক বিশ্লেষণের কাজ করা চলে। ভাষা বিজ্ঞানে ইহাকে **"Minimal Pairs"** বলে। মূলধ্বনির পার্থক্যের জন্যই শব্দজোড়ের মধ্যে এই তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, থল্, থিল্, থুল্, খেল্ ইত্যাদি।

ল্, র, ন, ম—এই চারিটি বর্ণ ব্যঞ্জনধ্বনির অনুবর্তী হইয়া স্বরধ্বনির মত ব্যবহৃত হয়, সেজন্য ইহাদিগকে অর্ধব্যঞ্জন (Sonant) বলে। সংস্কৃত ঋ-কার ও ঌ-কার অর্ধ-ব্যঞ্জন। ঌ-কারের উচ্চারণ ছিল-ল্। ইংরেজী bottle (ব-ট্-ল্), little (লি-ট্-ল্) funnel (funl), tunnel (tunl) প্রভৃতি শব্দে অর্ধব্যঞ্জন "ঌ", bottom (bʌtm), chasm (Kæzm) প্রভৃতি শব্দে অর্ধব্যঞ্জন "ম", button (butn), mutton (mutn) প্রভৃতি শব্দে অর্ধব্যঞ্জন "ন" ধ্বনি শোনা যায়। বাংলায় ঌ, ঋ-এর অনুরূপ ধ্বনি নাই। ঌ-লি রূপে, ঋ-রি, রী রূপে উচ্চারিত হয়।

ং—সংস্কৃতে ইহা যে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে থাকিত, সেই স্বরধ্বনিকে আংশিক ভাবে সানুনাসিক করিত। বাংলায় ং এবং ঙ এর উচ্চারণ অভিন্ন। যেমন, বাঙলা, রং, রঙ, ইত্যাদি।

বাংলা স্বরবর্ণের উচ্চারণ—

সংস্কৃতে হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ লঘু এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ হইত। কিন্তু বাংলায় হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের উচ্চারণে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অবস্থান বিশেষে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ এবং দীর্ঘস্বর ও হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হইতে পারে। সংস্কৃত অ, ই, উ, ঋ ধ্বনির উচ্চারণ সর্বদাই হ্রস্ব, কিন্তু বাংলায় এগুলি দীর্ঘস্বরও হইতে পারে। আবার সংস্কৃতে আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি দীর্ঘ; কিন্তু বাংলায় এগুলি হ্রস্ব ও হইতে পারে, দীর্ঘ ও হইতে পারে; অর্থাৎ বাংলায় স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বয়ংসিদ্ধ নহে। উচ্চারণের বেলায় স্বরধ্বনির এই পার্থক্য না থাকায় বানানের ব্যাপারে বাংলায় হ্রস্বধ্বনি ও দীর্ঘধ্বনির প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত হয় না। নীচে—নিচে; হাতী—হাতি; দীঘি—দিঘী; একটী—একটি ইত্যাদি।

কোন কোন ভাষায় স্বর-ধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের উপর শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়। যেমন, সং—দিন (দিবস); দীন (দরিদ্র); Kin (হ্রস্ব উচ্চারণ)—সম্পর্ক; Keen (দীর্ঘ)—তীক্ষ্ণ। কিন্তু বাংলায় সাধারণত তাহা হয় না। স্বরধ্বনির হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ সম্বন্ধে বাংলায় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। একাক্ষর যুক্ত (mono-syllabic) পদে দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যেমন, দিন (দিবস), দীন (দরিদ্র); দিন (দিউন), দীন (মুসলমান ধর্ম)—এই শব্দগুলির ই-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ। কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত পদে কিংবা একই প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যে ব্যবহৃত হইলে ই-ধ্বনি দীর্ঘ না হইয়া হ্রস্ব হয়।

যেমন, দিন-কাল, দীন-দুঃখী ইত্যাদি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলায় একাক্ষরযুক্ত পদের ও হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। যেমন, তুমি কি করিবে? (Will you do ?) তদ্রূপ এক (অ্যা'ক) শব্দে বাঁকা এ-কার দীর্ঘ, কিন্তু একা, একটা প্রভৃতি একাধিক

অক্ষরযুক্ত পদে এ-কার হ্রস্ব। জল (জ-ল) শব্দে অ-কার দীর্ঘ, কিন্তু জলো শব্দে হ্রস্ব। মা ও রাগ শব্দে আ-কার দীর্ঘ, কিন্তু রাগী ও আকার শব্দে আ-কার হ্রস্ব। রূপ শব্দে উ-কার দীর্ঘ, কিন্তু রূপসায়র শব্দে উ-কার হ্রস্ব। বাংলা ছন্দের বেলায় ও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষিত হয়। স্বরধ্বনির হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই।

অ—বাংলায় অ-কারের দুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়—(১) অ-কারের "অ" (ɔ) রূপে উচ্চারণ; ইংরেজী **fall, law**-প্রভৃতি শব্দের অনুরূপ।

যেমন, বলা, চলা, কলস প্রভৃতি শব্দে।

(২) ও-রূপে উচ্চারণ (সাধারণত চলিত ভাষায় লক্ষণীয়)।

(ক) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ, য-ফলা বা ক্ষ থাকিলে অ>ও হয়।

যেমন, বসু (=বোসু); অতি (=ওতি); মধু (=মোধু); সত্য (=শোত্তো); তাৎপর্য (=তাৎপোরজো); বক্ষ (=বোক্ষ); নব্য (=নোব্ব) ইত্যাদি।

(খ) ন-কারান্ত একাক্ষর শব্দে অ>ও রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন, মন (=মোন); বন (=বোন); পন (=পোন); কিন্তুপণ, গণ, সন প্রভৃতি শব্দে অ-কারের উচ্চারণে পরিবর্তন হয় না।

শব্দের আদিতে অ-কার "না" অর্থে ব্যবহৃত হইলে, ও-কার রূপে উচ্চারিত হয় না। যেমন, অ-নিত্য, অ-ধীর, অ-কুল।

(গ) পদের অন্তেস্থিত অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন, যত (=জতো); তত (=ততো); বড় (=বড়ো); কর (=করো); ভাল (=ভালো)।

(ঘ) কোন শব্দ দুই অক্ষরের **(syllable)** বেশি হইলে, উচ্চারণের সোকর্যার্থে অক্ষর সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া নেওয়া হয় এবং সেই ক্ষেত্রে শেষ অক্ষরের অ>ও রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন, অনবরত (=অনো-বরো-তো)।

(ঙ) দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শেষ অক্ষরের অ>ও রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন, পিতল (=পিতোল, পেতোল); অনল (=অনোল)।

আধুনিক বাংলায় শব্দের অন্তস্থিত অ-কার সাধারণত উচ্চারিত হয় না, অর্থাৎ শেষ বর্ণটির উচ্চারণ হসন্ত হয়। যেমন, হাত্, পান্, জল্, মাতুল্। কিন্তু বাংলায় মধ্যযুগে এই সমস্ত শব্দ স্বরান্ত করিয়া উচ্চারণ করিবার রীতি ছিল। ওড়িয়া ভাষায় অদ্যাপি অন্ত্য "অ" উচ্চারিত হয়।

বাংলায় কতকগুলি প্রাকৃতজ শব্দে অন্ত্য "অ" উচ্চারিত হয়। যেমন—

(ক) কতকগুলি বিশেষণ শব্দে—কাল, বড়, ছোট, ভাল ইত্যাদি।

(খ) সর্বনাম জাত বিশেষণ—কত, তত, অত, যত, যেন, হেন, কেন।

(গ) মত<মন্ত শব্দে।

(ঘ) সংখ্যাবাচক শব্দে—এগার, বার, পনের, আঠার প্রভৃতি।

(ঙ) "আন" প্রত্যয়যুক্ত শব্দে—করান, বসান।

(চ) দ্বিরুক্ত বিশেষণে কিংবা অনুকারবোধক শব্দে—কাঁদকাঁদ, ঝর-ঝর, মর-মর, ছল-ছল।

আবার ঝর্-ঝর্, ছল্-ছল্ প্রভৃতি উচ্চারণের ধারাও লক্ষিত হয়।

(ছ) অতীতকালের -ইল, -ল, ভবিষ্যতের -ইব, -ব, নিত্যবৃত্ত অতীতের -ইত, -ত, অনুজ্ঞার-অ প্রত্যয় যুক্ত শব্দে।

তৎসম শব্দে অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণ রীতি—

(ক) তৎসম শব্দে সাধারণত অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হয় না।

যেমন, বীর, জল, আকাশ, পর্বত, অসুর।

(খ) অন্ত্য অক্ষরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে কিংবা অন্ত্য অক্ষরের পূর্বে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে অ-কার স্বরান্ত করিয়া উচ্চারিত হয়।

যেমন, সূর্য, চন্দ্র, পূর্ব, ভক্ত, কর্ম, দুঃখ, বংশ প্রভৃতি।

(গ) বিশেষ্য শব্দের শেষ অক্ষর "হ" থাকিলে অন্ত্য "অ" লুপ্ত হয় না। যথা— অনুগ্রহ, স্নেহ, বিবাহ।

(ঘ) বিশেষণ শব্দের অন্ত্যাক্ষরে ঢ়, য় থাকিলে অন্ত অ-কার উচ্চারিত হয়। যেমন, মূঢ়, গাঢ়, দৃঢ়, দেয়, পেয়, গেয়, বিধেয়।

(ঙ) -ত, -ইত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদে অন্ত্য অ-কার লুপ্ত হয় না। যথা—গত, নত, মত, গীত, পীত, পুলকিত; কিন্তু বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে অ-কার অনুচ্চারিত।

যেমন,—গীত্, মত্, বিহিত্, পালিত্ (পদবী), রক্ষিত্, (পদবী); কোন কোন স্থলে অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হইতেও পারে, নাও পারে।

যেমন, গচ্ছিত, গচ্ছিত্; গর্হিত, গর্হিত্।

(চ) তর, তম প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদে সাধারণত অ-কারের লোপ হয় না। যেমন, নিম্নতর, নিম্নতম, উচ্চতম; কিন্তু উত্তর, উত্তম প্রভৃতি শব্দে অ-কার লুপ্ত হয়।

উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণী বিভাগ

উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ	ওষ্ঠ্য Bilabial	দন্তোষ্ঠ্য Labio-dental	দন্ত্য Dental	দন্তমূলীয় Alveolar	দন্তমূলীয়-মূর্ধন্য Alveolo-retroflex	তালব্য Palatal	তালুদন্তমূলীয় Alveolo-palatal	জিহ্বামূলীয় Velar	কণ্ঠনালীয় Glottal, Laryngeal	কণ্ঠ্য Guttural
স্পৃষ্টধ্বনি (Plosives) পূর্ণস্পর্শ (Complete Cotact) অঘোষ ঘোষ	প ব		ত, থ, দ, ধ		ট, ঠ, ড, ঢ			ক, খ গ, ঘ		সংস্কৃত ক, খ ,, গ, ঘ,
নাসিক্য (Nasals) ঘোষ	ম			ন				ঙ		
ঘৃষ্টধ্বনি অঘোষ (Affricate) ঘোষ							চ, ছ জ, ঝ			
উষ্মধ্বনি (Fricatives) আংশিক স্পর্শ (Partial contact) (ক) প্রশস্ত অঘোষ (slit) ঘোষ		ফ (f) ভ (v)	ϕ δ	স	ষ		শ		: (বিসর্গ) হ	
(খ) সংকীর্ণ অঘোষ (Groove) ঘোষ				s z			s. z.			
পার্শ্বিক (Lateral) ঘোষ				ল						
কম্পন জাত (Trilled) ঘোষ				র						
তাড়নজাত (Flapped) ঘোষ					ড়, ঢ়					
অর্ধস্বর (Semi vowels)	ব(অন্তঃস্থ)					য				

(ছ) কথ্য ভাষায় যে সমস্ত তৎসম শব্দের প্রয়োগ কম, সেই সব শব্দে অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হয়। যেমন, নব, তব, মম, সম, বৃষ, কৃশ, মৃগ, প্রভৃতি। নিজ শব্দের অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হয়।

(জ) শব্দের আদিতে দ্বিস্বর ধ্বনি ঐ, ঔ থাকিলে অন্ত্য অ-কার লুপ্ত হয় না। যেমন, গীতগোবিন্দ, তৈল, মৌন।

আ—সংস্কৃতে ইহার যথাযথ উচ্চারণ ছিল (ইংরেজী father এর মত)। সংস্কৃতে "অ" ছিল হ্রস্ব স্বর, "আ" তাহার দীর্ঘ রূপ ; কিন্তু বাংলায় অ-কার আ-কারের দীর্ঘরূপ নহে। স্বরবর্ণ পড়িবার সময়ই তাহা লক্ষ্য করা যায়—যেমন, স্বরে অ, স্বরে আ। বাংলায় একাক্ষর যুক্ত শব্দে "অ" এর দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যেমন—জল (জ-ল্), বন (ব-ন্)।

বাংলা আ-কারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুই প্রকার উচ্চারণই আছে। যেমন, বাম (বা-ম্) শব্দে আ-কার দীর্ঘ, কিন্তু বামা শব্দে আ-কার হ্রস্ব।

আ'—প্রাদেশিক উচ্চারণে এই ধ্বনিটি পাওয়া যায়। এই ধ্বনিটি মুখাগ্রভাগে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে তালব্য আ' বলা হয়। যেমন, কা'ল<কাইল<কালি ; আ'জ<আজি। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায়ও এই ধ্বনিটি পাওয়া যায়। যেমন, মইষ্যা<মণি।

ই, ঈ—দিন-দিন শব্দে ই-কার হ্রস্ব। দিন ও দীন শব্দে ই-কার দীর্ঘ।

উ—ঊ—রূপা শব্দে উকার হ্রস্ব, রূপ শব্দে দীর্ঘ।

ঋ, ৠ—সংস্কৃতে এই দুইটি বর্ণ স্বরধ্বনি (র্) রূপে উচ্চারিত হইত। কৃ (=কর্) একটি অক্ষর। বাংলায় এই দুইটি বর্ণ শুধু বর্ণ মালায় রক্ষিত আছে। তৎসম শব্দের বানানে ঋ, ৠ যথারীতি লিখিত হয়, কিন্তু এই দুইটির উচ্চারণ রি, রী। স্কটল্যাণ্ডের ইংরেজীতে (প্রাদেশিক উচ্চারণে) ঋ-ধ্বনির সন্ধান মিলে। যেমন, Thunder (than-dr)-থান-ড্-র্। ফরাসী ভাষায়ও দৃষ্ট হয়। বাংলায় এবং উত্তর-ভারতের ভাষা সমূহে ঋ>রি, ওড়িয়া. মারাঠীতে এবং দক্ষিণ-ভারতের ভাষা সমূহে ঋ>রু রূপে উচ্চারিত হয়।

প্রাচীন বাংলায় ঋ-ধ্বনির **উ**চ্চারণ ছিল রি, ইর, রে, এর, র, অর্, রো, ওর্। যেমন, অমৃত>অম্রত, অম্রেত, অমর্ত, অমের্ত। প্রাচীন বাংলায় র-ফলা যুক্ত শব্দেও "র" ঋ-কারের মত রি, ইর, রে, এর্ ওর্ প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হইত। যেমন, প্রদীপ> প্রদীপ, পিদীপ ; ব্রত>বেরত বর্ত ; ক্রমে-ক্রমে>কের্মে-কের্মে।

ঌ—সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ ছিল-ল্। শুধু ক্লৃপ্ ধাতুতে পাওয়া যায়। বাংলায় এই ধ্বনির অস্তিত্ব নাই—ইহা "লি" রূপে উচ্চারিত হয়। ইংরেজী little (li-tl)

[লি-টি-ল্], bottle (butḷ) [ব-ট্-ল্] প্রভৃতি শব্দে "ঌ" ধ্বনি পাওয়া যায়। অর্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনি "ট" এর সঙ্গে স্বরধ্বনি "ঌ" যুক্ত হইলে যে উচ্চারণ হয় তাহাই।

এ—বাংলায় এ-কারের একাধিক উচ্চারণ দেখা যায়।

(ক) এ (e)—সহজ এবং সাধারণ উচ্চারণ। দেশ, বেশ প্রভৃতি শব্দের মধ্যে লক্ষণীয়। (ইংরেজী cake, take প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের মত)।

এ্যা' ; (æ)—

(খ) বাঁকা বা বিকৃত উচ্চারণ। যেমন, এক (=এ্যাক্) ; দেখেন (=দ্যাখেন) প্রভৃতি শব্দে।

(গ) এ' (e')—পূর্ববঙ্গের উপভাষায় এ ও অ্যা' এর মাঝামাঝি একপ্রকার উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বেদ (=বে'দ) ; লেপ (=লে'প) ইত্যাদি।

দ্বিমাত্রিকতা (Bimorism, Dimetrism)

ইহা চলিত বাংলার উচ্চারণের একটি বিশেষ রীতি। তিন বা ততোধিক অক্ষর মাত্রার শব্দ হইলে ইহাদিগকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা চলিত ভাষার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন, করিয়া>ক'রে ; চলিল>চল্‌ল ইত্যাদি। এজন্য একাক্ষর শব্দ পৃথক ভাবে উচ্চারিত হইলে হ্রস্ব হয় না, দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন, রা-ম, দুইটি হ্রস্ব অক্ষরযুক্ত পদ, দ্বিমাত্রিক ; আবার রা-ম্ দীর্ঘ এক অক্ষর যুক্ত পদ, কিন্তু দ্বিমাত্রিক।

অনেকাক্ষর বিশিষ্ট শব্দকে দুই অক্ষরের বা দুই মাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া নেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়।

যেমন, ভাগিনেয় (৪ অক্ষর)>ভাগ্-নে (২ অক্ষর) ; হলুদিয়া>হল্‌দে ; ফেলিয়া দাও>ফেলেদাও>ফেল্-দাও।

একাদশ অধ্যায়

ভাষার বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস

(Development and growth of Languages)

ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

(১) প্রাকৃতিক অথবা ভৌগোলিক কারণ

(২) রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক কারণ

(৩) জনসাধারণের মানসিক মনোবৃত্তি

(৪) সাংস্কৃতিক প্রভাব।

কোন জাতির সংস্কৃতি ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কোন দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতের অসুবিধা থাকিলে কিংবা পাহাড়, পর্বত বা বন জঙ্গল থাকিলে একই ভাষার নানা উপভাষা সৃষ্টি হইয়া থাকে। দুর্গম অরণ্যময় অঞ্চলে যাতায়াতের অসুবিধার দরুণ সেই সব অঞ্চলে ভাষার পরিবর্তন সহজে হয় না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিবর্ত্ম দিয়া বিভিন্ন জাতি ভারতে আসে এবং শেষ পর্যন্ত আর্য জাতি গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী বিধৌত উর্বর অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসতি স্থাপন করে। আর্য ভাষাগুলি বিভিন্ন জাতির ভাষা সমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া শক্তিশালী হয়। জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ভাষা গোষ্ঠীর কোন দল অন্যত্র গিয়া বসতি স্থাপন করিতে পারে। তখন ভাষা সম্প্রদায় বিভক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রেও এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় শব্দাবলী গৃহীত হয়। আরবী ও হিব্রু ভাষায় ভারতীয় ভাষাসমূহের শব্দ পাওয়া যায়। ইরানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুইটি ভাষা গোষ্ঠী রহিয়াছে। প্রাচ্য ভাষাতে আর্য উপাদান বেশি, কিন্তু পশ্চিমা গোষ্ঠীতে সেমেটিক শব্দাবলী ও ইডিয়ম্ রহিয়াছে। মধ্যবর্তী মরুঅঞ্চলের জন্য ও পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভাষার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ভৌগোলিক কারণ এবং আবহাওয়া মানুষের জীবন, মন ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কোন বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসের ফলে কোন ভাষাভাষী মানুষের উচ্চারণে পরিবর্তন হইতে পারে। জাতির সংমিশ্রণের ফলে ও কোন ভাষা অপরাপর ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া শক্তিশালী হয়। আমেরিকায় ইংরেজী ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

যখন দুইটি জাতির সংমিশ্রণ ঘটে, তখন সেই দেশের ভাষাটির উপর তাহার প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং ভাষাও ক্রমশ সরলতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সংশ্লেষণ মূলক অবস্থা (Synthetic stage) হইতে বিশ্লেষণমূলক অবস্থার (Analytic stage) দিকে ভাষার যাত্রা শুরু হয়। আধুনিক ফারসী ভাষা ইহার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। সেমেটিক ভাষার শব্দাবলী, বাক্যগঠনরীতি ও ইডিয়ম দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ।

আর একটি মিশ্রিত ভাষার নমুনা হইতেছে "Pidgin English"। চীনা রীতিতে ইংরেজী ভাষা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কথিত হয়। ইরান মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হইলে আরবী ভাষার প্রভাবে ইরানীয় ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ভারতে ও বিভিন্ন ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে নানা উপাদান (শব্দাবলী, প্রত্যয়-বিভক্তি) সংগ্রহ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে।

প্রত্যেক শব্দের মূলে একটা ইতিহাস আছে। ইহা যথাযথভাবে আলোচিত হইলে কোন জাতির মানসিক ও সংস্কৃতিগত অনেক তথ্য জানা যায়। ধর্ম ও সাহিত্য পৃথিবীতে মানবজাতির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। ইহার সাহায্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর হয়। সকল দেশের সাহিত্যই প্রথমে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে [যেমন, ভারতে বৈদিক সূক্ত এবং গ্রীসে হোমারের সূক্ত]। ধর্মপুস্তককে পবিত্র বলিয়া মনে করা হয় এবং পরবর্তীকালে ইহাকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম ও সাহিত্য একটি শক্তিশালী উপাদান, যাহা সমগ্র জাতিকে একটি সুসংহত বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে। "Bond of religion is the greatest bond of unity"। যুগে যুগে ভাষা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু প্রাচীন রূপের প্রয়োগ পরবর্ত্তী কালেও দেখা যায়।

কোন সাহিত্যের পূর্ববর্ত্তী কালের ভাষা ও উপভাষার সঙ্গে পরবর্ত্তীকালের ভাষা ও উপভাষার তুলনা করিলে দেখা যায় যে সময়ের ব্যবধানে ও ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে।

ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তন

জীবন্ত ভাষা মাত্রই পরিবর্তনশীল। মানুষের রুচি, রীতি, চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গী দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং যেহেতু ভাষা এগুলির প্রকাশের বাহন, সেইহেতু ভাষারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ভাষার পরিবর্তন বলিতে মুখ্যত কথ্য ভাষারই পরিবর্তন বুঝায়। মানুষের মন গতিশীল ও চঞ্চল। ব্যাকরণের কাজ হইল কোন বিশেষ কালের কোন ভাষার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু কথ্য ভাষার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে।

নানাকারণে শব্দের ধ্বনি-পরিবর্তন হয়। দ্রুত কথাবার্তা বলিবার সময় কিংবা বক্তৃতা কালে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে এবং পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে

রূপান্তরিত করিতে পারে। উচ্চারণ প্রয়াস লাঘব করিবার জন্য ও সন্নিহিত দুই স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয়। শ্বাসাঘাতের দরুণ ও ধ্বনির বিকৃতি বা লোপ ঘটে। জিহ্বার জড়তা এবং কানে কম শোনা, এইগুলি ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণ বৈষম্যের কারণ। শিশু যখন বিদ্যাভ্যাস করে, তখন শিক্ষকের উচ্চারণ প্রণালী ও বাগ্‌ভঙ্গী তাহাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

আবার পারিবারিক উচ্চারণ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বয়স্কের মুখ হইতে সঞ্চারিত হয় শিশুর মুখে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে ও শহুরে ছেলেদের উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যায়। এইভাবে ভাষা জন হইতে পরিবারে, ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠী ও সমাজে রূপান্তরিত হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান ও ধ্বনিপরিবর্তনের সহায়তা করে। ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দেশের আবহাওয়া নির্ভর করে এবং আবহাওয়ার উপর দেশের অধিবাসীদের দৈহিক গঠন ও শারীরিক প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। এজন্য সমতলবাসী এবং পার্বত্য অঞ্চল-বাসীদের উচ্চারণে পার্থক্য দেখা যায়। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণের ও উচ্চারণগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত ভাষায় শব্দের উপর প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, সেইসব ভাষায় অনেক সময় শ্বাসাঘাত বিহীন স্বরধ্বনি লুপ্ত হয় অথবা ক্ষয়িত রূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভাষার পরিবর্তনের ইতিহাসে শ্বাসাঘাতের ভূমিকাও নগণ্য নহে।

দুইটি ভাষা সম্প্রদায় যদি পাশাপাশি অবস্থান করে, তাহা হইলে এক ভাষা অন্য ভাষা হইতে শব্দাবলী ও উচ্চারণভঙ্গী গ্রহণ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মূল আর্য ভাষায় মূর্দ্ধন্য বর্ণগুলি ছিল না। ভারতে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক প্রভৃতি প্রাগার্যজাতির মধ্যে এই ধ্বনিগুলির ব্যবহার ছিল। সুতরাং আর্যগণ এই জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া মূর্দ্ধন্য ধ্বনিগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

সমস্ত ভাষাতেই ইতিহাসের ক্রম বিবর্তনের ধারায় ভাষার পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু ঐ পরিবর্তন বিচ্ছিন্ন ভাবে হয় না। নানাপ্রকার ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তনের ধারা অনেকটা নিয়মিত। ভাষার পরিবর্তনের পশ্চাতে যে সমস্ত উপাদান রহিয়াছে, তাহা যথাযথ বিশ্লেষণ করাই বৈজ্ঞানিকের কাজ। কার্ল ভার্ণার ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্রের ব্যতিক্রম অন্বেষণ করিতে গিয়া স্বরাঘাত সম্পর্কিত তত্ত্বের কথা আলোচনা করিয়াছেন। ধ্বনি-পরিবর্তন ভাষার রূপকে সংক্ষিপ্ত করে এবং অনেক সময় উচ্চারণজনিত ক্লেশ লাঘব করে। ধ্বনি-পরিবর্তনের ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে একটা নিয়ম শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করা ধ্বনি-পরিবর্তনজনিত বিশ্লেষণের পর্যায়ভুক্ত। ব্যতিক্রমের দুইটি প্রধান কারণ সম্ভবত এই (ক) অন্য ভাষা হইতে শব্দের অনুপ্রবেশ (খ) এবং সাদৃশ্যগত পরিবর্তন। ধ্বনি-

পরিবর্তনের সূত্রের ব্যতিক্রমগুলির যে সব ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেগুলিকে " **বিক্ষিপ্ত** বা **অনিয়মিত ধ্বনি-পরিবর্তন** (Sporadic sound change) বলা হইয়াছে।

কখন কি অবস্থায় ভাষার পরিবর্তন ঘটিবে সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। তবে ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের রীতিকে কতকগুলি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়। অবশ্য এইসব নিয়মেরও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাইবে। বাক্‌প্রবাহে ধ্বনির যে সব পরিবর্তন ঘটে তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ঃ বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম

প্রত্যেকটি ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হইলেও শব্দে ও বাক্যে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন সেই ধ্বনিটির উপর পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির গুণ অনেক ক্ষেত্রেই সংক্রামিত হয়। পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে এবং পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে রূপান্তরিত করিতে পারে। দ্রুত কথাবার্তা বলিবার সময় কিংবা বক্তৃতাকালে শব্দে বা বাকো ব্যবহৃত শব্দ-সমূহের ধ্বনিসমূহ বিশেষ বিশেষক্ষেত্রে নানাভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে। পাশাপাশি দুই শব্দের বা শব্দাংশের স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে **সন্ধি** বলা হয়। সন্ধির বেলায় ও একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম বা সূত্র (Phonetic law) থাকে। বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির সূত্রসমূহ সংস্কৃতের নিয়মানুগ। কিন্তু খাঁটি বাংলায় সংস্কৃতের মত সন্ধি হয় না। মৌখিক বাংলার বহু শব্দে স্বরসন্ধি ক্রিয়াশীল। স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ফলে **আভ্যন্তর সন্ধি ঘটে**।) বাংলা উচ্চারণরীতি এবং শব্দ মধ্যস্থিত ধ্বনি-পরিবর্তন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সূত্র নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

(১) শ্রুতিধ্বনি (Glide)

একই শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি স্বরধ্বনি মিলিয়া যৌগিক স্বরে পরিণত না হইলে দুই স্বরের ফাঁকটুকুতে (hiatus) অর্ধস্বরের (য়, ও, ওয়) আগম ঘটে। এইরূপ ধ্বনির আগমকে শ্রুতিধ্বনি বলে। শ্রুতিধ্বনি সাধারণত লেখায় প্রকাশ করা

হয় না। প্রাকৃতে শব্দমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে পাশাপাশি দুইটি স্বরধ্বনি অবস্থান করিত। কিন্তু অসতর্কভাবে কথা বলিতে গিয়া স্বরধ্বনি দুইটির মাঝে "য়" (=y) উচ্চারিত হইত। প্রাকৃত ব্যাকরণে এই ধ্বনি য়-শ্রুতি নামে আখ্যাত হইয়াছে; একমাত্র অর্ধ-মাগধী ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃত শব্দের বানানে এই শ্রুতিধ্বনি রক্ষিত হয় নাই।

যেমন—হৃদয়>হিঅঅ>হিয়অ; রাজা>রায়া; নগর>নঅর>নয়র।

কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, কিংবা কবিতা আবৃত্তি করিবার সময় বাংলায় শ্রুতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। শ্রুতিধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্জন দুই প্রকারের হইতে পারে।

শ্রুতব্যঞ্জনধ্বনি (Consonantal glide)—"দ"।

ন-কার ও র-কারের মধ্যে অনেক সময় ব্যঞ্জনবর্ণ "দ" শ্রুতধ্বনি হিসাবে উদ্ভূত হইয়া শব্দের বানানে স্থানলাভ করিয়াছে।

যেমন, বৈদিক সূনর>সুন্দর; সং বানর>বান্দর।

বাংলায় শ্রুতস্বরনি (Vowel glide) দুইটি—(ক)-য় (y), (খ)-ও, ওয় (w)।

(ক) য-শ্রুতি—'য়' বর্ণ দ্বারা লিখিত হয়।

(1) ই+এ—ভাই এসেছে=ভাইয়েসেছে।

(2) ই+আ—কি আর খাই (=কিয়ার খাই)

(3) এ+এ—কে এলো (=কেয়েলো)

(4) আ+আ—মা আমার (=মা য়ামার)

(5) আ+এ—বাবা এলো (=বাবা য়েলো)

(6) ও+আ—গোপাল>গোআল>গোয়াল।

(খ) ব-শ্রুতি

বাংলায় ব-শ্রুতি ও, ওয় বা সময় সময় "য়" দ্বারা দ্যোতিত হয়।

যেমন, √ধোআ>ধোওয়া; মোআ>মোয়া; √খাআ>খাওয়া; শূকর>শূওর, শূয়র; √নাআ>নাওয়া; পিআনো>পিয়ানো ইত্যাদি।

(২) স্বরাগম (Prothesis)

উচ্চারণের সুবিধার জন্য পদের আদিতে বিশেষ করিয়া ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বরধ্বনির আগম হইলে ইহাকে স্বরাগম বলে।

যেমন, স্ত্রী>ইথি (পা, প্রা); স্পর্ধা>আস্পদ্ধা; √স্কুল>ইস্কুল; ষ্টেশন> ইষ্টিশন। আঞ্চলিক উপভাষায় র-কারের ও আগম হয়। যেমন, ওঝা>রোজা; আশু>রাশু; আমের রস>রামের অস।

(৩) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis বা Vowel Insertion)

উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ভাঙ্গিয়া উহাদের মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন করার প্রক্রিয়াকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। ছন্দোগত মিল কিংবা সুরের জন্য যুক্ত-ধ্বনির সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করা হইত। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে স্বরভক্তির উদাহরণ মিলে।

যেমন, ইন্দ্র>ইন্দর ; স্নেহ>সিণেহ (প্রা) ; রত্ন>রতন ; পদ্ম>পদুম, পউম ; বাংলা কবিতায় ও গ্রাম্য উচ্চারণে স্বরভক্তির উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(ক) অ-কারের আগম

ধর্ম>ধরম ; চন্দ্র>চন্দর ; জন্ম>জনম ; ভক্তি>ভকতি ; পূর্ব>পূরব ; সূর্য>সুরজ ; ফারসী শর্ম (sharm)>শরম, সরম ; মর্দ (mard)>মরদ।

(খ) ই-কারের আগম

স্নান>সিনান ; হর্ষ>হরিষ ; শ্রী>ছিরি ; প্রীতি>পিরীত, পিরীতি ; তৃপ্ত>তিরপিত ; মিত্র>মিত্তির ; কৃপা>কিরিপা ; ফারসী ফিক্র (fikr)>ফিকির ; ইংরেজী ফিল্ম (film)> ফিলিম্ ; ক্লিপ্ (clip)>কিলিপ্ ; স্পর্শ>ফরিস (প্রা)।

উ-কারের আগম

ভ্রূ>ভুরু ; মুক্তা>মুকুতা ; পদ্মিনী>পদুমিনী। লব্ধ>লুবধু ; শুক্রবার>শুক্কুরবার ; ফারসী মুল্ক্ (mulk)>মুলুক ; ইংরেজী ব্লু>বুলু ; ফ্লুট (flute)>ফুলুট্।

এ-কারের আগম

শ্রাদ্ধ>ছেরাদ্দ ; গ্রাম>গেরাম ; পোর্তুগীস প্রেগু (prego)>পেরেক ; ইংরেজী গ্লাস (glass)>গেলাস ইত্যাদি।

ও-কারের আগম

শ্লোক>শোলোক ; ফারসী মুর্গ (murgh)>মোরোগ, মোরগ।

(৪) স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony)

পূর্বের বা পরের স্বরধ্বনির প্রভাবে পদস্থিত অন্যস্বরধ্বনির প্রকৃতি যখন পরিবর্তিত হয়, তখন এই প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়। তেলুগু, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় স্বরসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। উচ্চারণগত এই বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য বিধান। উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনির প্রভাবে নিম্নাবস্থিত বা মধ্যস্বরধ্বনি এক ধাপ উপরে উন্নীত হয়, কিংবা নিম্নাবস্থিত বা মধ্যস্বরধ্বনির প্রভাবে উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনি একধাপ নীচে নামিয়া আসে।

(ক) পরবর্তী স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি

পরবর্তী অক্ষরে ই, উ, য-ফলা, অথবা জ্ঞ, ক্ষ থাকিলে পূর্ববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও-কার হয়। অ>ও তে পরিবর্তন বানানে লিখিত না হইলেও কথা বলিবার সময় শোনা যায়।

যেমন, অমুক>ওমুক ; অতি>ওতি ; বস্থক>বোস্থক ; রতি>রোতি ; লক্ষ্য> লোক্‌খ ; দৈবজ্ঞ>দোইবোগ্‌গঁ।

(খ) পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও, অ থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের ই>এ হয়।

যেমন, বিড়াল>বেড়াল ; লিখা>লেখা ; শিয়াল>শেয়াল ; গিলে>গেলে ; মিশে> মেশে ; দীপবর্তিকা>দীববট্টিআ>দীঅটি (প্রা-বা)>দেঅটি, দেওটি>দেউটি (দী অক্ষরের "ঈ" অ-কারের প্রভাবে "এ" হইয়াছে এবং টী এর ঈ-কারের দরুণ পূর্বের ও>উ হইয়াছে)।

(গ) পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও, অ থাকিলে পূর্ববর্তী উ-কার "ও" হয়। যেমন, শুনা>শোনা ; দুহে>দোহে ইত্যাদি।

(ঘ) পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও, অ থাকিলে পূর্ববর্তী এ-কার অ্যা' (বাঁকা "এ") হয়। যেমন, দেখে>দ্যাখে ; একা>অ্যাকা ; কিন্তু পরে ই, উ থাকিলে এ-কারের নিজস্ব উচ্চারণ বজায় থাকে।

যেমন, দেখ্‌+ই>দেখি ; দেখ্‌+উক>দেখুক ; একটি, একটু ইত্যাদি।

(ঙ) পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ থাকিলে পূর্ববর্তী "এ"কে একধাপ উপরে তুলিয়া সংবৃত "ই"তে উন্নীত করা হয়।

যেমন, দেই>দিই, দি ; দেশী>দিশি ; নিরামিষ্য>নিরিমিষ্যি ; গিয়াছি>গিইছি, গিছি ; মেলুক>মিলুক ইত্যাদি।

(চ) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ থাকিলে পূর্ববর্তী ও-কার সংবৃত স্বরধ্বনি "উ"তে পরিবর্তিত হয়।

শো+ই>শোই>শুই ; পুরোহিত>পুরুইত>পুরুত ; নিয়োগী>নেউগী।

পরবর্তী অক্ষরে য-ফলা থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের ও-কার উ-কারে পরিণত হয়। (-যফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের প্রভাবে)। এই পরিবর্তন সাধারণত চলিত ভাষায় দৃষ্ট হয়।

যেমন, যোগ্য>যোগ্‌ইয়>যুগ্‌গি (জুগ্‌গি) ; পোষ্য>পোষ্‌ইয়>পুষ্যি।

(ছ) তিন বা ততোধিক অক্ষর সমন্বিত শব্দের অন্ত্যস্বরধ্বনি ই (ঈ) হইলে, শব্দমধ্যস্থিত অ, আ>উ তে পরিবর্তিত হইয়া স্বরসঙ্গতির সৃষ্টি করে।

যেমন, উড়ানী>উড়োনি>উড়ুনি ; এখনি>এখুনি ; কুড়ালী>কুড়ুল ; ছাদনিকা> ছাঅনিআ (প্রা)>ছাঅনী>ছাউনী ; ঠাকুরানী>ঠাক্রুইন>ঠাক্রুন ; তেন্তলী> তেঁতুল ; দীপবর্তিকা>দীববট্টিআ>দীঅটী>দেঅটী, দেওটী>দেউটী , নখহরনিকা> নহ্হরণিআ>নহরনী>নরুন ; পিঠালী>পিঠোলী>পিঠুলী ; শেফালিকা>শেহালিআ> শেহালী>শিউলী ; নাটক+ইয়া>নাটকিয়া>নাটুকে ; নগর+ইয়া>নগরিয়া>নগুরে >নোগুরে ; মাদল+ঈ (ক্ষুদ্রার্থে)>মাদুলী ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী স্বরের সহিত পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি

(ক) শব্দের আদি অক্ষরে "ই" থাকিলে তাহার প্রভাবে পরবর্তী অক্ষরের অ-কার অর্ধ-সংবৃত ধ্বনি "এ" তে পরিবর্তিত হইয়া স্বরস্বঙ্গতি সৃষ্টি করে। যেমন, ই+আ>ই +এ ; বিকাল>বিকেল ; মিথ্যা>মিথ্যে ; ইচ্ছা>ইচ্ছে ; ভিক্ষা>ভিক্ষে ; বিলাত> বিলেত ; ফিতা>ফিতে ; হিসাব>হিসেব ; ছিলাম>ছিলেম ; আজিকার>আজকের।

কিন্তু নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

যেমন, নিবাস, পিশাচ, বিচার ইত্যাদি।

(খ) শব্দের আদিতে উ (ঊ) থাকিলে, পরবর্তী আ-কার "ও"-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন, উ+আ>উ+ও :—পূজা>পূজো ; মূলা>মূলো ; চূড়া>চূড়ো ; খুড়া>খুড়ো ; ধূলা>ধূলো ; ছুতার>ছুতোর ; দুইটা>দুটো ; কুমার>কুমোর।

উ-কারের প্রভাব পরবর্তী অক্ষরে ও প্রতিফলিত হইতে পারে।

যেমন, কুড়ুল ; পুতুর ; শুদ্দুর ইত্যাদি।

(গ) দুই অক্ষর যুক্ত শব্দে পরবর্তী অক্ষরের অ-কার চলিত ভাষায় সাধারণত ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন, রতন>রতোন ; মোরগ>মোরোগ ; গোবর>গোবোর ; ভারত>ভারোত ইত্যাদি।

অপিনিহিতি (Epenthesis)—

শব্দের মধ্যে ই বা উ ধ্বনি থাকিলে সেই ই বা উকে পূর্ব হইতেই উচ্চারণ করিবার রীতিকে অপিনিহিতি বলা হয়। য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি ও দেখা যায়। বাংলায় অপিনিহিতির প্রচলন চতুর্দশ শতক হইতেই লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় অপিনিহিতি এখনও বিদ্যমান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট উচ্চারণে এই

রীতি হয় লুপ্ত হইয়াছে, না হয় অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাধু ভাষায় অপিনিহিতের প্রয়োগ নাই। আবেস্তায় অপিনিহিত "ই" এর প্রাচুর্য দেখা যায়।

যেমন, বভইতি (bavaiti) = ভবতি ; অইর্যো (airyo) = আর্য।

ই-কারের অপিনিহিত—কালি>কাইল>কা'ল ; রাতি>রাইত>রা'ত ; রাখিয়া> রাইখ্-ইয়া>রাইখ্যা>রেখে ; জানিয়া>জাইন্যা>জেনে ; গাঁঠি>গাঁইঠ>গাঁঠ ; আলিপনা>আইল্পনা>আ'লপনা ; কাল+ইয়া>কালিয়া>কাইল্যা>কেলে।

উ-কারের অপিনিহিত উ-কার অনেক ক্ষেত্রেই ই-কারে পরিণত হয়।

যথা—জলুয়া>জউলুয়া>জইলুয়া>জ'লো>জোলো ; দদ্রূ>দদ্দু (প্রা)>দাদু> দাউদ>দা'দ ; সাধু>সাউধ>সাইধ্ ; সাথ্+উয়া>সাথুয়া সাউথুআ>সাইথুআ> সেথো ; গাছুয়া>গাউছুয়া>গাইছুআ>গেছো।

য-ফলা যুক্ত অক্ষরের অপিনিহিতি পূর্ববঙ্গের ভাষায় বিদ্যমান।

যথা—কাব্য>কাব্বিয়া>কাইব্ব ; কন্যা>কন্নিয়া>কইন্যা ; যোগ্য>জোগ্গিয়া >জোইগ্গ ; সত্য>সংতিয়>শইত্ত ; ব্রাহ্ম>ব্রাম্‌হ্মো>ব্রাইম্ম।

ক্ষ, জ্ঞ অক্ষরের উচ্চারণেও ই-কারের অপিনিহিতি হয়। যেমন, যজ্ঞ>জগ্গ> জইগ্গ ; লক্ষ্য>লখ্য>লইক্খ।

অভিশ্রুতি (Umlaut)

অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে পূর্বের স্বরধ্বনির পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে অভিশ্রুতি বলা হয়। এইরূপ পরিবর্তনকে "আভ্যন্তর সন্ধি" বলা যাইতে পারে। ইংরেজী, জারমান, সুইডিস প্রভৃতি ভাষাগুলিতে অভিশ্রুতি রহিয়াছে। বাংলা চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল অভিশ্রুতি। এই রীতি অনুসারে চলিত ভাষার বহুশব্দ এখন সাধুভাষায় ও ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন, থাকিয়া>থেকে ; ছালিয়া>ছেলে ; চাহিয়া>চেয়ে ইত্যাদি। চলিত ভাষায় অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ>ও, আ>এ হয়, এবং ই-কার লুপ্ত হয়।

যেমন' (ক) চলিল>চইল্ল>চ'লল (=চোল্‌লো)

বলিব>বইল্ব>ব'লব (=বোলবো)

লক্ষ্য>লক্‌খিয় (=লোক্‌খো)

(খ) করিয়া>কইর‍্যা>ক'রে (=কোরে) ; চলিয়া>চইল্যা>চ'লে (=চোলে) ; অভ্যাস>অভ্যেস।

(গ) রাখিহ>রাখিঅ, রাখিও>রাইখ্যো>রেখো ; খাইহ>খেয়ো, খেও ; অবিধবা >অবিহবা (প্রা)>অইহঅ (অপ)>আইহ (প্রা-বা)>আইঅ>এও, এয়ো।

(ঘ) আসিয়া>আইস্তা>এসে ; কাসিয়া>কাইস্তা>কেসে ; রাখিয়া>রাইখ্যা >রেখে ; পানিহাটি>*পাইনহাটী>পেনেটী ; কাঁদিহাটী>কেঁদেটি ইত্যাদি।

(ঙ) পটুয়া>প'টো (=পোটো) ; জলুয়া>জ'লো (=জোলো)

(চ) সাথুয়া>সাউথুআ>সাইথুআ>সেথো ; মাছুয়া>মেছো ; গাছুয়া>গেছো ; মাধু+আ (অনাদরে)>মেধো (=মাধব)

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ও অভিশ্রুতি লক্ষণীয়

যথা—বলাইয়া>ব'লিয়ে (=বোলিয়ে) ; শোয়াইয়া>শুইয়ে ; করিয়াছি>ক'রেছি (=কোরেছি) ; নগরিয়া>নগুরে (=নোগুরে) ; শহরিয়া>শহুরে ; কান্দনিয়া>কাঁদুনে ; কোন্দলিয়া>কুঁদুলে ইত্যাদি।

আবার কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যেখানে অপিনিহিত ই-কার বা উ-কার শুধু লুপ্ত হয়, অভিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে হয় না।

যেমন, কালি>কাইল>কা'ল ; রাতি>রাইত>রা'ত (অভিশ্রুতিতে-রেত);

স্বরধ্বনি লোপ

পদস্থিত কোন অক্ষরের উপর প্রবল শ্বাসাঘাত পড়িলে তাহার প্রভাবে অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনি অনেক সময় ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হইল স্বরলোপ।

স্বরলোপ তিনপ্রকার—(১) আদিস্বর লোপ (Aphesis) ; (২) মধ্যস্বর লোপ (Syncope) ; (৩) অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope)।

আদিস্বর লোপের দৃষ্টান্ত

সং উদক>দক (পো) ; সং অলাবু>লাউ ; অভ্যন্তর>ভিতর ; উদ্ধার>ধার ; এরণ্ড>রেড়ী ; উডুম্বুর>ডুমুর।

মধ্যস্বর লোপের দৃষ্টান্ত

সুবর্ণ>স্বর্ণ ; গৃহিণী>*গিরিণী>গিন্নি ; রাধ্না>রান্না ; গামোছা>গাম্ছা ; অঞ্চল >আঁচলা ; রাজকুল>রাউল (প্রা) ; খলু>খু (প্রা)।

অন্ত্যস্বর লোপের দৃষ্টান্ত—দদ্রু>দা'দ ; অগ্নি>আগ ; বৃদ্ধি>বাড় ; ফল>ফল্ ষট্>ছ (পা, প্রা) ; পশ্চাৎ>পচ্ছা (প্রা)।

রূপগত ধ্বনি পরিবর্তন (Morphophonemics)—সমীভবন, বিষমীভবন, স্বরসঙ্গতি, তালব্যীভবন রূপগত ধ্বনি পরিবর্তনের পর্যায়ভুক্ত।

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

স্বতোৎসারিত ধ্বনির প্রভাবে পাশাপাশি অবস্থিত স্বরধ্বনির যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি শব্দের আদিতে ও অন্তে ব্যঞ্জনধ্বনির ও পরিবর্তন ঘটে।

সমীভবন (Assimilation)—পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি অসম ব্যঞ্জন ধ্বনির একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সারূপ্য আনয়ন করে। আবার কখনো কখনো উভয় ধ্বনিই পারস্পরিক প্রভাবে সাম্য লাভ করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবন তিন প্রকার :—প্রগত, পরাগত ও পারস্পরিক।

প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation)—পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হইলে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রগত সমীভবন। যেমন, সং-মুক্ত>মুক্ক (প্রা) ; লগ্ন>লগ্‌গ (প্রা) ; পদ্ম>পদ্দ ; পক্ব<পক্ক ; বৃহস্পতিবার> বিস্‌স্যুদবার। বাংলায় প্রগত সমীভবনের উদাহরণ কম পাওয়া গেলে ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষায় কিছু কিছু নিদর্শন মিলে। যেমন, উপকার>উপ্পার ; নমস্কার> নম্‌সার ; রোজকার>রোজ্জার।

পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation)—পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রভাবে যখন পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, তখন উহাকে পরাগত সমীভবন বলা হয়। যেমন, তর্ক>তক্ক ; ধর্ম>ধম্ম ; পাঁচসের>পাঁশ্‌শের ; বাৎচিত>বাচ্চিত ; সাতজন>সজ্জন ; মূর্খ>মুক্‌খু ; মুক্তা>মুত্তা (প্রা)।

পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত ব্যঞ্জন সন্ধিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন, উৎ+জ্বল> উজ্জ্বল ; উৎ+ডীন>উড্ডীন ; সৎ+জন>সজ্জন।

পারস্পরিক বা অন্যোন্য (**Mutual Assimilation**)—পরস্পরের প্রভাবে দুইটি ধ্বনির পরিবর্তন ঘটিলে উহাকে পারস্পরিক সমীভবন বলা হয়। ব্যঞ্জন সন্ধিতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন,
উৎ+শৃঙ্খল>উচ্ছৃঙ্খল ; তদ+শক্তি>তচ্ছক্তি ; উৎ+শ্বাস>উচ্ছ্বাস ; সত্য>সচ্চ (প্রা) ইত্যাদি।

বিষমীভবন (**Dissimilation**)—সমীভবনের বিপরীত রীতি হইতেছে বিষমীভবন। ইহাতে পদ মধ্যস্থিত দুইটি সমধ্বনির একটি পরিবর্তিত হইয়া যায়। যেমন, পিপীলিকা>কিপিল্লিকা (পা) ; শরীর>শরীল্ ; লাল>নাল্ ; আর্মারিও (পোর্তুগীস armario)>আলমারি ; তিতা>পিতা ; ললাট>নলাট (পা) ; মন্মথ>বম্মহ (প্রা)।

সংস্কৃত দ্বিত্ববোধক ক্রিয়াগুলিতে বিষমীভবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—তিষ্ঠ্<স্থা ; জিঘ্র<ঘ্রা ;

গ্রাসমানের সূত্রের ব্যাখ্যায় ও বিষমীভবনের দৃষ্টান্ত মিলে। যেমন,

* ধধামি>সং দধামি।

সাদৃশ্যীভবন (Similitude)—কথা বলিবার সময় একই ব্যঞ্জনধ্বনি যখন বিভিন্ন স্বরধ্বনির সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়, তখন কিছু না কিছু নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করে। প্রতিটি শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণগত এই অংশের পরিবর্তনের ধারাকে ধ্বনি-বিজ্ঞানে বলা যায় সাদৃশ্যীভবন। যেমন—কলম, কিল, কূল প্রভৃতি শব্দে, "ক" এর উচ্চারণে একটু নূতনত্ব দেখা যায়।

বর্ণ বিপর্যয় বা বিপর্যাস (Metathesis)—পদের মধ্যস্থিত দুইটি বর্ণের স্থান পরিবর্তন ঘটিলে এই ব্যাপারকে বর্ণ বিপর্যয় বলা হয়।

যেমন—জ্যোৎস্না>জোণ্হা (প্রা); মশক>মকস (পা); হ্রদ (>* দ্রহ)>রহদ, দহ (পা)>দহ্ (প্রা, বাংলা); মুকুট>মটুক; পিশাচ>পিচাশ; বারাণসী>বাণারসী; বাক্স>বাস্ক; রিক্সা>রিস্কা; লাফ>ফাল; আকাশ>আশাগ্ (উপভাষায়); পোটলা>টোপলা।

সমাক্ষর লোপ (Haplology বা Syllabic-Syncope)—পদ মধ্যস্থিত পাশাপাশি দুইটি সমধ্বন্যাত্মক অক্ষরের মধ্যে একটি লুপ্ত হইলে ইহাকে সমাক্ষর লোপ বলা হয়।

যেমন, মম+মং>মমং (বৈদিক); মধুধুঘ>মধুঘ; চাক্+খড়ি>চাখড়ি; পাদোদক>পাদোক; কৃষ্ণনগর>কৃষ্নগর; বড় দাদা>বড় দা; বাসগৃহ>বাসঘর>বাসর; ফলাহার>ফলার।

মহাপ্রাণহীনতা, অল্পপ্রাণতা (De-aspiration)—অনাদি অক্ষরে মহাপ্রাণবর্ণ থাকিলে উচ্চারণ কালে তাহা অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিবর্তিত হয়। যেমন, * ভভার ("ভূ" ধাতুর লিট্)>বভার; সুখ>সুক্; দুধ>দুদ্; মধু>মদু; রথতলা>রত্তলা; মাঝজায়গা>মাজ্জায়গা; ভগিনী>বহিন (একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হইয়া অন্য ধ্বনি মহাপ্রাণিত হইয়াছে); তদ্রূপ, মহিষ>ব্হইসঁ>ভৈঁস; সং-কফোণি>কপোণি (পা)।

মহাপ্রাণতা (Aspiration)—অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণ রূপে উচ্চারিত হইলে ইহাকে বলা হয় মহাপ্রাণতা। যেমন, পুকুর>পুখুর; কাঁটাল>কাঁঠাল; এভোঁ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে)>এবে হোঁ; কুব্জ>খুজ্জ (প্রা)।

ঘোষীভবন (Vocalization, voicing)—আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের ফলে ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হয়। শব্দের শেষে অনেক সময় অঘোষধ্বনি ঘোষবৎ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। আবার ঘোষ-ধ্বনির প্রভাবে ও অঘোষধ্বনি ঘোষবৎ ধ্বনিতে পরিণত হয়। তখন এই ব্যাপারকে বলা

হয় ঘোষীভবন। যেমন, খারাপ>খারাব ; শাক>শাগ ; কাক>কাগ ; ডাকঘর>ডাগ্ঘর ; হাতদেখা>হাদ্দেখা ; একঘরে>এগ্ঘরে ; বাপবেটা>বাব্বেটা ; নাত+জামাই>নাজ্জামাই।

অঘোষ স্পর্শবর্ণের ঘোষবর্ণে পরিণত হওয়ার উদাহরণ ব্যঞ্জন সন্ধিতে ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন, দিক্+অন্ত>দিগন্ত ; ষট্+আনন>ষড়ানন ; অপ্+দি>অব্দি ; উৎ+ভব>উদ্ভব ; উৎ+যম>উদ্যম ; যাবৎ+এব>যাবদেব।

অঘোষীভবন (Devoicing, Devocalization)—ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিরূপে উচ্চারিত হইলে ইহাকে অঘোষীভবন বলে। যেমন—

মদ্+ত>মত্ত ; দাগ্কাটা>দাক্কাটা ; রাগ্করা>রাক্করা ; বড়ঠাকুর>বট্ঠাকুর ; বীজ>বীচি ; অবসর>অপ্সর।

ব্যঞ্জনসন্ধিতে ও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত মিলে—তদ্+সম>তৎসম ; তদ্+কাল>তৎকাল ; ক্ষুধ্+পিপাসা>ক্ষুৎপিপাসা ; পৈশাচী প্রাকৃতে এই প্রবণতা লক্ষ্যণীয়— রাজা>রাচা।

ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্বভাব বা দ্বিত্বীভবন (Doubling of Consonant sounds)—শ্বাসাঘাতের জন্য বা শব্দের অক্ষর বিশেষের উপর জোর দেওয়ার ফলে অনেক সময় বাংলায় ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘ বা দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যেমন, একেবারে>এক্কেবারে ; সবাই>সব্বাই ; থাপড়>থাপ্পড় ; সকলে> সক্কলে ; বড়>বড্ড ; ছোট>ছোট্ট।

ব্যঞ্জনধ্বনির দীর্ঘ বা হ্রস্ব হওয়ার উপর অনেক সময় শব্দের অর্থের ও পরিবর্তন ঘটে।

যেমন, মালা (ফুলের মালা) ; মাল্লা (নৌকার মাঝি মাল্লা) ; কাঁচা (অপক্ক) ; কাঁচ্চা (ওজনের মাপ) ইত্যাদি।

নাসিক্যীভবন (Nasalisation)—নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে পূর্ববর্তী বর্ণ আনুনাসিক রূপে উচ্চারিত হইলে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাসিক্যীভবন। যথা—সন্ধ্যা>সন্ঝা>সাঁঝ ; চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ ; স্কন্ধ>কাঁধ ; বন্ধ্যা>বঞ্ঝা>বাঁঝা ; শঙ্খ>শাঁখ ; হংস>হাঁস ; কণ্টক>কাঁটা।

স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalisation)—অনেক সময় দেখা যায় যে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতীতই স্বরধ্বনি আপনাআপনি আনুনাসিক হইয়া যায় ; তখন এই ক্রিয়াকে বলা হয় স্বতোনাসিক্যীভবন। যায়—পুথি>পুঁথি ; খোকা>খোঁকা ; হাসি>হাঁসি ; খেকশিয়াল>খেঁকশিয়াল ; চা>চাঁ ইত্যাদি।

আদি ভারতীয়-আর্য ভাষার অনুস্বার কিংবা বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনিগুলি (Class nasals) আধুনিক বাংলায় চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলির নাসিক্যীভবন হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের

অনুক্রমিক নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ভারতীয়-আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় আদি স্তরেই ইহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত ইহার মধ্যে খানিকটা অনার্য উপাদান আছে।

প্রাকৃত ভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জন সমূহের মধ্যে কখনো কখনো নাসিক্যধ্বনির আগম ঘটিত। সংস্কৃত বক্র প্রাকৃতে বক্ক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা পাই বঙ্ক এবং ইহা হইতে বাঁকা শব্দের চন্দ্রবিন্দুর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অনেক সময় নাসিক্যধ্বনিযুক্ত রূপ প্রাকৃত সাহিত্যে রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু অপভ্রংশ ভাষা সমূহ হইতে আমরা উহাদিগকে নির্ণয় করিতে পারি। বাংলায় মাঁচা কথাটি প্রাকৃত মঞ্চ কথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু প্রাকৃতে মঞ্চ পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কর্কট প্রাকৃতে কক্কড় রূপে পাওয়া যায়। প্রাকৃতে কঙ্কড আর একটি কথা ছিল যাহা হইতে বাংলায় কাঁকড়া হইয়াছে। তদ্রূপ হাঁসি—হংসের মত কোন প্রাকৃত শব্দের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কখনো কখনো দেখা যায় দুইটি নব্যভারতীয়-আর্য ভাষায় (হিন্দী ও বাংলায়) এই বিষয়ে মিল নাই।

যেমন—বাংলায় সাপ, হিন্দী সাঁপ, বাংলায় পা, হিন্দী পাঁও।

বাংলার স্বতোনাসিক্যীভবনের উদাহরণ ঃ—

অক্ষি>অক্‌খি> * অঙ্খি>আঁখি ; ইষ্ট> * ইন্ট>ইট ; খৃষ্ট>খট্‌ট> * খণ্ট> খাঁট। ছিদ্র>ছিদ্দ> * ছিন্দ>ছেঁদা ; নিদ্রা>নিদ্‌দা> * নিন্দা>নিঁদ। কর্কট> কক্কড> * কঙ্কড>কাঁকড়া ; অস্থি>অট্‌ঠি> * অণ্ঠি>আঁঠি।

ইহা পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা রাঢ় অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য। আবার দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের (নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) ভাষায় স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্ত মিলে।

যেমন, কুকুর>কুঁর ; আকাশ>আঁশ।

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে নাসিক্য ব্যঞ্জন প্রায়ই লুপ্ত হয় না।

যেমন, চান্দ<চন্দ্র ; কান্ধ<স্কন্ধ।

আদি নাসিক্য ধ্বনির লোপের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

যেমন, আলিম্পন>আলপনা ; কিঞ্চিৎ>কিছু ; মঞ্চ>মাচা।

ধ্বন্যাত্মক (Onomatopoetic) শব্দগুলির মধ্যে নাসিক্য স্বরধ্বনির স্থিতি লক্ষণীয়।

যথা, চেঁচানো ; আঁকু-পাঁকু ; খাঁ-খাঁ ; খোঁচ-খাঁচ ; সোঁ-সোঁ ইত্যাদি।

মূর্ধন্যীভবন (Cerebralization, Retroflection)

ঋ, র, ষ প্রভৃতি ধ্বনির সংস্পর্শে যখন দন্তবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হয়, তখন এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মূর্ধন্যীভবন।

যেমন, বর্দ্ধ>বড্‌ঢ>বাড় ; মৃত>মট্ট>মড়া ; অস্থি>আঁঠি ; বৃদ্ধ>বুড্‌ঢ (প্রা) >বুড়া ; * প্রথম>পঢম (প্রা) ; বর্ত্তিতে>বট্টদি, বট্টই (প্রা)>বটে।

স্বতোমূর্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralization)

ঋ, র, ষ প্রভৃতি ধ্বনির সাহচর্য ব্যতীত যখন দন্তবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে পরিবর্তিত হয় তখন ইহাকে বলা হয় স্বতোমূর্ধন্যীভবন।

যেমন, সং পততি>পড়ই>পড়ে ; চরতি>চড়ই>চড়ে ; উং-দীন>উড্ডীন ; ঔষধ>ওসঢ (অ-মা) ; স্নান>ণহাণ (প্রা)।

আর্য ভাষায় মূর্ধন্যধ্বনি ছিল না। পণ্ডিতগণ আর্যভাষায় মূর্ধন্যধ্বনি দ্রাবিড় প্রভাবজাত বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, এ অনুমানের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। আর্যরা ভারতে আসিবার পূর্বেই এই বর্ণগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ছাড়াই সুইডিস ভাষায় দন্তবর্ণ হইতে মূর্ধন্যবর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। তবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে ভারতীয়-আর্য ভাষায় মৌলিক ভাবে কিছু কিছু মূর্ধন্যধ্বনির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। পরে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক জাতির সংস্পর্শে এই ধ্বনিগুলি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃতে দন্তবর্ণের মূর্ধন্যবর্ণে রূপান্তরের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

ত+থ>ঠ তে পরিণত হইয়াছে। র+দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যবর্ণে রূপান্তর ক্রমশ একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইজন্যই দেখা যায় বিকৃত, অর্থ, বর্দ্ধিত পরবর্তীকালে যথাক্রমে বিকট, অট্‌ঠ, বড্ডিঅ রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রাকৃত যুগেই বৈদিক র+ত=ট্ট, র+দ=ড্‌ড হইয়াছে। প্রাচ্য প্রাকৃতে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। ইহা খুব সম্ভব যে প্রাচ্য অঞ্চলে এই রীতি জন্ম লাভ করে। পশ্চিমা প্রাকৃত হয়ত প্রথম দিকে এই প্রবণতার প্রভাব রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নাই। কারণ, অনুরূপ পরিবর্তিত রূপ আমরা শৌরসেনী প্রাকৃতে পাই। যেমন, মৃত্তিকা>মট্টিআ>মাটি ; মৃত>মট>মরা ; কিন্তু বর্তিকা>বত্তিআ>বাতি ; মৃত+ইল>মইল প্রভৃতি শব্দে মূর্ধন্যীভবন হয় নাই। উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে র, ঋ ধ্বনির সান্নিধ্যে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে।

স্বতোমূর্ধন্যীভবনের দৃষ্টান্ত প্রাকৃত যুগেই দেখা যায়। সম্ভবত মাগধী প্রাকৃতে এই বৈশিষ্ট্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সাদৃশ্যের ফলে এইরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

যেমন, ষষ্‌+দশ>ষোড়শ ; ত্রয়োদশ>তেরহ্>তের।

কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মূর্ধন্যীভবনের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যেমন, পতঙ্গ>ফড়িং ; দংশ>ডাঁশ ; দক্ষিণ>ডাহিন ; সপ্ততি>সত্তর। এইগুলি স্বতোমূর্ধন্যীভবনের দৃষ্টান্ত।

তালব্যীভবন (Palatalisation)

কোন ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগের পরিবর্তে পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা তালু স্পর্শিত হইলে তাহাকে বলা হয় তালব্যীভবন।

যেমন, এজ্যুকেশন (Education), ইন্‌ষ্টিচ্যুশন (Institution) ; সং তিষ্ঠতি>চিট্‌ঠই (প্রা) ; ষষ্ঠ>ছট্‌ঠ (প্রা)।

উষ্মীভবন (Spirantization)

যখন স্পর্শবর্ণ উষ্মবর্ণের মত উচ্চারিত হয়, তখন ইহাকে বলা হয় উষ্মীভবন।

যেমন, কাগজ>কাগজ় (ইংরেজী "z" এর মত উচ্চারণ) ; ফণী (fani) ; পাঁঠা> ফাডা (fada)।

নোয়াখালী-চট্টগ্রামের উপভাষায় এই প্রকার উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়।

পূজা>ফূজা ; কালী>খা'লী ; **নিয়া** প্রাকৃতে উষ্মীভবনের প্রাচুর্য দেখা যায়।

সকারীভবন (Assibilation)

স্পৃষ্টধ্বনি যদি স, শ বা জ এর মত উচ্চারিত হয় তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় সকারীভবন। যেমন, গাছতলা>গাস্‌তলা ; আছে>আসে (পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ) ; মেজদা>মেজ়দা।

রকারীভবন (Rhotacism)

"জ" এর মধ্য দিয়া স-কারের রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে রকারীভবন বলা হয়। স>র— যেমন, পঞ্চদশ>পন্নডহ>পনর ; ইংরেজী হস (hasa)>*হজ>হেয়ার (hare) ; * নিসদো (nisdo)> * নিজ্‌দ (nizda)>নীড়। * ডুসমেনেস (dusmenes)> ইন্দো-ইরানীয় ডুজ়মনস্>সং দুর্মনস।

শীৎকার বা কাকুধ্বনি (Clicks)

প্রত্যেক ভাষাতেই এরূপ অনেক ধ্বনি আছে যেগুলি ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণ দ্বারা দ্যোতিত করা সম্ভব নহে। হর্ষ, বিষাদ, করুণা, বিস্ময়, বিরক্তি প্রভৃতি আকস্মিক

ভাব প্রকাশ করিবার সময়, কিংবা বাঁশীর শব্দ, পাখীর ডাক, মেঘের গর্জন, তবলার বোল, বৃষ্টি-পতনের শব্দ বুঝাইতে এই ধ্বনিগুলি ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ধ্বনিকে শীৎকার বলা হয়।

যেমন, ঝম্‌ঝম্, খটাখট্, ধিন্-তা-তা ধিন্, টাগ ডুমাডুম, পোঁ-পোঁ, ইস, উদ্ প্রভৃতি। **বাণ্টু, বুশ্‌মান, হটেণ্টট** প্রভৃতি ভাষা-গোষ্ঠীতে শীৎকার ধ্বনি সমূহের প্রচুর ব্যবহার রহিয়াছে।

কণ্ঠনালীয়ভবন (Glottalization)

স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ কালে কণ্ঠনালীর আকুঞ্চন হইলে ইহাকে কণ্ঠনালীয়ভবন বলা হয়। সিন্ধী ও পাঞ্জাবীতে এই প্রকার উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গের উপভাষায় ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ ঘ, ঢ, ধ, ভ এবং হ-কার যথাক্রমে কণ্ঠনালীয় স্পর্শধ্বনি গ', ড', দ', ব', (') রূপে উচ্চারিত হয়। এই প্রকার ধ্বনির নাম দেওয়া হইয়াছে আভ্যন্তর স্পৃষ্ট (Implosive or Recursive) কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি (stops with glottal closure)। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই ধ্বনিগুলি হইতেছে "কণ্ঠনালীর মুখে অবস্থিত মুখদ্বার স্বরূপ পেশীগুলির স্পর্শ ও ঝটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পর্শধ্বনি"।

র-কার ও হ-কারর লোপ প্রবণতা

চলিত বাংলায় শব্দমধ্যস্থিত র-কার ও হ-কার অনেক সময় লুপ্ত হয়।

যেমন, র-কার লোপ—করিতে>কত্তে ; ধর্ম>ধম্ম ; করছি>কচ্ছি।

হ-কার লোপ—পুরোহিত>পুরুত ; চাহিবে>চাইবে ; খড়দহ>খড়দা ; বাদশাহ্>বাদশা ; ফলাহার>ফলার।

ল-কার ও ন-কারের স্থান পরিলর্তন—

বাংলা উচ্চারণে অনেক সময় ল-কার ও ন-কারের স্থান পরিবর্তন হয়।

যেমন, ল>ন—লুচি>নুচি ; লোহা>নুআ ; লেপ>নেপ ; লাল>নাল ; লবণ>লুন।

ন>ল—নাচার>লাচার ; নগ্ন>লাঙ্গা ; নুকসান (ফারসী)>লোকসান। এই রীতি অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীতে ও লক্ষণীয়।

দ্বিরুক্তি (Repetatives)—অনেক সময় কোন ধ্বনি বা শব্দের পুনরুক্তি করিয়া একথা বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন—কচ্‌কচ্, ধপ্‌ধপ্, বলে কয়ে, ভালয়-ভালয় ; ঘরে-ঘরে, ভুরি-ভুরি, বস্তা-বস্তা ইত্যাদি।

অক্ষর, শব্দ ও বাক্যের ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

ভাষায় বাক্যস্থিত প্রত্যেকটি শব্দ স্বতন্ত্র ধ্বনির সংযোগে গঠিত হয়। আবার নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত প্রত্যেকটি অক্ষর (syllable) শব্দ বা বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ (unit)। একটি অক্ষরের অন্তর্নিহিত প্রথম ধ্বনি নিঃসৃত গুণটি শব্দে ও বাক্যে বিস্তৃত হইয়া অপরূপ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে। পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে অন্যধ্বনির গুণগত পরিবর্তনের দিকটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ শব্দের ও বাক্যের সামগ্রিক ছন্দোগত বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়—

(১) **ওষ্ঠ্যীভবন** (Labialization)

(২) **তালব্যীভবন** (Palatalization)

(৩) **ঘোষীভবন** (Voicing)

(৪) **মহাপ্রাণতাভবন** (Aspiration)

(৫) **নাসিক্যীভবন** (Nasalization)

(৬) **মূর্ধন্যীভবন** (Retroflexion)

(১) সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন :—

বাংলায় অ, উ, ও এই এই ধ্বনি তিনটির উচ্চারণকালে ঠোঁট বর্তুলাকার ধারণ করে। ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে এই স্বরধ্বনি সংযুক্ত হইলে সংস্পর্শ জনিত প্রভাবের ফলে সমগ্র অক্ষরটি গোলাকার প্রাপ্ত হয়। ঠোঁটের এই গোলাকার প্রাপ্তিকে সামগ্রিক ওষ্ঠীভবন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ওষ্ঠ্যধ্বনি ব্যতীত অন্য ধ্বনির উচ্চারণের সময় সেই ধ্বনির ও ওষ্ঠীভবন হইতে পারে।

(২) সামগ্রিক তালব্যীভবন :—

বাংলায় ই, এ, অ্যা' এই তিনটিকে সম্মুখাবস্থিত স্বরধ্বনি বলা হয়। এই ধ্বনিগুলি কোন ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হইলে সমগ্র অক্ষরটিই সম্মুখ-প্রসৃত ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে অবস্থিত য়-শ্রুতি শব্দ বা বাক্যাংশকে "সম্মুখীভবন" গুণান্বিত করিয়া তোলে।

(৩) সামগ্রিক ঘোষীভবন (Prosody of Voicing)

বাংলায় স্বরধ্বনিগুলি ঘোষবৎ ধ্বনি। ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির সংস্পর্শের ফলে সমগ্র অক্ষরটিই ঘোষতাগুণ প্রাপ্ত হয়। শব্দের বা বাক্যাংশের এইরূপ ঘোষতা প্রাপ্তি সামগ্রিক ঘোষীভবনের অন্তর্গত।

(৪) সামগ্রিক মহাপ্রাণতাভবন (Prosody of Aspiration)

বাক্যমধ্যস্থিত কোন শব্দের শেষ অক্ষর মহাপ্রাণ বর্ণ হইলে পরবর্তী শব্দের আদি স্বরধ্বনি মহাপ্রাণিত হইতে পারে। এই ভাবে সম্পূর্ণ শব্দ বা বাক্যাংশকে মহাপ্রাণিত করিয়া তোলে।

যেমন, এক হারা>এখারা ; কাঠ আনো>কাঠানো ইত্যাদি।

(৫) সামগ্রিক নাসিক্যী ভবন (Prosody of Nasalization)

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অনুরণন পরবর্তী স্বরধ্বনিতেও প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সমগ্র অক্ষরটিই আনুনাসিকতা গুণ প্রাপ্ত হয়। অক্ষর বা শব্দের নাসিক্য-অনুরণনকে "Prosody"র অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৬) সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন (Prosody of Retroflexion)

কোন শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য যখন অন্য ধ্বনিতে সংক্রামিত হয় তখন মূর্ধন্যীভবনতা সমগ্র অক্ষরের গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। অক্ষর বা শব্দের এইরূপ মূর্ধণ্যীভবন "Prosody"র অন্তর্ভুক্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শব্দ প্রভাবিত ও অর্থানুমোদিত ধ্বনি পরিবর্তন

কথা বলিবার সময় কোন ধ্বনিই বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হয় না। বাক্যের সমগ্র অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয়। বাক্যের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধ যুক্ত পদ পৃথক পৃথক ভাবে সজ্জিত থাকে। প্রয়োজন বোধে সেই পদগুলির সাদৃশ্যে নূতন নূতন শব্দ তৈয়ারী করা চলে। এইভাবে অর্থবান পদ সমষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য পদের ধ্বনি বা অর্থ পরিবর্তন হইলে এই ব্যাপারকে বলা হয় **সাদৃশ্য** (Analogy)।

সাদৃশ্যের কার্য সাধারণত তিন প্রকার—(ক) পদের ধ্বনিপরিবর্তন (খ) নূতন পদের সৃষ্টি (গ) পদের অর্থ পরিবর্তন।

ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে সাদৃশ্যের প্রভাব অপরিসীম। সাদৃশ্যের ফলে মানুষ পরস্পর-অসংলগ্ন পদসমূহ যথাযথভাবে বাক্যে প্রয়োগ করিয়া ব্যাকরণের নিয়মাবলীর মধ্যে সমতা আনিতে সক্ষম হইয়াছে এবং ক্রমশ ক্রমশ শব্দরূপে ও ধাতুরূপে ব্যাকরণের জটিলতা

ত্বরীভূত হইয়াছে। সাদৃশ্যের ফলেই ভাষার পরিবর্তন অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। নতুবা কোন ভাষাই দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকিত না।

সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন :—

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করিলেই এই ব্যাপার স্পষ্ট হইবে। প্রাকৃত ছিল জনসাধারণের ভাষা। এই ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলতা ছিল না। ভাষা সরল হইলে ইহার ব্যাকরণ ও স্বভাবতই সহজ হয়। সংস্কৃত স্বরান্ত শব্দরূপে শব্দের অন্ত্য স্বরধ্বনি অনুযায়ী পদের পৃথক পৃথক রূপ হয়। কিন্তু প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে ই-কারান্ত, উ-কারান্ত প্রভৃতি শব্দের রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (যেমন, নরস্‌স (=নরস্য), মুনিস্‌স (=মুনেঃ), সাহুস্‌স (=সাধোঃ); পিউস্‌স (=পিতুঃ), ণাবস্‌স (=নাবঃ)। ইংরেজী—shall ও will এর অতীতকালের রূপ should ও would; should ও would এর সাদৃশ্যে can এর অতীতকালের রূপ could হইয়াছে।

সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ ই-কারান্ত বিশেষ্যপদের সম্প্রদান-অপাদান-সম্বন্ধ-অধিকরণে দুইটি করিয়া রূপ হয়। তন্মধ্যে একটি রূপ পুংলিঙ্গ ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত। ত্বদীয়, মদীয় শব্দের সাদৃশ্যে "ভবতীয়" (=ভবৎ+ঈয়) শব্দ ভবদীয় হইয়াছে।

নূতন শব্দ সৃষ্টি :—

বউড়ী (<বধুটী) শব্দের সাদৃশ্যে শ্বাশুড়ী ও ঝিউড়ী শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রমা শব্দ পালিতে চন্দ্রিমা হয়। চন্দ্রিমার সাদৃশ্যে "পূর্ণমা" শব্দ পূর্ণিমা হইয়াছে। তেমনি, ধোবানী শব্দের সাদৃশ্যে মজুরনী, নাটিকা শব্দের সাদৃশ্যে কবিতিকা, নাবালক (<ফরাসী নাবালিগ্‌) শব্দের সাদৃশ্যে সাবালক, বক্তব্য শব্দের সাদৃশ্যে কহতব্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বিধবা শব্দের সাদৃশ্যে সধবা শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। শিশুরা অনেক সময় একটি শব্দের অনুকরণে অন্য শব্দ তৈয়ার করে। কিন্তু ভাষার ইতিহাসে শিশু সৃষ্ট শব্দের বিশেষ কোন মূল্য নাই।

সংস্কৃতে দ্বিবচন :—

পূর্বে সংস্কৃতে জোড়া জোড়া অর্থে দ্বিবচনের প্রয়োগ হইত। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য শব্দ যেগুলি সর্বদা একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় (Natural pairs), সেই সব ক্ষেত্রেই শুধু দ্বিবচন প্রযুক্ত হইত। যেমন, পাদৌ, হস্তৌ, পিতরৌ, মিত্রাবরুণৌ।

বিপরীত অর্থ-দ্যোতক শব্দেও ব্যবহৃত—সুখদুঃখে, জয়াজয়ৌ; কিন্তু পরবর্তীকালে এইরূপ প্রয়োগ দ্বন্দ্ব সমাসেও দেখা যায়।—সিংহ শৃগালৌ; কাককুর্মৌ।

শব্দের অর্থ পরিবর্তন :—

রবীন্দ্রনাথ বৈদিক রোদসী ("অন্তরিক্ষ" বাচক) শব্দের সাদৃশ্যে ক্রন্দসী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। দম্পতী শব্দের "দম্‌" (লাতিন—domus, তুলনীয়, ইংরেজী—

domestic) শব্দের মৌলিক অর্থ "গৃহ"। সুতরাং শব্দটির অর্থ "গৃহের পতি"। পরবর্তীকালে জায়াপতীর "জায়া" শব্দের সাদৃশ্যে "দম্" শব্দের অর্থ দাঁড়াইল জায়া। এখন দম্পতী শব্দের অর্থ-জায়া ও পতি।

মিশ্রণ (Contamination) :—

একটি মাত্র শব্দের সাদৃশ্যে যদি অপর কোন শব্দের পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে ইহাকে বলা হয় মিশ্রণ। পোর্তুগীস আনানস্ (annas) বাংলায় আনারস হইয়াছে "রস" শব্দের প্রভাবে। বাংলায় সব<সর্ব হইয়াছে "সভা" শব্দের প্রভাবে। পাউরুটি=পোর্তুগীস পাউ+হিন্দুস্থানী রুটি সমার্থক শব্দ ; Camel+leopard=Cameleopard।

জোড় কলম শব্দ (Portmantean word)

ইহাও একপ্রকার মিশ্রণ। এখানে দুইটি ভিন্ন শব্দের সংযোগে একটি একটি নূতন শব্দ সৃষ্ট হয়। যেমন, পয়োধর+ভার>পয়োভার ; অরি+বৈরী>ঐরি (মধ্য বাংলা) ; আরবী মিন্নৎ+সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি>বিণ্ণত্তি (প্রা)>বিনতি>মিনতি। গহন+গভীর> গহীন ; জহার+বভার>জভার (বৈদিক), তৃষ্ণা+পিপাসা>তিয়াস , খর+গরল> খরল (ম-বা)। ফাঁদ+পাশ>ফাঁস ; ফলা+পাতা>ফাতা ; কীরক+করণিক> কেরানী ; কিরাত+তিক্ত>চিরাতা ; নিমতা<নিম্ব+তিক্ত।

লোক নিরুক্তি (Folk-etymology)

ধ্বনি সাম্যের ফলে কখনো কখনো কোন বিদেশী বা অপরিচিত শব্দ কোন পরিচিত শব্দের সাদৃশ্যে পরিবর্তন লাভ করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় লোক নিরুক্তি। যেমন, ইংরেজী আর্মচেয়ার (Arm-Chair) বাংলায় আরাম কেদারা হইয়াছে। হাতে-নাতে কথার "নাতে" "হাতে" শব্দের সাদৃশ্যে গঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত বিস্ফোটক বাংলায় বিষফোড়া হইয়াছে (বিষ শব্দের প্রভাবে)। ইংরেজী হস্‌পিটাল (hospital) বাংলায় হাঁসপাতাল হইয়াছে। Tobacco শব্দ তাম্রকূট হইয়া বাংলায় তামাক হইয়াছে (তামাটে রং বলিয়া)। টাকার কুমীর-এর কুমীর আসিয়াছে কুবের শব্দ হইতে (কুবের>কুবীর >কুমীর। সংস্কৃত উদ্বর্তন হইতে বাংলায় রূপটান শব্দ আসিয়াছে। উদ্বর্তন>উব্বট্টন (প্রা)>উবটন (প্রা-বা)>রূপটান (রূপ ও টান শব্দ দুইটির প্রভাবে)।

বিষমচ্ছেদ (Metanalysis)

সাদৃশ্যের প্রভাবে কিংবা অজ্ঞলোকের উচ্চারণ বিকৃতির ফলে কখনো কখনো শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয় কিংবা নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়। শব্দ বিকারের এই ধারাকে বলা হয় বিষমচ্ছেদ। যেমন, বিধবা শব্দের মৌলিক অর্থ "বিযুক্ত" ; পরে অর্থ দাঁড়াইল

"পতিবিরহিত"। এইভাবে বি-ধবা শব্দের অর্থ হইল "বিগত ভর্তৃকা"। পরবর্তীকালে পতি অর্থে "ধব" শব্দের সৃষ্টি হইল। তদ্রূপ নি+ধুবন>নিধু+বন, বর্গির>বর্গি (ষষ্ঠী বিভক্তি জ্ঞানে "র" পরিত্যাগ করিয়া) হইয়াছে। পশব্য, শরব্য প্রভৃতি শব্দের "ব্য" প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া পিতৃব্য, ভ্রাতৃব্য, মৃগব্য প্রভৃতি নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। অসুর শব্দের অর্থ দৈত্য ; পরে অ+সুর [দেবতা]। অসিত—কৃষ্ণবর্ণ ; পরে অ+সিত [শ্বেত]।

সংস্কৃত নবরঙ্গ>ফারসী নারাঙ্গ>আরবী নারাঞ্জ>প্রাচীন ইংরেজী an orange ; তাহা হইতে আধুনিক ইংরেজীতে an orange হইয়াছে। এইরূপে a nader হইতে an ander হইয়াছে।

সংস্কৃত "নৃ" শব্দের (গ্রী—aner, আ—নেরে) দ্বিতীয়ার এক বচনে "নরম্" হয়। তাহা হইতে নূতন করিয়া 'নর" শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কুলীনের সাদৃশ্যে "কুন্তলীন" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে।

অনুকার শব্দ (Echowords, Jingles)—বাংলায় প্রতিধ্বনি বা অনুকার শব্দ ব্যবহারের রীতি আছে। দ্রাবিড় ভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইহাতে শব্দের দ্বিতীয়াংশ প্রথম অংশেরই সামান্য পরিবর্তিত রূপ। যেমন, ঘোড়াটোড়া, জলটল, ভুবটুদ্, বইটই ইত্যাদি।

সিংহলী ভাষায় পাওয়া যায়—পেট্টি-বেট্টি (বাক্সগুলি) হরক-বরক (গাভীগুলি)।

আধুনিক ফারসী ভাষায় প্রয়োগ আছে—লূটি-পূটী (ভবঘুরে) ; চিলউ-মিলউ (ভাতের থালা)।

জাপানী ভাষায় ও দৃষ্ট হয়—টোকোরো-ডোকোরো (স্থান সমূহ) ; কুলি-গুলি (বিভিন্ন দেশ)।

অনুগামী শব্দ (Tag word)—কোন কোন শব্দের দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশেরই ঈষৎ সম্প্রসারিত রূপ ; এইরূপ শব্দকে অনুগামী শব্দ বলা হয়। যেমন, ছেলেপিলে, রাজরাজড়া।

সমধ্বনি শব্দ (Homonym)—উচ্চারণে একরূপ হইলেও যখন বানানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, তখন সেই জাতীয় শব্দকে সমধ্বনি শব্দ বলা হয়। যেমন, শোনা<শ্রবণ ; সোণা<স্বর্ণ। সই=সখী, সই=সহ্য করি ; ডাল=খাদ্য বিশেষ ; ডাল=বৃক্ষের শাখা। সংস্কৃতে অরি শব্দের অর্থ শত্রু ও মহৎ।

চতুর্দশ অধ্যায়

শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

শব্দার্থতত্ত্বে শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস আলোচিত হইয়া থাকে। ভাষার পরিবর্তন শুধু ধ্বনি এবং পদের পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক সময় শব্দের অর্থ পরিবর্তন ও অনিবার্য কারণে ঘটে। সুতরাং শব্দার্থ-পরিবর্তন ভাষা-বিজ্ঞানের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে মানুষের বিচিত্র চিন্তাধারা ও প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক শব্দেরই একাধিক অর্থ থাকে। বিভিন্ন বাক্যে প্রযুক্ত একই শব্দের অর্থ ভিন্ন হয়। আবার অনেক সময় কোন শব্দের মুখ্য অর্থের পরিবর্তে গৌণ অর্থই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। কখনো কখনো বাক্য-মধ্যস্থিত কোন শব্দের অর্থ কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শব্দ একই রূপ প্রাপ্ত হয়। যেমন, সই<সহ্যতে—সহ্য করি ; সই<সখী ; ডাল<দাল—খাদ্য বিশেষ ; ডাল—বৃক্ষের শাখা।

ভাষার শব্দের অর্থপরিবর্তনের কারণ সমূহ নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে, তবে মনস্তাত্ত্বিক (Peycho'oglcal) কারণই প্রধান। অনেক মময় অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাসে অনেকগুলি কারণ নিহিত থাকে। শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তন কিংবা সাদৃশ্যগত নূতন শব্দের সৃষ্টি হওয়ার ফলে অনেক সময় শব্দের প্রধান অর্থের স্থানে অপ্রধান অর্থই প্রাধান্য লাভ করে। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারায় নিম্নলিখিত কারণ সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

(১) বিশিষ্ট ভাবধারা প্রকাশের জন্য ভাষার আলঙ্কারিক প্রয়োগ।

(২) পরিবেশের পরিবর্তন—(ক) ভৌগোলিক (খ) সামাজিক (গ) বস্তুগত।

(৩) সম্বোধনের সময় শিষ্ট ভাষার প্রয়োগ।

(৪) সুভাষণ (Euphemism)

(৫) ভাবাবেগের আতিশয্য।

(৬) শব্দের যথার্থ প্রয়োগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

(৭) শব্দের অর্থের অস্পষ্টতা।

(৮) কোন শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির তারতম্য।

(৯) সাদৃশ্যের প্রভাব।

বক্তার উদ্দেশ্য হইতেছে তাহার মনোভাবকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করা। সেজন্য অনেক সময় তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা বাক্যে অনেক সময় weighty argument, sweet word, beaming face প্রভৃতি ভাববাচক শব্দ ব্যবহার করি। অথবা বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ প্রকাশ করিতে গিয়া—"the teeth of a saw," "the eyes of a potato" প্রভৃতি প্রয়োগের ধারা বাক্যে দেখা যায়।

পরিবেশের পরিবর্তনের ফলেও শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যখন কোন প্রাণী বা বৃক্ষের নাম এক দেশ হইতে অন্য দেশে আসে, তখন অনেক সময় সেই শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন ফারসী "শীর" (Shir) শব্দের অর্থ হইল সিংহ। কিন্তু বর্তমানে ইহার অর্থ—বাঘ। "Corn" শব্দের অর্থ শস্য। কিন্তু আমেরিকার "maize" অর্থ প্রযুক্ত হয়। (ইহা আদিবাসীদের প্রধান খাদ্য)। ইন্দো-ইউরোপীয় শাখায় সমগোত্রীয় বৃক্ষ এবং প্রাণীবাচক শব্দগুলির অর্থ বিভিন্ন পরিবেশে ,পরিবর্তিত হইয়াছে। ইংরেজী beech এবং লাতিন fagus শব্দের অর্থ এক। কিন্তু ইহাদের সমগোত্রীয় গ্রীক Phago´s শব্দের অর্থ "oak"। সংস্কৃত ধূমঃ শব্দ গ্রীকে থুমোস (thumo´s) হয়—কিন্তু গ্রীকে ইহার অর্থ "আত্মা"। আবার সংস্কৃত আত্মা শব্দের সমগোত্রীয় গ্রীক শব্দ "আত্মোস"-এর অর্থ হইতেছে ধূম, বাষ্প।

সংস্কৃত ভ্রাতা শব্দের সগোত্রীয় গ্রীক Phra´tēr শব্দের অর্থ জ্ঞাতিভ্রাতা। ভাই অথবা ভৈয়া শব্দে যে কোন লোককে বুঝায়। দাদা শব্দে ও তাই। সংস্কৃতে শ্বশুর, শ্বশ্রূ শব্দের অর্থ স্বামীর পিতা ও মাতা। পরবর্তীকালে অর্থ সম্প্রসারিত হইয়া স্ত্রীর পিতামাতাকেও বুঝায়। গ্রীকে hekuro´s, hekure শব্দের অর্থ স্বামীর পিতা ও মাতা। বর শব্দের অর্থ স্বামী, যদিও বর্তমানে স্ত্রী বর নির্বাচন করে না।

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গেও শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। যে যে উপাদানের দ্বারা জিনিষপত্র তৈয়ারী হয়, তাহাদের নাম অনুসারেই সেই সব জিনিষগুলির নাম হয়। পূর্বে কাগজ—"Papyrus pith" হইতে তৈয়ারী হইত, কিন্তু বর্তমানে তাহা হয় না। Pen শব্দের অর্থ ছিল পালক (Latin—pinna); কিন্তু এখন আমরা ষ্টিল্ পেন, ফাউনটেন পেন ব্যবহার করি।

Volume শব্দের মৌলিক অর্থ 'roll of paper'—কাগজের সমষ্টি। গ্রন্থ (√গ্রথ্—বাঁধা অর্থে) শব্দের অর্থ তালপাতার সমষ্টি। "bearer" শব্দের অর্থ-যে বহন করে। কিন্তু বর্তমানে সে অর্থে প্রযুক্ত হয় না। বাংলায় "চীজ" শব্দটির অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয়।

সম্বোধনের সময় সাধারণত সম্ভ্রম-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর কয়েকটিতে মধ্যম পুরুষে দুইটি করিয়া রূপ পাওয়া যায়—একটি সাধারণ অর্থে

অপরটি সম্ভ্রমার্থে প্রযুক্ত। আপ্<আত্মন্—গৌরবে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভবৎ শব্দের অর্থ 'আপনি'। উর্দু ভাষায় সম্ভ্রমসূচক শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য লক্ষণীয়। নিজের বাসস্থানকে বলা হয় 'গরীবখানা', অভ্যাগতের বাসস্থান সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় 'দৌলতখানা'। জাপানে ভদ্রতাসূচক শব্দের প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা বেশি। শিক্ষিত পরিবেশে এক প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হয়, সাধারণ লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় অন্য শব্দ প্রযুক্ত হয়।

অকল্যাণকর বা কুৎসিৎ অর্থবাচক কোন শব্দকে ভদ্রভাবে প্রকাশ করিবার সময় অনেক সময় সুভাষণ অলঙ্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়। চাউল বা ভাত না থাকিলে স্ত্রীলোকেরা 'চাল বাড়ন্ত', 'ভাত বাড়ন্ত' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে পাচক ব্রাহ্মণকে বলা হয় মহারাজ, বাংলায় বলা হয় ঠাকুর। মৃত্যুর কথা সরাসরি না বলিয়া অন্য উপায়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন সংস্কৃতে পঞ্চত্বং গতঃ; বাংলায় 'কালোচিত ধামে' গমন করিয়াছেন। বেশি কন্যা সন্তান হইলে 'আন্নাকালী' (আর না কালী), সীমারেখা প্রভৃতি নাম রাখা হয়। বসন্তরোগের উপশমের নিমিত্ত 'শীতলা মার' পূজা দেওয়া হয়।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে অতিরঞ্জিত করা। ইংরেজীতে অতিশয় অর্থে "dreadfully funny story", "an aufully nice man" প্রভৃতি কথা প্রচলিত। বাংলায় ভয়ঙ্কর, ভয়ানক, প্রচণ্ড প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, ব্যাজস্তুতি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের সাহায্যে শব্দ বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়া এক নূতন অর্থ প্রাপ্ত হয়। যেমন,—

উদ্বেল শব্দের অর্থ "ব্যাকুল"—কিন্তু মৌলিক অর্থ "বেলাভূমি অতিক্রমকারী"। শ্বাপদ শব্দে "জন্তুকে" বুঝায়, কিন্তু মূল অর্থ—"কুকুরের মত পা বিশিষ্ট প্রাণী।" কীর্তিকলাপ শব্দের অর্থ "কীর্তিসমূহ", কিন্তু অর্থ 'ময়ূরপুচ্ছের মত বিস্তৃত কীর্তি'। স্তম্ভিত শব্দের অর্থ "বিস্মিত", কিন্তু মূল অর্থ>"স্তম্ভত্ব প্রাপ্তি"। "সে দুপাতা পড়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে"—এখানে "দুপাতার" অর্থ "দুইএকখানা বই"। রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগের ফলে অনেক সময় শব্দের আসল অর্থ লুপ্ত হয়। পরবর্তী অর্থ ও অনেক সময় বোধগম্য হয় না। যেমন, গবাক্ষ শব্দের আসল অর্থ "গোরুর চোখ"। প্রাচীনকালে ঘরে গোরুর চোখের মত ঘুলঘুলি জানালা থাকিত। তাহা হইতেই পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থ দাঁড়াইয়াছে "জানালা"। সগোত্র শব্দের আসল অর্থ "এক গোয়ালে গোরু রাখে"। গোষ্ঠী শব্দের মৌলিক অর্থ "যেখানে অনেক গোরু থাকে"। তাহা হইতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে "সমূহ"। মধুর শব্দের মুল অর্থ "মধুযুক্ত"—তাহা হইতে অর্থ আসিয়াছে "সুস্বাদু, মনোরম"। বনস্পতি শব্দের অর্থ হইতেছে—"বনের সর্বাপেক্ষা

বড় বৃক্ষ" ; পরে অর্থ দাঁড়াইয়াছ "বড় বৃক্ষ। দারুণ শব্দের মৌলিক অর্থ 'দারু নির্মিত' ; পরবর্তীকালে অর্থ দাঁড়াইয়াছে কঠিন। হস্তী শব্দের অর্থ—"যাহার হাতের মত শুড় আছে।" "হাড়ির মত বড়" অর্থে হাড়িয়া>হেঁড়ে। বিবাহ শব্দের মূল অর্থ "বহন করিয়া আনা"। প্রাচীনকালে বিবাহের ব্যাপারে কন্যাকে অপহরণ করিয়া আনা হইত। বর্তমানে সেই প্রথা বিলুপ্ত।

বাংলায় লক্ষ্যার্থে ও ব্যঙ্গার্থে অগণিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ রহিয়াছে। ইহাতে ভাষার অর্থগৌরব বাড়ে এবং সাহিত্যের সুষমা বর্ধিত হয়। যেমন, অঙ্কে তাহার মাথা নাই (এখানে মাথার অর্থ "বুদ্ধি"); তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল (অর্থাৎ তাহার মৃত্যু হইল)। বাংলা বাগ্‌ভঙ্গী ও প্রবচনে এইরূপ প্রয়োগের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, অরণ্যে রোদন (বৃথা চেষ্টা); অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা); আকাশ থেকে পড়া (বিস্ময়ের ভাণ করা) ইত্যাদি।

বাংলায় "আ" প্রত্যয় যোগেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, ভাত—ভাতা; মুখ—মুখা; পা—পায়া; ছাত—হাতা প্রভৃতি। বিভিন্ন ভাষায় অর্থালঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্যে মানুষের মনন শক্তির একটা ঐক্যধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন পুস্তকের বেলায় আমরা বৃক্ষ বা উদ্ভিদের একটা সম্পর্ক খুঁজিয়া পাই—কাণ্ড শাখা, পল্লব, পর্ব, স্কন্ধ, biblos প্রভৃতি।

কোন ভাষা গোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস ও ভাবধারার পরিচয় শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে খানিকটা পাওয়া যায়। তদানীন্তন সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান জন্মে। প্রাচীন যুগে বস্তুর ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহারও কিছু আভাস মিলে। সংস্কৃত "পশু" শব্দের "গৃহপালিত জন্তু"। কিন্তু পশুর সমগোত্রীয় "fee" শব্দের অর্থ হইতেছে "পারিশ্রমিক"।

ইন্দো-ইরানীয় "দইব" শব্দের অর্থ ছিল দেবতা।

সংস্কৃতে প্রাচীন অর্থ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ফারসীতে শব্দটির অর্থ হইল "দৈত্য", কারণ ঈরানে জরথুশ্‌ত্র দেব উপসানার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ইংরেজী demon শব্দটির অর্থ "দৈত্য"। কিন্তু গ্রীকে শব্দটির অর্থ "দেবতা"। এইরূপে সংস্কৃত রথ্যা হইতে আগত নাছ (রথ্যা>রচ্ছা, লাছা>নাছ) শব্দের অর্থ ও পবিবর্তিত হইয়াছে। শব্দটির সংস্কৃতে অর্থ ছিল "প্রশস্ত পথ"; বাংলায় দাঁড়াইল "খিড়কি দরজা।" বৈদিকে 'কীলান' 'শব্দের অর্থ ছিল' 'স্বাদুযুক্ত' পানীয়; পরে দাঁড়াইয়াছে 'রক্ত'।

জাতিবাচক তুর্ক হইতে আগত "তুরুক" শব্দের বর্তমান অর্থ "অশ্বারোহী সৈনিক"। ইংরেজী guard হইতে আগত বাংলায় গারদ শব্দের ও অর্থ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

"কিশোর" শব্দের আসল অর্থ "অশ্বশাবক"। এখন শব্দটি মনুষ্যজাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। "ঝী" শব্দের আসল অর্থ "কন্যা"। এখন ঝী শব্দের অর্থ হইয়াছে দাসী! "পরিবার" শব্দের অর্থ "পরিজন"। এখন "পত্নী" অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য শব্দের অপপ্রয়োগ, অর্থবিস্তার অথবা সঙ্কোচ যে কোন জীবিত ভাষাতেই অল্পবিস্তর দেখা যায়।

শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারাকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়।

(১) অর্থবিস্তার (Expansion of meaning)

(২) অর্থ সঙ্কোচ (Contraction of meaning)

(৩) অর্থ সংশ্লেষ (Transference of meaning)

(৪) অর্থের উন্নতি (Elevation of meaning)

(৫) অর্থের অবনতি (Deterioration of meaning)

(১) কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ধর্ম ও গুণ যখন সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করে, তখন শব্দের অর্থের প্রসার বাড়িয়া যায়। শরৎকালের আসল অর্থ "শীতকাল"। প্রাচীনকালে শীতকালকেই মুখ্য কালরূপে গণনা করা হইত। এইহেতু শরৎকাল হইতে বর্ষ গণনা শুরু হইত। সংস্কৃতে পাই—"পশ্যেম শরদশতং, জীবেম শরদ শতং, শৃণুয়াম শরদশতম্"। বৎসর অর্থে বর্ষ শব্দের মূল অর্থ হইতেছে "বর্ষাকাল"। ঋতু সমূহের মধ্যে "বর্ষা" অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋতু। এখানে ও অর্থের প্রসার দেখিতে পাই। ধন্য শব্দের মূল অর্থ "ধনী"; কিন্তু অর্থ সম্প্রসারিত হইয়া এখন অর্থ দাঁড়াইয়াছে "ভাগ্যবান"। গুণ শব্দের মৌলিক অর্থ "গোসম্বন্ধীয়"—অর্থপ্রসারে "দড়ি" (যেমন-গুণটানা)। অরি শব্দের মূল অর্থ "অদাতা", অর্থবিস্তারে "শত্রু"। গবেষণা শব্দের আসল অর্থ 'গোরুর অন্বেষণ'। এখন শব্দটির অর্থ দাঁড়াইয়াছে শুধু 'অন্বেষণ'। সংস্কৃত যবাগূ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'যবের মণ্ড'। তাহা হইতে আগত বাংলা 'জাউ' শব্দের অর্থ 'পানীয় মণ্ড'। সংস্কৃত 'জতুগৃহ' হইতে আগত জহর (জতুগৃহ>জৌহর>জহর) শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, 'নিজের সম্মান বাঁচাইবার জন্য মৃত্যুবরণ'। তৈল শব্দের মূল অর্থ 'তিলের নির্যাস।' পরবর্তীকালে অর্থ সম্প্রসারিত হইয়া নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল প্রভৃতি যে কোন তৈলকে বুঝায়।

গঙ্গা হইতে আগত বাংলায় "গাঙ্" শব্দের অর্থ যে কোন নদী। হিন্দু শব্দের উৎপত্তি সিন্দুনদ হইতে। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে "শান্তশিষ্ট"। বৈদিকে বহ্নি শব্দের অর্থ "বাহক", পরে অর্থ হইয়াছে 'অগ্নি'।

পূর্বে 'কালী' অর্থে কাল কালীকে বুঝাইত (রং কাল বলিয়া)। বর্তমানে, নীল কালী, লাল কালী ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগের ইংরেজীতে "bridde' শব্দের অর্থ

ছিল 'পক্ষীশাবক'। আধুনিক ইংরেজীতে "bird" শব্দের অর্থ পাখী। মধ্যযুগের ইং dogge 'বিশেষ জাতীয় কুকুর' > আধুনিক ইং dog ; লাতিন—virtus-'শৌর্য' > ফরাসী-vertu (ইং-virtue) 'সদ্গুণ'। 'ফলাহার' বলিতে কেবল ফল বোঝায় না, অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যও বোঝায়।

(২) অর্থ সঙ্কোচ—বহু শব্দেরই একাধিক অর্থ থাকে। বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী শব্দমাত্রই কিছু নূতন অর্থের ব্যঞ্জনা প্রাপ্ত হইতে পারে।

একটি শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে কালক্রমে একটি অর্থ প্রধান হইয়া উঠে ; ফলে অন্যান্য অর্থগুলি লুপ্ত হয়। এইভাবে শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। যেমন, সংস্কৃত 'মৃগ' শব্দের অর্থ 'যে কোন পশু' ; পরে অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'হরিণ'। 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'যে কোন খাদ্য' ; বাংলায় 'ভাত' বোঝায়। 'স্ত্রী' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'যে কোন স্ত্রীলোক'। ক্রমশ অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া স্ত্রী শব্দের অর্থ হইল পত্নী। প্রদীপ শব্দের আসল অর্থ 'সাধারণ দীপ'—বর্তমানে অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'কোন বিশেষ পাত্রে তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত দীপ'। মনুষ্য শব্দ হইতে রূপান্তরিত 'মুনিস' শব্দের অর্থ 'দিন মজুর'। 'আজ কাগজ পড়া হয় নাই'—এখানে কাগজ শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়াছে। 'এইমাত্র তার পাইয়াছি'—এখানে তার শব্দের অর্থও সঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রাচীন ইংরেজীতে "mete' শব্দের অর্থ ছিল 'খাদ্য'। বর্তমানে "meat" শব্দের অর্থ হইয়াছে 'মাংস'। তদ্রূপ "deer" শব্দের অর্থ ছিল 'পশু'। বর্তমানে "deer" শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'হরিণ'। বাউল (বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি <পাগল) ; সৈন্ধব লবণ>(সিন্ধুদেশ-উৎপন্ন বস্তু)। প্রাচীন ইংরেজীতে "sin" শব্দের অর্থ ছিল যে-কোন পাপ। আধুনিক ইংরেজীতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নীতি বিগর্হিত কার্য।

অর্থ সংশ্লেষ—

অনেক সময় দেখা যায় যে শব্দের গৌণ অর্থই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। আসল অর্থের সঙ্গে ইহার সংযোগ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এই ভাবেই শব্দের নূতন অর্থ হয়। মূলত ইহা সঙ্কোচ বা প্রসারের ফল।

সংস্কৃত ঘর্ম শব্দের অর্থ 'গরম'—বাংলায় অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'স্বেদ'। পাত্র শব্দের আসল অর্থ 'আধার' ; পরে অর্থ প্রসারিত হইয়া দাঁড়াইল 'যে কোন আধার'। পরবর্তী-কালে অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল কন্যাসম্প্রদায়ের আধার অর্থাৎ 'বর'। 'সহসা' শব্দের মৌলিক অর্থ 'সবলে'। পরে অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'আকস্মিকভাবে'। হঠাৎ শব্দের অর্থ ও এইভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। 'প্রসাদ' শব্দের মূল অর্থ 'অনুগ্রহ'। এখন 'ভুক্ত-খাদ্যের অবশিষ্ট বোঝায়। 'সন্দেশ' শব্দের আসল অর্থ 'তত্ত্ব'। এখন ছানা ও চিনি

সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য বোঝায়। এইরূপে সহজ, সংবাদ, বিজ্ঞান, অবকাশ, প্রবন্ধ প্রভৃতি শব্দগুলি মূল অর্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

(৪) **অর্থের উন্নতি**—শব্দের সাধারণ অর্থ পরিবর্তিত হইয়া উচ্চ ভাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, মন্দির শব্দের মূল অর্থ 'গৃহ'। এখন 'দেব মন্দির' বোঝায়। 'সম্ভ্রম' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ভয় করা'। এখন অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'মান্য'। ভয়ানক শব্দের আসল অর্থ 'ভীতিপ্রদ'। এখন 'অত্যধিক' অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন ইং— Cniht-'চাকর'>Knignt 'সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধা'।

(৫) **অর্থের অবনতি**—প্রথমে অর্থ উৎকর্ষ-দ্যোতক ছিল। পরে হীনার্থে পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন—রাগ শব্দের মূল অর্থ 'আকর্ষণ'; এখন 'ক্রোধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বিরক্ত' শব্দের মূল অর্থ 'বিরাগ-যুক্ত'। বর্তমান অর্থ 'ক্রুদ্ধ'। 'ইতর' শব্দের আসল অর্থ 'অন্য'; এখন 'অসভ্য' অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'মহাজন' শব্দের আসল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া এখন দাঁড়াইয়াছে "সুদের জন্য যে টাকা ধার দেয়।" "পাষণ্ড" শব্দের মৌলিক অর্থ "ধর্মসম্প্রদায়"। পরে অর্থ পরিবর্তিত হইয়া দাঁড়াইল "ধর্মজ্ঞান হীন নিষ্ঠুর"। জাতি বাচক তুর্কী "উজবেক" হইতে বাংলায় প্রাপ্ত উজবুক শব্দের অর্থে "মূর্খ"। পিরীত <প্রীতি, নাগর শব্দ দুইটি বর্তমানে হীন অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন ইং cnafa, "বালক, চাকর">Knave। আবেস্তায় "দেব" শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"অপদেবতা"। আরবী ফাজিল শব্দের অর্থ পণ্ডিত। কিন্তু এখন 'চালাক', 'বাচাল' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনেক সময় দ্রব্য বিশেষের উৎপত্তিস্থান কিংবা উদ্ভাবকের নিজের নাম দ্রব্য নামে পরিবর্তিত হয়। যেমন, এক সংখ্যা কিংবা বৃহৎ অর্থে "রাম" শব্দ ব্যবহৃত হয়। রাম ছাগল, রাম দা প্রভৃতি আমরা ব্যবহার করি। চৈতন্যের নাম অনুসারে শিখার অপর নাম "চৈতন্য"। চীন দেশের নাম হইতে "চিনি", মিশর দেশের নাম অনুসারে "মিছরি" প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। "উদো" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে উদ্ধব হইতে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক শব্দেরই একটি ঐতিহ্য বা ইতিহাস আছে। সমাজ জীবনে এক একটি শব্দ এক একটি চিত্র কিংবা অমূর্ত ভাবের প্রতীক হিসাবে কালের বিবর্তনের ধারায় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অর্থের পরিবর্তনের ধারা হইতে প্রাচীন যুগের অনেক তথ্যের আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার স্বরধ্বনির বাংলায় বিবর্তনের ধারা

(Treatment of O I A Vowels in Bengali)

সংস্কৃতের স্বরধ্বনি (আদি, মধ্য ও অন্ত্য) বাংলায় কোথাও রক্ষিত হইয়াছে, কোথাও বা লুপ্ত হইয়াছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে।

আদি স্বরধ্বনি (Initial Vowels)

সংস্কৃতের আদিস্বরধ্বনি বাংলায় প্রায়ই রক্ষিত হইয়াছে। তবে প্রাকৃত-অপভ্রংশে ও প্রাচীন বাংলায় অনাদিস্বরে শ্বাসাঘাত পড়ার দরুণ আদিস্বর লুপ্ত হইয়াছে। যেমন, *অতিসী (=অতসী)>তিসি ; (১) উডুম্বর>ডুমর ; অরিষ্ট>অরিট্‌ঠ>রীঠা ; উদ্ধার >উধার>ধার ; উপবিশতি>উপবিসই>বইসই>বৈসে>বসে ; অলাবু>লাউ ; অহকম্ >হকং (প্রা)>হউ ; অভ্যন্তর>ভিতর ; এরণ্ডিকা>রেড়ী।

(২) শ্বাসাঘাতের দরুণ পদের আদিতে অ>আ হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, অভিমন্যু>আইহন>আয়ান ; অলক্ত> আলতা ; অশীতি>অসীই (প্রা)>আশী ; অপর>অবর>আঅর>আর ; অম্বল> আম্বল ; অতি>আতি ; অনুপম>আনুপম।

(৩) পদের আদিতে অ-কারের পর যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত হয় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন, অষ্ট>অট্‌ঠ>আঠ>আট ; অক্ষর>অক্‌খর>আখর ; অক্ষি>অক্‌খি> * অঙ্‌খি>আঁখি ; অঙ্ক>আঁক।

পদাদিস্থিত ব্যঞ্জনের সঙ্গে "অ" যুক্ত থাকিলে এইরূপ পরিবর্তন ঘটে।

যেমন, বজ্র>বজ্‌জ>বাজ ; বন্ধ্যা>বঞ্‌ঝা>বাঁঝা ; ধর্ম>ধম্ম>ধাম ; কখনো কখনো যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী অ-কার আ-কার হয় নাই। যেমন, সর্ব>সব্ব>সব (সভা শব্দের প্রভাবে) ; সপ্তদশ>সত্তরহ>সতর ; বর্ততে>বট্টই>বটে ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শব্দে আদি অ-কার কিংবা ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত অ-কার রক্ষিত হইয়াছে।

(ক) নঞর্থক অ-কার—অভাব, অনটন

(খ) দুই ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী অ-কার—কইলা<কপিল ; কনুই<কফোণি ; ধড়<*ধট <ধৃত ; ময়াল<মহাকাল ; পয়ার<পদকার ; পইতা<পবিত্র ; সহে<সহতে ; নই< নাবিক ; মরে<*মরতি ((=ম্রিয়তে) ।

আ—

(১) পদের আদিতে "আ" যদি একক ব্যঞ্জনের পূর্বে থাকে, তবে তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন, তাপ>তাঅ>তা ; ঘাত>ঘাঅ>ঘা ।

(২) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না পড়ার দরুণ পদাদিস্থিতি "আ" অনেক সময় হ্রস্ব হইয়াছে। যেমন, বনারসী<বারাণসী ; পগার<প্রাকার ; অবণাগমন<আগমনগমন ।

(৩) আ-কারের পর যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকিলে প্রাকৃতে আ>অ হইয়াছে। পরে বাংলায় যুক্ত সমধ্বনির একটি লুপ্ত হওয়ায় পূর্ববর্তী "অ" আবার "আ" হইয়াছে। যেমন— কার্য>কজ্জ>কাজ ; আর্দ্রক>অদ্দঅ>আদা ; আম্র>অম্ব>আম ; ভাণ্ড>ভণ্ড> ভাঁড় ; সার্থ>সত্থ>সাথ ; বাদ্যতে>বজ্জই>বাজে ; মার্গয়তি>মগ্‌গেই>মাগে ;

(৪) আ-কারের পর "ই" থাকিলে সন্ধি হইয়া "এ" হয়। যেমন—খাইল>খেল ; আইল>এল (চলিত ভাষায়)।

ই-ঈ

(১) পদাদিস্থিত ই-কারের পর একক ব্যঞ্জন বা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকিলে ই (ঈ) র কোন রূপান্তর হয় না। যেমন, শিখর>শিয়র ; পিষ্টক>পিঠা ; ইষ্টক>ইট , নিষ্ঠুর> নিঠুর ; সীমন্তিকা>সীঁতি ; গ্রীবা>গিম (ম-বা) ; তৃষা+পিপাসা>তিয়াস ; দীপশলাকা>দিয়াশলাই ।

(২) সংস্কৃত ঋ-কার প্রাকৃতে অ, ই, উ রূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রাকৃতের এই পরিবর্তনের ধারা বাংলায় রক্ষিত আছে।

যেমন, শৃগাল>সিআল>শিয়াল ; পৃচ্ছতি>পুচ্ছই>পুছে ; নৃত্য>নচ্চ>নাচ ।

(৩) স্বরসঙ্গতির ফলে পদাদিস্থিত ই (ঈ) এ-কারে পরিণত হইয়াছে। যেমন, মিঠাই >মেঠাই ; বিড়াল>বেড়াল ; মিশে>মেশে ; শিয়াল>শেয়াল ; দীপশলাকা>দেশলাই ; তিন্তড়ী>তেঁতুল ; বিল্ব>বেল ।

উ-ঊ

(১) পদাদিস্থিত উ-কারের পর একক বা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে উ-কার রক্ষিত হয়।

যেমন, উপবাস>উপাস ; কুম্ভীর>কুমীর ; ক্ষুদ্র>খুদ ; যূথিকা>যূঁই ; শূকর> শূয়র ; সূত্রধার>ছুতার ; উপকারিকা>উয়ারী ; পূতিকা>পুঁই ; স্ফুটতি>ফুড়ে ; ধ্রুব>ধুআ ; বুভুক্ষা>ভুখ ।

উ-কার কখনো কখনো ও-কার হয়।

যেমন, গুম্ফ>গোঁফ ; গুচ্ছ>গোছা।

এ—

(১) পদাদিস্থিত এ-কারের পর একক ব্যঞ্জন বা যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকিলে এ-কার অপরিবর্তিত থাকে।

যেমন, একাদশ>এগার ; দেব>দেয়া ; ক্ষেত্র>খেত ; কেদারিকা>কেয়ারী ; চেটিকা>চেড়ী ; ক্ষেপ>খেয়া।

(২) এ-কার কখনো কখনো অ্যা' হয়।

যেমন, এক>এক্ক>এ্যা'ক্ ; বেত্র>ব্যা'ত।

ও—

পদাদিস্থিত ও-কারের পর ব্যঞ্জনধ্বনি থাকিলে ও-কার রক্ষিত হয়।

যেমন, গোপাল>গোয়াল ; গোষ্ঠ>গোঠ ; ষোড়শ>ষোল ; কোষ্ঠপাল>কোট্টপাল >কোটাল ; খোল্ল (প্রা)>খোল ; খোম্পা>খোঁপা ; যোত্র>যোত ; অববেষ্টন> ওড্ঢন>ওড়না।

ঐ, ঔ—পদের আদিতে অবস্থিত ঐ, ঔ বাংলায় যথাক্রমে এ, ও হয়।

যেমন, বৈবাহিক>বেহাই ; তৈল>তেল্ল>তেল ; ঔষধ>ওষুধ ; সৌভাগ্য> সোহাগ ; ধৌত>ধোয়া ; গৌর>গোরা।

মধ্যস্বরধ্বনি (Medial Vowels)

বাংলায় পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনিগুলিকে প্রাকৃতের যুগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনি (Vowels not in Contact)

(২) সন্নিকৃষ্ট বা উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনি অথবা স্বরধ্বনি সংযোগ (Vowels in Contact)

দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রাকৃত লুপ্ত হওয়ার ফলে দুই সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল।

ব্যঞ্জন ব্যবহিত স্বরধ্বনিলোপের দৃষ্টান্ত

১। পদাদিস্থিত ও পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে থাকিলে বাংলায় দীর্ঘ হয় ঃ

যেমন, অষ্ট>অট্‌ঠ>আঠ>আট; চন্দ্র>চন্দ>চান্দ>চাঁদ ; বন্ধ্যা>বঞ্‌ঝা>বাঁঝা ইত্যাদি।

কথনো কথনো অ>আ >হয় নাই—বর্ততে>বট্টই>বটে ; কিন্তু বর্ত্ম>বাট ; সর্ব>সব্ব>সব (সভাশব্দের প্রভাবে) ; সপ্তদশ>সত্তরহ>সতর।

২। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না পড়ার দরুণ পদাদিস্থিত স্বরধ্বনি বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে। যথা—অভ্যন্তর>ভিতর ; উদ্ধার>ধার ; অরিষ্ট>অরিট্‌ঠ>রীঠা ; উপবিশতি >উপবিসই>বইসই>বসে।

৩। সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে।

যেমন, হস্ত>হাত ; ভক্ত>ভাত ; শ্বশ্রূ>সস্‌সু>শাশ ; ভিক্ষা>ভিখ ; শ্রদ্ধা> সদ্‌ধা>সাধ ; অক্ষি>অক্‌খি>আঁখ ; তন্ত্রী>তাঁত ; ফল্গু>ফাউগ>ফাগ।

আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত হেতু প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে।

স্বরধ্বনি লোপের দৃষ্টান্ত :—

(১) **অ**—অবেষ্টন>ওড়না ; অর্গলয়তি>আগলায় ; উনবিংশতি>উনিশ ; কদম্ব >কদমা ; শিরস্‌+স্থান>শিরথান>শিথান ; *সঙ্কটিকা>সকড়ী ; ভৃঙ্গরোল>*ভিঙ্গরুল >ভিমরুল ; নখহরণিকা>*নহ-হরণিঅ>নরুণী>নরুণ; পণ্য-শালিকা>পসারী ; চিত্রফল>চিত্তহল>চিতল, চিথল ; গর্দভ>গদ্দহ>গাধা ; দীপবৃক্ষ>দীঅরুক্‌খ>দেরখো ; বর্দল>বাদলা ; বর্ধন>বধনা ; গ্রীষ্ম>গুমসা ; সীমন্ত>*সিওঁন্ত>সিঁথা ; এতদ্দিন> অ্যাদ্দিন ; কর্তব্য>করিঅব্ব>করিব ; সুপ্ত+ইল>সুত+ইল>সুতিল।

(২) **আ**—অঙ্গার>আঙ্গরা ; অক্ষবাট>আখড়া ; উৎপাতয়তি>উপড়ায় ; উৎ-খাতয়তি>উখাড়ে ; কুষ্মাণ্ড>কুমড়া ; গোপাল>গোয়াল>গয়লা।

(৩) **ই, ঈ**—পিপীলিকা>পিঁপড়া; খনিত্র>খন্তা ; প্রতিবেশিন্‌>পড়শী ; প্রেতিনী >পেত্‌নী ; বিভীতক>বয়ড়া ; পরীক্ষা>পরখ ; গৃহিণী>ঘরণী ; কুট্টিনী>কুট্‌নী ; বড়িশ>বড়শী ; বিপিন>বিপ্‌নে ; ফটিক>ফট্‌কে।

(৪) **উ-ঊ**—অঙ্গুষ্ঠ>আঙ্‌টি ; লঘুক>হালকা ; বিজুলী (<বিদ্যুৎ)>বিজলী ; অঙ্কুশিকা>আঁকশী।

(৫) **এ**—প্রতিবেশিন্‌>পড়বেষী (প্র-বা)>পড়শী ; বহেটক>বহেডঅ>বহড়া (ম-বা)>বয়ড়া ; কারবেল্ল>করবেল্ল (প্রা)>করেলা>করলা ; পরিবেশয়তি>*পরবেশই >*পরিশে>পরশে।

যদি পদান্তস্থিত স্বরধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে পদমধ্যস্থিত স্বরধ্বনি লুপ্ত হয় না।

অ—বন্ধন>বাঁধন ; অঞ্চল>আঁচল ; পঞ্জর>পাঁজর।

আ—শৃগাল>শিয়াল ; শ্মশান>মশান।

ই-ঈ—দক্ষিণ>দখিন্ ; কুম্ভীর>কুমীর ; প্রাচীর>পাঁচীল।

উ-ঊ—নিষ্ঠুর>নিঠুর ; খর্জ্জুর>খেজুর ; সিন্দূর>সিঁদুর।

এ-ও—রমেশ>রমেশ্ ; কল্লোল>কল্লোল্।

(২) সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি

প্রাকৃত স্তরে পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে একাধিক উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করিত।

বাংলায় এইরূপ সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির রূপান্তরের ধারা নিয়ে দেওয়া হইল—

(ক) সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি মিলিত হইয়া যৌগিকস্বরে অথবা সন্ধিবদ্ধ একস্বরে পরিণত হইয়াছে। অ+ই>ঐ ; অ+উ>ঔ।

যেমন, সখী>সহী (প্রা)>সই>সৈ ; বধূ>বহু>বউ>বৌ ; প্রতিষ্ঠা>পইট্‌ঠা> পইঠা>পৈঠা ; মুকুট>মউড (প্রা)>মউড়>মৌড়।

অনেক সময় ঐ দ্বিস্বর পদান্ত না হইলে শেষাংশ ত্যাগ করিয়া অ+ই=অ এবং অ+উ=ও হয়। উপবিশতি>বইসই>বৈসে>বসে ; মুকুল>মউল (প্রা)>বউল> বৌল>বোল ; শকুল>সউল (প্রা)>শৌল>শোল ; বহিত্রক*>বহিট্‌ঠঅ>বৈঠা> বোঠে।

(খ) অ+অ=আ—কদলক>কঅলঅ (প্রা)>কলা ; কপর্দক>কবডডঅ>কড়া।

(গ) অ+আ=আ—রক্ষাপাল>রক্‌খআল>রক্‌খবাল>রাখআল (ম-বা)>রাখাল ; উপকারিকা>উবআরিআ>উয়ারী।

(ঘ) অ+ই=এ>ই—গত+ইল>*গঅইল্ল>গইল>গেল ; অস্মাভিঃ>অম্‌হাহি >অম্‌হই>অম্‌হে>আমি

অ+উ=ও>উ—চলতু>চলউ>চলু ; রাজপুত্র>রাঅউত্ত>রাউত।

(ঙ) আ+ই—প্রাচীন ও আদি-মধ্য বাংলায় রক্ষিত আছে। পরে চলিত ভাষায় পদান্তস্থিত না হইলে এ-কার হইয়াছে অথবা ই-কার হইয়া লুপ্ত হইয়াছে।

আয়াত+ইল>আইঅ-ইল (প্রা)>আইল>এল ; আমিষ>আবিঁস>আঁইষ>আঁষ (ই-কার হইয়া লুপ্ত)

(চ) আ+উ>এ—আকুলক>আউল>আউলা>আইলা>এলো।

পদান্তস্থিত আই, আউ রহিয়া গিয়াছে। যেমন, অলাবু>লাউ ; গাবী> গাই।

(ছ) ই, ঈ+অ=ঈ (কখনো ই)—জামাতৃক>জামাইঅ>জামাই ; চলিত> চলিঅ>চলী>চলি ; পীতল>পীঅল>পীলা।

(জ) ই+অ>এ—দ্ব্যর্দ্ধ>দিঅড্‌ঢ>দেড়।

(ঝ) উ, উ+অ=উ

গোরূপ>গোরূব (প্রা)>গোরু ; সুগন্ধিক>সুঅন্ধিঅ>সুন্ধি>সুঁদি।

(ঞ) উ, ঊ+ই, ঈ>উই>উ

পূতিকা>পুইআ (প্রা)>পুঁই ; ভূতি>হুই (পদবী)

(ট) উ, ঊ+উ, ঊ>উ

দ্বিগুণক>দুউণঅ>দুনা

(ঠ) এ+অ>এ

দেবকুল>দেবউল>দেঅউল>দেউল ; *নেকুল (=নকুল)>নেউল ; *নেপুর(= নূপুর)>নেউর ; সং দয়থ>দেথ>দেহ>দেঅ>দে।

(ড) ও+অ>ও

সং *গোমন্ত্>গোম (প্রা)>গোবঁ>গোঁ (পদবী) ; যোগ>জোঅ>জো ; রোমন্>রোম>রোবঁ>রোঁ।

(ঢ) ও+ই=ওই>উই

গোমিন্>গোমি>গোবি>গুঁই (পদবী) ; অথবা, গোমিক>গোমিঅ>গুঁই।

(ণ) ও+উ=ও

গোমন্ত্>গোম>গোবঁ>গোঁ (পদবী) ; গোধূম>গোহুম (প্রা)>গোউম> গোম>গম।

(ত) প্রাকৃত স্তরে পদমধ্যস্থিত একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ার ফলে উদ্বৃত্তস্বর পাশাপাশি অবস্থান করিত। আধুনিক বাংলায় য়-শ্রুতি বা ব-শ্রুতি আসিয়া সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনিকে বিপ্রকৃষ্ট করিয়া দিয়াছে।

যেমন, কেতক>কেঅঅ>কেয়া ; হৃদয়>হিঅঅ>হিয়া ; মোদক>মোঅঅ> মোয়া ; শিখর>শিহর>শিয়র।

অন্ত্য স্বরধ্বনি

বৈদিক ভাষায় যে সব অন্ত্যস্বরধ্বনি দীর্ঘ ছিল, অপভ্রংশের যুগে তাহা হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত আ, ঈ, উ অপভ্রংশে যথাক্রমে, অ, ই, উ-তে পরিণত হইয়াছিল। পদান্তস্থিত এ>ই, ও>উ হইয়াছিল। বাংলার প্রাচীন স্তর পর্যন্ত পদান্ত অ, ই, উ রক্ষিত ছিল। মধ্যযুগে এই স্বরধ্বনিগুলির অধিকাংশই লুপ্ত হয়।

অ-কার—বৈদিক অ>অ (প্রা)>অ (প্রা-বা)>লুপ্ত (আ-বা)

অষ্ট>অট্ঠ>আঠ>আট্ ; হস্ত>হথ>হাথ>হাত্ ;

চন্দ্র>চন্দ>চান্দ>চাঁদ্ ; কর্ম>কম্ম>কাম>কাম্।

পূর্বস্বরের সহিত সমীভবনের ফলে অন্ত্য অ-কারের লোপ হওয়ার দৃষ্টান্ত ও পাওয়া যায়। যেমন, করথ>করহ>করঅ>কর>কর্ ; পাদ>পাঅ>পা।

আ-কার—বৈদিক আ>আ (প্রা)>অ (অপ, প্রা-বা)>লুপ্ত (আ-বা)

সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ>সাঁঝ্ ; সংজ্ঞা>সণ্ণা>সাণ>সান্ ; শ্রদ্ধা>সদ্ধা >সাধ>সাধ্ ; ভিক্ষা>ভিক্খা>ভিখ>ভিখ।

ই-কার—বৈদিক ই>ই (প্রা)>ই(প্রা-বা)>লুপ্ত (আ-বা)

অক্ষি>অক্খি>আঁখি>আঁখ।

অপিনিহিত ই-কার পূর্বে আসিয়া শেষে লুপ্ত হইয়াছিল। যেমন, রাত্রি রাত্তি>রাইত>রাত্। ষষ্ঠি>ষট্ঠি>ষাঠি>ষাট্।

ঈ-কার—বৈদিক ঈ>ঈ (প্রা)>ই (প্রা-বা)>লুপ্ত (আ-বা)—সপত্নী>সবত্তী>সতি >সৎ ; তন্ত্রী>তন্তী>তাঁতি>তাঁত্।

উ-ঊ—বৈদিক উ, ঊ আধুনিক বাংলায় লুপ্ত।

ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী উ-কার অপিনিহিতের ফলে লুপ্ত হইয়াছিল।

যেমন, ইক্ষু>ইক্খু>আউখ>আখ্ ; ফল্গু>ফগ্গু>ফাউগ>ফাগ ; দদ্রু>দদ্দু >দাউদ>দাদ্ ; তন্তু>তাঁত

বহু তদ্ভব শব্দ রহিয়াছে যেখানে অন্ত্যস্বরধ্বনি উচ্চারিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে ঐ অন্ত্যস্বর সম্ভবত দুই স্বরধ্বনির সহযোগে গঠিত এবং প্রাকৃত যুগে শব্দগুলি দ্বিস্বরযুক্ত ছিল। বৈদিক কাল (black) শব্দ আধুনিক বাংলায় "কাল" রূপেই উচ্চারিত হয়। যেমন, কাল জাম।

আধুনিক বাংলায় তৎ-সম ও অর্ধ-তৎসম শব্দের অন্ত্য অ-কার সাধারণত উচ্চারিত হয় না। [দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ৯৯-১০১]

ষোড়শ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির বাংলায় রূপান্তরের ধারা

প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্তী একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব লুপ্ত হইয়াছিল। সংস্কৃতের যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি প্রাকৃতে সমীভূত যুগ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাংলার যুগ হইতেই এই যুগ্মধ্বনি একক ব্যঞ্জনে পরিণত হইয়াছিল। নিম্নে বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপত্তি বর্ণিত হইল :—

ক্—

তদ্ভব ও দেশী শব্দে "ক্" প্রাকৃতের "ক", 'ক্ক'হইতে আসিয়াছে।

(১) পদের আদিতে "ক" সংস্কৃত ক, ক্র, ক্ব, স্ক হইতে আসিয়াছে।

যেমন, কলা<কদলক ; কান<কর্ণ ; কাছ<কচ্ছ<কক্ষ ; কয়<কথয়তি ; করে< করই<করোদি<করোতি ; কিনে<কিণই<ক্রীণাতি ; কাই<ক্বাথ ; কাঁধ<কন্ধ<স্কন্ধ ; কড়খা (ম-বা)<কটাক্ষ।

(২) পদমধ্যস্থিত অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত "ক্" প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু "ক" হইয়াছে।

যেমন, শাকর<সক্করা (প্রা)<শর্করা ; পাকা<পক্ব ; কাঁকর<কঙ্কর<কর্কর ; সাঁকো<সঙ্কম (প্রা)<সংক্রম ; চিকন<চিক্কণ ; উকুন<উৎকুণ ; চৌকা<চউক্ক (প্রা) <চতুষ্ক ; শুকি, সিকি<সুক্কিআ<শুক্লিকা ; মাকড়<মক্কড়<মর্কট ; ঢাকে<ঢক্কই< স্থাগতি ? শিকনী<শিঙ্ঘানিকা ; সেকরা<সেক্ক-আর ; আঁকড়া<অঙ্কবাট।

কতকগুলি দেশী শব্দেও "ক" পাওয়া যায়। যেমন, হাঁক<হক্ক্ ; ঝক ; বক ; ডাক।

কতকগুলি বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদে "ক" প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

যেমন, মোড়ক, চটক, চমক, বৈঠক আটক, হালকা, ছোটকা, মচকায়, হেঁচকায় ইত্যাদি।

খ্—

(১) পদের আদিতে "খ" সংস্কৃত "খ, ক্ষ" হইতে আসিয়াছে। যেমন, খাঁড়া< খড্ড<খড়্গ অথবা খাঁড়া<খণ্ড (প্রা)<খণ্ড ; খাই<খাত ; খন্তা<খনিত্র ; খাট<খট্টা ; খাজা<খাদ্য ; খায়<খাই (প্রা-বা)<খাঅই (প্রা)<খাদতি ; খেয়া< ক্ষেপ ; খুড়া< * ক্ষুদ্র-তাত ; খুদ<ক্ষুদ্র ; খণ<ক্ষণ।

(২) পদের আদিতে ষ-কার, স-কার ও র-কার যুক্ত "ক" প্রাকৃতে "খ" হইয়াছিল। বাংলায় এই "খ" রক্ষিত আছে।

যেমন, খামার<খম্ভাআর<স্কম্ভাগার ; খুদ<খুদ্দ<ক্ষুদ্র ; খেলে<খেলই (প্রা)< ক্রীড়তি ; খান<খণ্ড+স্থান ; আখড়া<অক্ষবাট।

(৩) "খ" সংস্কৃত ক হইতে আসিয়াছে।

যেমন, খিল<কীল ; খরতাল>করতাল ; খুঁচি<কুঞ্চিকা ; খিচুড়ী< * কৃসরিকা ; খোল<কহোল।

শব্দের আদিতে "খ" কতকগুলি দেশী শব্দেও পাওয়া যায়।

যেমন, খিড়কী<খডক্কী ; খড়, খাঁখার।

(৪) পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত "ক" প্রাকৃতে ক্খ হইয়া বাংলায় শুধু "ক" হইয়াছে।

যেমন, শুখা<সুক্খ<শুষ্ক ; দুখ<দুক্খ<দুঃখ ; রাখে<রক্খই<রক্ষতি ; শাঁখ< সংখ<শঙ্খ ; মাখে<ম্রক্ষতি ; চাখে<চক্খই<চক্ষতি ; আখড়া<অক্ষবাট ; উখলী< উদূখল ; পাখালে<প্রক্ষালয়তি।

গ্—

১। পদের আদিতে অবস্থিত "গ্" বজায় আছে।

যেমন, গাল<গল্ল (প্রা)<গণ্ড ; গোরু<গোরূপ ; গায়<গাহেই (প্রা)< গাথয়তি ; গাঁথে<গন্থেই (প্রা)<গ্রন্থয়তি ; গাঁই, গেঁয়ো<গামিঅ (প্রা)<গ্রামিক ; গোলা<গোলক ; গুমট< *গিমট (=গ্রীষ্ম) ; গোঁআর<গ্রামাগার।

২। পদমধ্যস্থিত ও অন্ত্যব্যঞ্জনযুক্ত "গ্" প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু "গ্" হইয়াছে।

যেমন, বাগ<বগ্গা (প্রা)<বল্গা ; মাগে, মাঙ্গে<মগ্গেই, মঙ্গেই (প্রা)< মার্গয়তি ; আগ, আগি<অগ্গিঅ (প্রা)*<অগ্নিকা ; মুগ<মুগ্গ<মুদ্গ ; ভাগ<ভগ্ন ; মুগুর<মুদ্গর ; মাগুর<মদ্গুর ; বিগড়া, বেয়াড়া<বিকট ; পগার<প্রাকার ; লগ্ঘী< লঘ্বী।

ঘ্—

পদের আদিতে অবস্থিত "ঘ" বজায় আছে।

ঘা<ঘাঅ (প্রা)<ঘাত ; ঘাম<ঘম্ম (প্রা)<ঘর্ম ; ঘি, ঘী<ঘিঅ<ঘৃত ; ঘাট, ঘুঁট<ঘৃষ্ট ; ঘ্রাণ<ঘ্রাণিকা ; ঘোষাল<ঘোষপাল।

২। পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত "ঘ" সমীকরণের ফলে পরিবর্তিত হইয়া বাংলায় একক ব্যঞ্জনে পরিবর্তিত হইয়াছে।

বাঘ<বগ্‌ঘ<ব্যাঘ্র ; দীঘ<দিগ্‌ঘ<দীর্ঘ ;

৩। পদাদিস্থিত ও পদমধ্যবর্তী "গ" পরবর্তী হ-কারের স্থান পরিবর্তনের ফলে কখনো কখনো "ঘ" হইয়াছে।

ঘর<*গরহ<গৃহ ; ঘড়া<ঘডঅ<ঘটঅ (প্রা)<ঘটক<গ্রথক ; ঘুটে<*গুইঠা <গোইঠা<গোইট্‌ঠা<গোবিষ্ঠা।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি দেশী পর্যায়ে পড়েঃ—

ঘুঙুর, ঘুমসী, ঘুগনী, ঘোমটা, ঘুন্টী ; ঘুড়ী (হিন্দী-গুড্‌ডী) ঘাবড়ান, ঘুচা ইত্যাদি।

চ্—

১। পদাদিস্থিত ও পদমধ্যস্থিত একক "চ" রক্ষিত আছে।

যেমন, চলে<চলই (প্রা)<চলতি ; চাঁদ<চান্দ<চন্দ<চন্দ্র ; চিন, চিনা<চিণ্‌হ <চিহ্ন ; চূণ<চুন্ন (প্রা)<চূর্ণ ; পাঁচিল<প্রাচীর ; পেঁচা<পেচঅ<পেচক ; চিয়ে< চেতয়তি ; চিকণ<চিক্কণ ; নেউচা, নিচা<নেবচ্ছ<নেপথ্য।

২। পদমধ্যস্থিত অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত "চ" প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু "চ" হইয়াছে।

যেমন, উচ, উঁচা<*উঞ্চ<উচ্চ ; সাঁচা<*সঞ্চ<সচ্চ<সত্য ; কোঁচ<কোঞ্চ (প্রা) <ক্রৌঞ্চ ; সিঁচে<সিঞ্চে<সিঞ্চই<সিঞ্চতি ; ছাঁচ<সঞ্চ।

৩। "ক" ব্যঞ্জনধ্বনির তালব্য উচ্চারণের ফলে "চ" হয়।

চিরাতা<চিরায়িত (প্রা-বা)<চিলাইত্ত<কিরাত+তিক্ত।

ছ্—

১। শব্দের আদিতে অবস্থিত "ছ" বাংলায় বজায় আছে।

ছই<ছই (প্রা)<ছদিস্ ; ছাতা<ছত্ত<ছত্র ; ছাঁদ<ছন্দ (প্রা)<ছন্দস্ ; ছানা<ছন্ন (প্রা)<ছন্ন (সং) ; ছেনী<ছেদনিআ (প্রা)<ছেদনিকা ; ছিনাল< ছিন্ন+আল ; ছিঁড়ে<ছিণ্ডতি।

২। পদের আদিতে অবস্থিত শ, স কখনো কখনো "ছ" হইয়াছে। যেমন, ছাতু <সত্তুঅ (প্রা)<শক্তুক ; ছা<সাবঅ (প্রা)<শাবক ; ছুঁচ<সূচি ; ছুতার<সূত্রধার ; ছুট<সূত্র ; ছাতিম<সপ্তপর্ণ।

৩। পদের আদিতে অথবা মধ্যে অবস্থিত "ক্ষ" "ছ" বা "খ" হইয়াছে। কাছ, কাঁখ<কচ্ছ, কক্‌খ<কক্ষ ; ছার, খার<ছার, খার (প্রা)<ক্ষার ; ছুঁত, খুঁত<ছুব (প্রা-বা)<ছুন্ধ, * খুন্ধ<ক্ষুন্ধ ; ছুরি, খুরি<ছুরিআ, খুরিআ<ক্ষুরিকা ; ছিপ<ক্ষিপ্র ; ছেপ<ক্ষেপ ;

৪। প্রাকৃত "চ্ছ" হইতে বাংলায় "ছ" হইয়াছে।

যেমন, আছে<অচ্ছই<* অচ্ছতি<* এস্কোতি (ইন্দো-ইউরোপীয়) ; পুছে< পুচ্ছই<পৃচ্ছতি<*পৃস্কোতি ; পিছল<পিচ্ছল ; গাছ<গচ্ছ।

৫। পদমধ্যবর্তী সংস্কৃত যুক্তব্যঞ্জন হইতে সমীভূত প্রাকৃতের চ্ছ বাংলায় শুধু 'ছ' হইয়াছে।

নাছ<রচ্ছা (প্রা)<রথ্যা ; মাছ<মচ্ছ<মৎস্য ; কিছু<কিঞ্চ ; পাছ<পচ্ছা (প্রা)<পশ্চা, পশ্চাৎ ; বাছা<বচ্ছ<বৎস্য ; বাছুর<বচ্ছরূঅ<বৎস্যরূপ ; উছাস (ম-বা)<উচ্ছ্বাস<উৎ-শ্বাস ; কাছিম<কচ্ছপ<কশ্যপ ; মোছ<মৃহচ্ছু<শ্মশ্রু।

জ্‌—

১। পদাদিস্থিত একক 'জ' কিংবা ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত 'জ' বাংলায় শুধু 'জ' হইয়াছে। জোহার<জঅহার (প্রা)<জয়হার ; জাগে<জগ্‌গই (প্রা)<*জাগ্রতি (=জাগৃতি) ; জলে<জলই (প্রা)<জ্বলতি ; জিব, জিভ<জিব্‌ভা<জিহ্বা ; জুআ, জুয়া<দ্যূত ; জেঠাই<জেট্‌ঠাইঅ (প্রা)<*জ্যেষ্ঠতাতিকা ;

২। পদাদিস্থিত 'য' বাংলায় 'জ' হইয়াছে।

জুত্‌<জন্ত (প্রা)<যন্ত্র ; জাঁতা<জন্ত<যন্ত্র ; যায়<জাই (প্রা)<যাতি ; জো<যোগ ; জুঝে<যুধ্যতি।

৩। পদমধ্যস্থিত একক 'জ' কিংবা যুক্তব্যঞ্জন হইত প্রাকৃতে আগত জ্‌জ বাংলায় শুধু 'জ' হইয়াছে। যথা—গাজন<গজ্জন<গর্জন ; উপজে<উপ্‌পজ্জই<উৎপদ্যতে ; সজারু <*সজ্জঅরূঅ<শল্যকরূপ ; আজবুঝা<*অজ্জবুঝ্‌জ<*ঋজুবুধ্য ; পাঁজর<পঞ্জর ; উজায় >উদ্‌বাতি ; ছিজই (প্রা-বা) ছিদ্যতে ; বেজ (ম-বা)<বৈদ্য ; দুঅজ<*দুইজ্জ<দ্বিত্য (=দ্বিতীয়)। তিঅজ্জ<*তিইজ্জ<ত্রিত্য (=তৃতীয়) ; সেঁজুতি<সন্ধ্যাবর্তি। ভেজায় <অভ্যজ্যতে।

ঝ্‌—

১ ; পদাদিস্থিত "ঝ" সংস্কৃত জ, ঝ, অথবা ধ হইতে আসিয়াছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে বাংলায় "ঝ" প্রাকৃত ঝ অথবা ধ্য হইতে আসিয়াছে।

যেমন, ঝুন, ঝুনা<জুন্ন (প্রা)<জূর্ণ ; ঝুট, ঝুঠা *ঝুট্‌ঠ<জুট্‌ঠ<জুষ্ঠ ; ঝরে<ঝরই ক্ষরতি ; ঝামা<ঝাম (প্রা)<ক্ষাম ; ঝি, ঝী<ঝিঅ<ধিআ<ধিতা<দুহিতা।

২। তদ্ভব শব্দে পদমধ্যস্থিত "ঝ" সংস্কৃত "ধ্য" হইতে আসিয়াছে।

যেমন, মাঝ<মধ্য ; সাঁঝ<সঞ্‌ঝা<সন্ধ্যা · ওঝা<উঅজ্‌ঝাঅ<উপাধ্যায় ; বুঝে<বুধ্যতি ; বাঁঝা<বঞ্‌ঝা<বন্ধ্যা ; সিঝে<সিজ্‌ঝই<সিধ্যতে।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে "ঝ"-এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবত এইগুলি দেশী। যেমন, ঝকঝক, ঝকমক, ঝকড়া, ঝগড়া, ঝড়, ঝাট (তুলনীয়-সং ঝটিতি) ঝটকা, ঝটপট, ঝনঝন, ঝমঝম, ঝিরঝির, ঝুল, ঝুলন, ঝোলা, ঝালর, ঝিলিমিলি, ঝলসা, ঝলকা, ঝাঁ ঝাঁ, ঝাঁকড়া, ঝাঁঝর, ঝাড়, ঝাড়া, ঝাঁটা, ঝাণ্ডা (? ধ্বজা), ঝান্নু, ঝাঁপ, ঝাপটা, ঝাপসা, ঝাঁপান (=? যাপ্যযান) ; ঝামা (তুলনীয় সং-ক্ষাম), ঝিঁ ঝিঁ, ঝিঙ্গা, ঝিমঝিম, ঝুরু, ঝোঁক, ঝোপ, ঝোড়, ঝোল ইত্যাদি।

ট্—

১। পদের আদিতে "ট" অপরিবর্তিত আছে। যেমন, টাকা<টঙ্ক ; টঙ্<টঙ্গ ; টলে<টলতি।

৩। বিবিধ যুক্ত ব্যঞ্জন হইতে প্রাকৃতে প্রাপ্ত সমীভূত-ট্‌ট বাংলায় একক "ট"-তে পরিণত হইয়াছে—ভাট<ভট্ট ; মাটি<মট্টিআ<মৃত্তিকা : দেউটী<দিয়টি (প্রা-বা)< দিঅবট্টিআ (প্রা)<দীপবর্তিকা ; নেওটা<*ণেহবট্ট (প্রা)<স্নেহবৃত্ত ; কাঁটা< কণ্টঅ<কণ্টক<কৃন্তক ; ইঁট<*ইণ্ট<ইট্ট<ইষ্ট। ঘাট<ঘট্ট ; হাট<হট্ট ; খাটায়< খট্টয়তি ; কুটে<কুট্টই<কুট্টতি, কুর্ততি ; নাট<নট্ট<নর্ত ; নাংটা<*নঙ্গ-বট্ট<নগ্ন-বর্ত ; আঁষটে<আমিষ-বৃত্তিকা ; বাটুল<বর্তুল ; আওটা<আবর্ত ; পালট<পর্যস্ত ; ঘাঁট< ঘৃষ্ট ; কাঁটাল<কণ্টাল ; আঁটকুড়ো<আউট্টকুড়া<*অবুণ্টকুড়া<অবুত্তকুড়া<অপুত্র+ কূট।

৩। "র" বা "ল"-এর সংস্পর্শে ত>ট হয়।

যথা, টীকা<তিলক ; টুটে<ত্রুট্যতি ; টাট<ত্রাত্র ; টেরা<টগর।

৪। পদমধ্যস্থিত ও পদান্তস্থিত "ঠ" কখনো কখনো বাংলায় "ট" হইয়াছে। উট< উঠ<উট্‌ঠ (প্রা)<উষ্ট্র ; আংটি<আঙ্‌ঠি<অঙ্গুট্‌ঠিআ<অঙ্গুষ্ঠিকা ; ঢীট<ঢীঠ<ধৃষ্ট।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলি সম্ভবত দেশী—

টেঙ্গরা, টাঙ্গা, টিকলী, টুকরী, টোপর, টোলা, টিলা, টক, টাকে ইত্যাদি।

ঠ্—

১। শব্দের আদিস্থিত "ঠ" রক্ষিত আছে। ঠাঁই<স্থামন্; ঠাক (তুলনীয়-স্তকতি); ঠাণ্ডা<*ঠণ্ড<স্তব্ধ ?; ঠাঁট<স্থাত্র ?; ঠেঁটা<ঢিট্‌ঠ<ধৃষ্ট।

এই শব্দগুলির অধিকাংশই দেশজ। যেমন, ঠক, ঠাহর, ঠাটা, ঠার, ঠাস, ঠোক, ঠেঙ্গা, ঠেস, ঠোনা, ঠুঁটা, ঠাকুর, ঠোঙ্গা, ইত্যাদি।

২। পদমধ্যস্থিত-স্ত,-স্থা প্রাকৃতে ট্‌ঠ হইয়া বাংলায় শুধু "ঠ" হইয়াছে। যেমন, আঁঠি<*অন্তিঅ<অট্‌ঠিঅ<অস্থিক; পাট<*পাঠ<পট্‌ঠ (প্রা)<প্রস্থ; উঠায়<উট্‌ঠাবেই<উত্থাপয়তি<উৎস্থাপয়তি; পাঠায়<পট্‌ঠাবেই<প্রস্থাপয়তি; উঠান<উৎস্থান, উত্থান; হেঁট<*অধিষ্ঠাৎ<অধস্থাৎ; আঁইঠা, এঁঠো<আমৃষ্ট।

৩। পদমধ্যস্থিত ষ্ট'-ষ্ঠ-স্থ প্রাকৃতে সমীকরণের ফলে বাংলায় একক "ঠ্" হইয়াছে। যেমন, গোঠ<গোট্‌ঠ<গোষ্ঠ; নট, নাট<ণঠ, ণাঠ<ণট্‌ঠ<নষ্ট। শুঁঠ<স্থুণ্‌ঠ<শুণ্ঠ; মাঠা<মণ্ঠঅ<সং মন্থক; গাঁট<গাঁঠি<গণ্ঠি<গ্রন্থি; আউট<আহুঠ<অড্‌ঢুট্‌ঠ<অর্ধ-চতুর্থ; রীঠা<অরিষ্ট।

৪। ট-কার কখনো কখনো "ঠ" হইয়াছে। যেমন' ঠেঁঠা<টেণ্টা; ঠোঁট<টুণ্ড (প্রা)<তুণ্ড।

ড্(ড়)—

১। পদাদিস্থিত সংস্কৃত "ড" ও "দ" বাংলায় "ড" হইয়াছে।

যেমন, ডিম<ডিম্ব; ডাল<ডাইল<ডালিঅ (প্রা)<দালিত; ডাঁশ<ডংশ (প্রা)<দংশ; ডান<ডাইন<ডাহিন<দক্ষিণ; ডলা<ডলক; ডুমুর<উডুম্বর।

২। দেশী শব্দগুলিতে পদের আদিতে "ড" রক্ষিত আছে।

যেমন—ডগা, ডাব, ডাবা, ডাবর, ডোঙ্গা, ডুব, ডাগর, ডেকরা, ডাঙ্গ, ডঙ্ক, ডাহা, ডুকরা, ডোল, ডালা, ডিবা, ডিঙ্গা, ডুমা, ডোবা ইত্যাদি।

৩। পদমধ্যস্থিত-ত, -ট প্রাকৃতে-ড হইয়া বাংলায় "ড়" হইয়াছে।

যেমন, চড়ে<চড়ই (প্রা)<চটতি<চততি; পড়ে<পডই<পততি; পেঁড়া<পেডঅ<পেটক; তড়<তড<তট; বড়<বড<বট; কাঁকড়া<*কঙ্কডঅ<কর্কটক; ধড়<ধট<ধৃত; তোড়ে<ত্রোটয়তি; ভড়<ভট<ভৃত (পদবী); বাহুড়ে<ব্যাঘুটতি; ফোড়ে<স্ফোটয়তি; ফাড়ে<স্ফাটয়তি; খাঁড়া<খণ্ড।

পদমধ্যস্থিত একক অথবা অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ড্ বাংলায় শুধু "ড়" হইয়াছে।

যেমন, নাড়ি<ণাডিআ<নাডিকা; উড়ে<উড্‌ডেই (প্রা)<উড্ডয়তি; ছিঁড়ে<ছিণ্ডই<*ছিণ্ডতি<ছিন্দতি; কড়া<কবড্ডঅ<কপর্দক; পাঁড়<পাণ্ডু;

সাঁড়াশি<সণ্ডংসিআ<সংদংশিকা ; পাড়া<পদ্র , ছাড়ে<ছর্দতি ; আমড়া<আম্রাতক ; বয়ড়া, বহেড়া<বহেডঅ<বিভীতক ; শিঙ্গাড়া<শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাতক ; পড়িহায় (ম-বা)< প্রতিভাতি ; পড়িহাস<প্রতিভাস ; গোয়াড়া<গোপবাটক ; আখড়া<অক্ষবাট ; কানড়<কর্নাটক ।

ঢ্ (ঢ়)—

১ । সংস্কৃতে ও দেশী শব্দে পদের আদিস্থিত "ঢ" অবস্থিত আছে ।

যেমন, ঢোকে<ঢোক্কই (প্রা)<ঢৌক্যতে ; ঢিলা<ঢিল্ল<শিঢিল্ল<শিথিল ; ঢাকে <ঢক্কই<ঠাগতি<স্থাগতি ।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি সম্ভবত দেশী—ঢল, ঢাক, ঢাগালি, ঢাল, ঢিপ, ঢিবি, ঢিল, ঢুল, ঢুঁড়, ঢেউ, ঢেঁকী, ঢেঁকুর, ঢেঁড়স, ঢেমন, ঢেমসা, ঢেরা, ঢোল, ঢের ইত্যাদি ।

২ । সংস্কৃত শব্দের পদাদিস্থিত দ ও ধ বাংলায় "ঢ" হইয়াছে ।

যেমন, ঢালে<ঢালেই<ধারয়তি ; ঢীট<ঢিট্‌ঠ (প্রা)<ধৃষ্ট ; ঢোঁড়া<ডুণ্ডুহ (প্রা) <ডুন্দুভ ; ঢুঁড়ে<ঢুণ্ডেই (প্রা)<*ধুন্ধয়তি ।

৩ । পদমধ্যস্থিত-ঠ্ ও-ঢ্ বাংলায় ঢ়>ড় হইয়াছে ।

যেমন, পিঁড়ি<পিঢ়ি<পিড়িঅ<পিঠিঅ<পীঠিকা ; গড়ে<গঢ়ে<গঠই (প্রা)< গঠতে<গ্রথতে ; দাড়া<দাঢ়া<দাঢ়া (প্রা)<দংষ্ট্রা ; বাড়ে<বাঢ়ে<বড্ঢেই<বর্ধয়তি ; মাড়<মাঢ়<মৃষ্ট ; আড়াই<*অড্ঢ-তিতীয়<অর্ধ-তৃতীয় ; কাড়ে<কাঢ়ে<কাড়ই< কড্ঢই<কড্ঢেই<*কৃষ-ধ-তি ।

ত্

১ । পদাদিস্থিত একক 'ত' বাংলায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে ।

যেমন, তরে<তরই<তরতি ; তা<তাব (প্রা)<তাপ ; তাগা<তগ্গ [দেশী] ; তোড়ে<তোডেই<ত্রোটয়তি ; তরশু<তিরঃ-শ্ব ; তড় (ম-বা)<তাট ; তোলে< তোলয়তি ।

২ । পদমধ্যবর্তী অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত -ত প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু 'ত' হইয়াছে ।

যথা—বাতি<বত্তিআ (প্রা)<বর্তিকা ; ভিত<ভিত্তি (প্রা)<ভিত্তি ; মোতি< মুত্তিঅ<মোত্তিঅ<মৌক্তিক ; পীলা<পিত্তল, পিঅল<পীতল ; নাতি<ণত্তিঅ (প্রা) নপ্তৃক ; জাঁতা<জন্তঅ (প্রা) যন্ত্রক ; পাঁত<পংক্তি (প্রা)<পঙ্‌ক্তি ; বেঁত<*বেত্ত ; আঁতুড়<*অন্তউড<অন্তঃকূট ; আরতি<আরত্রিক ; করাত<করপত্র ; চিতা, চীতা<

চিত্রক ; জায়তী (মা-বা)<জাতপত্রিকা (কোষ্ঠী অর্থে) ; যাঁতা, জাঁতা<যন্ত্র ; মাহুত <মহামাত্র ; ছাতু<শক্তু ; জোত<যোক্‌ত্র ; সাঁওতাল<সামন্তপাল ; সাঁতরা< সামন্তরাজ ; সিঁতি<সীমন্তিকা ; মাইতি<মাহিতী<মহন্ত+ইক ; বিনতি<বিজ্ঞপ্তি।

থ্—

১। পদাদিস্থিত স্ত ও স্থ প্রাকৃতে ও বাংলায় শুধু 'থ' হইয়াছে।

যেমন, স্তর>থর (প্রা)>থর ; স্তম্ভ>থম্ভ>থাম ; থাকে<√স্থা ; থাল<স্থালী ; থোয়<স্থাপয়তি ; থোড়া<স্তোক ; থিত<স্থিত ; থোবা<স্তবক।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির উৎপত্তি অজ্ঞাত :—

থরথর, থুতু, থতমত, থাবা, থাস, থাবড়া, থুতি, থোঁতা, থুড়া, থুবড়া, থেঁতাল, থোড় ইত্যাদি।

২। পদমধ্যবর্তী অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ত্ ও থ্ প্রাকৃত থ হইয়া বাংলায় একক "থ" হইয়াছে।

যেমন, উথল<উত্থল<উৎস্থল ; পুথি, পুঁথি<পুত্থিআ<পুস্তিকা ; মাথা<মত্থঅ <মস্তক ; সাথ<সত্থ (প্রা)<সার্থ ; তুঁতিয়া <তুত্থ ; হেথা<অত্র ; কয়েদ, কদ< কয়েথ, কথ<কইত্থ (প্রা)<কপিত্থ ; আথান্তর (ম-বা)<অবস্থান্তর ; পৈথান<পদ-স্থান ; বাথান<বাসস্থান ; শিথান<শিরস্-স্থান।

দ্—

১। পদের আদিস্থিত দ, দ্র ও দ্ব বাংলায় শুধু "দ" হইয়াছে।

দাপন (প্রা-বা)<দপ্পণ (প্রা)<দর্পণ ; দীর্ঘ<দিগ্‌ঘ<দীর্ঘ ; দেউটী<দীপ-বর্তিকা ; দাড়া<দংষ্ট্রা ; দোনা<দমনক ; দৌড়<দ্রব-ড ; দাম<দ্রম্ম<দ্রাক্‌মে<(গ্রীক drakhme) ; দুনা<দ্বিগুণ।

সংখ্যাবাচক "দ্বি" শব্দে দ-কার লুপ্ত হইয়াছে কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে ব>উ হইয়াছে।

বার<দ্‌বাদশ<দ্বাদশ ; বাইশ<*দ্‌বাবীস<দ্বাবিংশ ; দুই<দুবে (প্রা) <দ্বে ; বেণি <*দ্বীণি।

২। পদমধ্যস্থিত অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে "দ" প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু "দ" হইয়াছে।

যেমন, খুদ<খুদ্দ<ক্ষুদ্র ; নিঁদ, নীদ<নিন্দা (ম-বা) <নীদ (প্রা-বা) <নিদ্দা (প্রা) <নিদ্রা ; আদা<আদ্র্ক ; মুদো>মুদ্দঅ (প্রা) <মুদ্রক ; উদাম<উদ্দাম (প্র)<উদ্দামন্ ; ছাঁদ<ছন্দ (প্রা)<ছন্দস্ ; সোদো<*সওঁদ্‌দুআ<সমুদ্র+উক ;

ননদ<ননন্দা ; বাদল<বর্দল ; ইঁদারা<ইন্দ্রাগার ; ইন্দাস<ইন্দ্রাবাস ; ইঁদকুড়ি<ইন্দ্রকুটিকা ; বাঁদর<বান্দর<বানর ; জাঁদরেল<ইং জেনারেল (general) প্রভৃতি শব্দে "দ"এর আগম হইয়াছে।

ধ্—

১। পদাদিস্থিত "ধ" যথারীতি রক্ষিত আছে।

যেমন, ধরে<ধরই (প্রা)<ধরতি ; ধোয়া<ধুবঁঅ<ধুমঅ<ধূমক ; ধল<ধঅল (প্রা)<ধবল ; ধাই<ধাইআ (প্রা)<ধাতৃকা ; ধড়<ধৃত ; ধুতি<ধোত্র ; ধায়<ধাবয়তি ; ধাঁধাঁ<ধন্ধা ; ধুনা<ধূপন।

২। পদমধ্যস্থিত ধ-কারযুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃত সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু 'ধ' হইয়াছে। যেমন, আধ<অদ্ধ (প্রা)<অর্ধ ; ধার<উধার (প্রা-বা)<উদ্ধার ; পিন্ধ<অপিনদ্ধ ; সাধ<শ্রদ্ধা ; কাঁধ<কন্ধ<স্কন্ধ ; আঁধি<অন্ধিকা ; বাঁধ<বন্ধ (প্রা)<বন্ধ ; বাধাই<<বদ্ধাইআ (প্রা)<বর্ধাপিকা ; বধনা<বর্ধন।

প্—

১। পদের আদিতে অবস্থিত 'প' রক্ষিত আছে।

<পান<পর্ণ ; পঁউআ<পদুমা<পদ্ম-নাল। পুছে<পৃচ্ছতি ; পইতা<পবিত্র ; পৌনে<পাউণ (প্রা)< পাদোন ; পাব<পব্ব (প্রা)<পর্ব্বন ; পশে<পবিশই<প্রবিশতি ; পাতিয়ায় (ম-বা)<পত্তাএই (প্রা)<প্রত্যাপয়তি ; পয়লা<পহিল<পহিল্ল (প্রা)<সং-প্রথ+ইল ; পরে<পহ্রে, পহিরে (ম-বা)<পরিধীয়তে ; পুড়ে<পুটতি ; পুঁটী<পুঁঠী<প্রোষ্ঠিকা ; পইঠা<প্রতিষ্ঠা ; পাউষ<প্রাবৃষ ; ফেলে<পেলে (ম-বা)<পেল্লই<প্রেরয়তি ; পগার<তুলনীয়-ফারসী-পইগার ; পুতুল<পুত্রল ; পুতলী<পুত্তলিকা ; পূঁজ<*পুঞ্জ ; পৌছাই<প্র-উঞ্চ।

২। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধুক্ত 'প' প্রাকৃতে প্প হইয়া বাংলায় কেবলমাত্র 'প' হইয়াছে। কাঁপ<কম্প ; কাপাস<কপ্পাস< (প্রা)<কাপাস<কার্পাস ; উপজে<উপজ্জই (প্রা)<উৎপদ্যতে ; সঁপে<সবঁপ্পেই (প্রা)<সমর্পয়তি ; বাপ<বপ্র ; খোঁপা<খোম্পা<ক্ষুপ ; পিঁপড়া<পিঁপিড়া<পিম্পিড়া (প্রা-বা)<পিপীলিকা ; ঝাঁপান<যাপ্য-যান ; সাঁপুড়া<সম্পুট ; চাপড়<চর্পট ; খাপ <খপ্প<কর্প ; খাপড়া<খপ্পর ; ভাপ<ভপ্প<*বপ্‌ফ<বাষ্প ; আপন<আত্মন্ (তুলনীয় অৎপা, গির্নার অনুশাসন)।

ফ্—

১। পদাদিস্থিত "ফ" রক্ষিত আছে—

ফুল<ফুল্ল (প্রা)<ফুল্ল; ফাগ<ফগ্গু (প্রা)<ফল্গু; ফোড়<ফোড়অ (প্রা)< স্ফোটক; ফলার<ফলাহার; ফাড়<ফণ্ড; ফালে<ফালেই (প্রা)<স্ফারয়তি।

২। 'প' মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হইয়া "ফ" হইয়াছে—

ফেলে<পেলে (ম-বা)<পেল্লই (প্রা)<প্রেরয়তি; ফড়িঙ্গ<পতঙ্গ; ফলঙ্গ< প্লবঙ্গ? ফাঁদ<ফাঁদ+পাশ; ফাতা<ফলা+পাতা।

৩। পদমধ্যস্থিত অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত 'ফ' বংলায় শুধু 'ফ' হইয়্যছে।

লাফ<লম্ফ; গোফা<গুম্ফা (প্রা)<গুম্ফা। আফালে<আস্ফালয়তি; লাফড়া (লাবড়া)<লাবডা<অলাবু+ডা।

কতকগুলি শব্দে "ফ" এর ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। যেমন, ফিকা, ফের, ফেউ, ফিঙ্গা, ফড়িয়া, ফাঁড়া ইত্যাদি।

—ব্—

১। পদাদিস্থিত "ব" বজায় আছে।

বিতিকিচ্ছি<বিচিকিৎসা; বান<বণ্ণা (প্রা)<বন্যা; বউড়ি<বহুডিআ (প্রা)< বধূটিকা, বুঝে<বুজ্ঝই<বুধ্যতে; বালা<বালঅ (প্রা)<বালক; বহেড়া<বহেডঅ (প্রা)<বিভীতক; বুক<বুক্ক<বৃক্ক; বানান<বর্ণাপন; বলে<বোল্লই (প্রা)<ব্রবীতি; বাউল<বাতুল; বিসরে (ম-বা)<বিস্মরতি; বেড়<বেষ্ট; বাছুর<বচ্ছরুঅ<বৎসরূপ; বেয়ান<*বৈবাহিনী; বেসাত, বেসাতি<বৈশ্য-ত্ব; বকনা<বস্কয়ণী।

২। সংখ্যাবাচক "দ্বা" শব্দে "দ" পরিত্যক্ত হইয়া শুধু "বা হইয়াছে।

যেমন, বার<দ্বাদশ (প্রা) <দ্বাদশ; বাইশ<দ্বাবিংশতি; বায়ান্ন<বাবন্নাহ (প্রা) <দ্বাপঞ্চাশৎ।

৩। অন্য ব্যঙনের যুক্ত "ব" প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় একক "ব" হইয়াছে।

করিব<করিঅব্ব (প্রা)<কর্তব্য; গাব<গব্ব<গর্ব্ব; (গাবানো—নামধাতু); বোহারী<ব্যবহারিক; বাখান<ব্যাখ্যান; নেবু<নিম্বুক; গাবান<গর্ব; বামনাই< ব্রাহ্মণায়িত।

৪। হ-কারের বিপর্যাসের ফলে ভ<ব হয়।

বোন<বহিনী<ভইনী (প্রা)<ভগিনী।

-ভ্—

১। পদাদিস্থিত "ভ" রক্ষিত আছে—

ভিন<ভিণ্ণ (প্রা)<ভিন্ন ; ভাই<ভাইঅ (প্রা)<ভ্রাতৃক। ভাড়<ভাণ্ড ; ভিতর< অভ্যন্তর ; ভোল<ভ্রম+অল্প ; ভাজ<ভ্রাতৃজায়া ; ভাড়া<ভাটক ; ভরসা<ভরবস ; ভেখ<ভৈক্ষ্য।

২। "ব" মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত হইয়া "ভ" হইয়াছে—

ভুখ<বহুকৃখ (প্রা)<বুভুক্ষা ; ভাপ<বাষ্প ; ভূষি<বুস ; ভুতুড়ী<বুথ (প্রা)<বুস্ত।
হ-কারের স্থান পরিবর্তনের ফলে ব>ভ হইয়াছে।
ভৈঁস (ভয়সা)<মহিংস (প্রা)<মহিষ।

৩। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত "ভ" প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় ভ>ব হইয়াছে—

গাবু<গাভু<গাভা<গব্ভঅ (প্রা)<গর্ভক ; আবছা<অব্ভচ্ছাঅ (প্রা)<অভ্রচ্ছায়া ; উভ (ম-বা)<উব্ভ<ঊর্ধ্ব ; গাভুর<গর্ভরূপ ; নিবায়<নিভায়<* নিব্বাবেই <নির্বাপয়তি ; জিব<জীভ<জিব্ভা<জিহ্বা।

ম—

মুচি<মৃসিকা ; কামাই<কর্ম ; গিম্হ<গ্রীষ্ম ; ময়না<মদন ; আমানী<আচামপানীয় ; গুমোট<গ্রীষ্ম+বৃত্ত।

র্—

১। পদের আদিতে ও মধ্যে র-কার রক্ষিত আছে—

রাশ<রস্সি (প্রা)<রশ্মি ; রাতা (ম-বা)<রত্ত (প্রা)<রক্ত ; রুই<রোহিঅ (প্রা)< রোহিত ; রোঁ, রোঁয়া<লোম<রোম<সং রোমন্ ; রাঁড়<রণ্ডা ; রিঠা<অরিষ্ঠ ; রোয়<রোপয়তি ; আর<অবর (প্রা)<অপর ; করে<করই<করোতি ; ময়রা< মোদক-কার।

২। পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত-"র" বাংলায় শুধু "র" হইয়াছে।

আরসি<*আঅরসিআ<আদর্শিকা ; সরিষা<সরিসঅ (প্রা)<সর্ষপ ; উতরে< উত্তরতি ; কেয়ারী<কেদারিকা ; পরে<পরিধীয়তে। ডুমুর<উদুম্বর ; কেরাণী< কীরক+করণিক ; নেহার<নি+√ভাল্ ; পারুল<পাটলী ; জারুল<জটুল ; সরেশ< সরিস<সদৃশ ; পেঁটরা<পেটক।

৩। পদমধ্যবর্তী ট, ড্ দ্ প্রাকৃতে "ড" হইয়া "র" হইয়াছে।

পারুল<পাডলী (প্রা)<পাটলী ; বেরাল<বিডাল< (প্রা)<বিডাল ; তের< তেরহ (প্রা)<ত্রয়োদশ . সত্তর<সত্তরি<*সত্তডি<সপ্ততি।

৪। "ড" কখনো কখনো "র" হয়।

যেমন, পাঁপর<পাঁপড়<পপ্পড (প্রা)<পর্পট।

৫। আঞ্চলিক উপভাষায় স্বরাদি শব্দে র-কারের আগম হয়।

রোজা<ওঝা<উবজ্ঝাঅ<উপাধ্যায় ; রাশু<আশু ; পদাদিস্থিত র-কার ও অনেক সময় লুপ্ত হয়।

উই<রুই<রোহিঅ<রোহিত ; অস<রস।

—ল্—

১। পদাদিস্থিত ও পদমধ্যস্থিত "ল" বজায় আছে।

লিখে<লিক্খই (প্রা)<লিখাতে ; আলতা<অলত্তঅ (প্রা)<অলক্তক ; চল্লিশ<*চতল্লীস<চত্তারীস (প্রা)<চত্বারিংশৎ ; পালঙ্<পল্লঙ্ক (প্রা)<পর্যঙ্ক ; পালকি<পল্লঙ্কিআ<পর্যঙ্কিকা ; ভাল, ভালো<ভল্লঅ (প্রা)<ভদ্রক ; হলুদ<হলিদ্দা (প্রা)<হরিদ্রা ; পোয়াল<পবাল (প্রা)<প্রবাল ; লয়<লভতে ; লাছ (ম-বা)< রথ্যা ; লেজুড়<রজ্জু ; শালিক<সারিকা ; পালট<পর্যস্ত ; গালি<গর্হা ; পাখালে< প্রক্ষালয়তি ; থালা<স্থাল ; আঁওলা<আমলক ; পিলা<তামিল পিল্লই ; পোলা<পোতা +ল ? ; পালান (তুলনীয়, তেলেগু "পালু", তামিল "পাল")

২। শব্দের আদিতে কখনো কখনো ল>ন হয়।

নাউ<লাউ ; নুচি<লুচি ; নুন<লবণ ; নেজ<লেজ ; নোক<লোক ; নাটাই< লাটিম ; নাল<লাল ; নখিন্দর<লক্ষীন্দর ; গুনো<গুলি ; ক'রনু<করিনু=করিলুম।

আবার সময় সময় ন>ল হয়।

লাইহর<নাইয়র<নাইহর<জ্ঞাতিগৃহ ; লড়<নড় ; লয়<নয় ; লোকসান< (ফারসী) নুকসান ; লম্বর<নম্বর ; লাঙ্গা<নাঙ্গা<নগ্ন।

=শ্, ষ্, স্—

১। পদাদিস্থিত ও পদমধ্যস্থিত শ, ষ, স রক্ষিত আছে—

শ<সঅ (প্রা)<শত ; শালিক<সারিকা ; ষাট<সট্‌ঠি<ষষ্ঠী ; সই<সহি(প্রা) সখী ; আউষ<আবৃষ ; পাউষ (ম-বা)<প্রাবৃষ ; শিখ<শাইক্ষ্য [শিষ্য]

২। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত শ, ষ, স প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় শ অথবা স হইয়াছে।

পাশ<পস্‌স<পার্শ্ব ; মুনিস্‌স (প্রা)<*মুনিষ্য<মনুষ্য ; শীষ<সিস্‌স (প্রা)<শীর্ষ ; শাঁস<*সংশ<সস্‌স (প্রা)<শস্য ; পাসরে<পস্‌সরই<প্রস্মরতি ; বিসরে<বিস্‌সরই (প্রা) <বিস্মরতি ; মিশাল<মিশ্র ; সোঁতা<সোত্ত<স্রোতস্‌ ; নিশান<নিঃস্বান।

—হ্‌—

১। পদাদিস্থিত ও পদমধ্যস্থিত সংস্কৃত ও প্রাকৃতের "হ" বাংলায় রক্ষিত আছে।

যেমন, হাতি<হাথি<হত্থিঅ<হস্তিক ; হাঁস<হংস ; হালকা<হলুক্ক (প্রা)< লঘুক ; সোহাগ<সৌভাগ্য ; নিহালে<নিভালয়তি ; পোহায়<প্রভাতায়তে।

২। পদমধ্যস্থিত মহাপ্রাণবর্ণ প্রাকৃতে "হ" হইয়া আধুনিক বাংলায় অনেক সময় লুপ্ত হইয়াছে—

নাই, নেই<নেহ (প্রা)<স্নেহ ; নাই<ণাহি (প্রা) নাভি ; রাই<রাহী (প্রা-বা) <রাহিআ<রাধিকা ; কয়<কহে<কহেই<কথয়তি ; বয়<বহে<বহই (প্রা) বহতি ; নরুন<নহ-হরণী<নখহরণিকা ; শিউলী<শিহলী<শেফালিকা ; বয়ড়া<বহেড়া< বহেডঅ<বিভীতক ; বিয়ান<বিহান<বিভান ; এয়ো<আইহ<অবিধবা।

৩। পদমধ্যস্থিত শ্‌, ষ্‌, স্‌ প্রাকৃতে "হ" হইয়া বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে।

যেমন, তা<তাহ (প্রা)<*তাস (=তস্য) ; নাই<নাহি<ণাহি<নাসি (প্রা) <নাসীৎ ; পনর<পন্নডহ (প্রা)<পঞ্চদশ।

৪। কখনো কখনো হ-কারের আগম বা **হ-শ্রুতি**ও দেখা যায়।

যেমন, হেথা<এথা<এত্থ<(প্রা)<*এত্র (=অত্র) ; হাঁটু<আঁঠু (ম-বা)< *অঠ্‌ঠুঅ<অষ্ঠুক ; বাহান্ন<বায়ান্ন।

নাসিক্য বর্ণ

সংস্কৃতের পাঁচটি বর্গীয় আনুনাসিক বর্ণ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এবং ং বাংলা বর্ণমালায় পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলায় শুধু ঞ, ন ও ম এর ব্যবহার আছে।

—ঙ্‌—

১। আধুনিক বাংলায় "ক" ও "খ" এর পূর্ববর্তী "ঙ" পূর্বস্বরকে নাসিক্য করিয়া লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় "ঙ" রক্ষিত ছিল।

যেমন, বাঁকা<বঙ্ক<বক্‌ক<বক্র ; শাঁখ<সঙ্খ<শঙ্খ ; শাঁখি (গ্রীবা অর্থে)<*সঙ্খিআ শঙ্খিকা ; সাঁকো<সাঙ্কম (প্রা-বা)<সঙ্কম (প্রা)<সংক্রম।

২। "গ" ও "ঘ" এর পূর্ববর্তী "ঙ" রক্ষিত হয় এবং ধ্বনি দুইটি কখনো কখনো লুপ্ত হয়।

যেমন, গাঁঙ<গঙ্গা (কিন্তু গাঙ্গিণী); জাঙ<জঙ্ঘা (কিন্তু জাঙ্গাল); বেঙ< বেঙ্গ (প্রা-বা)<ব্যাঙ্গ (কিন্তু বেঙ্গাচি); সঙ<সাঙ্গ (প্রা-বা)<সঙ্গ (প্রা)<সঙ্গ ঃ শিঙ্‌নি<শিক্‌নি<সিঙ্ঘাণিআ (প্রা)<শিঙ্ঘানিকা।

—ঞ্—

১। প্রাচীন বাংলায় "ইআঁ" ধ্বনির বিকল্প উচ্চারণরূপে "ঞ" কদাচিৎ পাওয়া যায়।

যেমন, গোঁসাই<গোসাঞি (ম-বা)<গোস্‌সাবি<গোস্‌সামি<গোস্বামী। দুই একটি শব্দ ছাড়া এই ধ্বনির প্রয়োগ বাংলায় নাই। যেমন, মিঞা।

৩। চ-বর্গের ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত "ঞ" পূর্ববর্তীস্বরকে নাসিক্য করিয়া লুপ্ত হইয়াছে।

যেমন, পাঁজি<পঞ্জিআ<পঞ্জিকা; বাঁঝা<বঞ্‌ঝা<বন্ধ্যা; আঁচল<অঞ্চল; ঝাঁঝা<ঝঞ্ঝা

—ণ্—

১। বাংলায় ণ-কার ধ্বনির অস্তিত্ব নাই। পদমধ্যবর্তী ট-বর্ণের ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত ণ-কার পূর্বস্বরকে নাসিক্য করিয়া একক ট-বর্ণ ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে।

যেমন, ঘাঁট<ঘণ্ট<সং-গ্রন্থ; কাঁটা<কণ্টঅ<কণ্টক।

২। অ-কারের পরবর্তী "ণ্ড" বাংলায় পূর্বস্বর নাসিক্য করিয়া "-ড়" হইয়াছে।

যেমন, ডান্, দাঁড়<দণ্ড (ডাংগুলি); ভাঁড়, ভান<*ভণ্ণ<ভণ্ড (প্রা)<ভণ্ড; থাঁড়, থান<*থণ্ণ<খণ্ড (প্রা)<খণ্ড; গাড়, গান (-কচু)<*গণ্ণ<গণ্ড (প্রা)<গণ্ড।

—ন্—

১। পদাদিস্থিত ও পদমধ্যস্থিত "ন্" বাংলায় রক্ষিত আছে।

নাতি<ণত্তিঅ (প্রা)<নপ্তৃক; ন, নয়<ণব (প্রা)<নব; নাঙ্গা<নগ্ন; শুনে< সুণই (প্রা)<শৃনোতি; জানে<জাণই (প্রা)<জানাতি; বামুন<বামন<বম্‌হণ< ব্রাহ্মণ; নাইহর<জ্ঞাতিগৃহ; নেই<নেহ (ম-বা)<স্নেহ; ননদ<ননন্দা; হেন<এইসন <*এতাদৃশন।

২। পদমধ্যস্থিত অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত "ন" ও "ণ" প্রাকৃতে সমীভূত হইয়া বাংলায় একক "ন" হইয়াছে।

পান<পণ্ণ (প্রা)<পর্ণ; বান<বণ্ণা (প্রা)<বন্যা; ভানা (বান)<ভগ্ন (প্রা) <ভগ্ন; রুগ্ন, রোনা<রুণ্ণ<রুগ্ন; চিনা<চিণ্‌হঅ (প্রা)<চিহ্নক; থান, থানা<*থণ্ণ

(প্রা)<খণ্ড ; পানায়<পণ্‌হবেই (প্রা)<প্রস্নবয়তি ; উনান<উষ্ণাপন ; বাণান, বানান<বর্ণন ; কানড়<কর্ণাট ; বিনুনী<বর্ণপনিকা+বিন্যাস ; আনাড়ী<অজ্ঞানী।

৩। পদমধ্যস্থিত -ন্দ, -ন্ধ এই যুক্তব্যঞ্জনদ্বয়ের ন-কার পূর্ববর্তী স্বরকে নাসিক্য করিয়া লুপ্ত হইয়াছে।

যেমন, আঁধার<অন্ধআর<অন্ধকার ; ইঁদুর<ইন্দুর (প্রা)<ইন্দুর ; চাঁদ<চান্দ< চন্দ্র ; সাঁঝ<সন্ধ্যা ইত্যাদি।

৪। প্রাকৃতের "ল" কখনো কখনো "ন" হইয়াছে।

যেমন—নুন<লোণ (প্রা)<লবণ ; নাছ<লাছ (প্রা)<রথ্যা।

ম্—

১। পদাস্থিত "ম" বজায় আছে।

মউ<মহু<মধু ; মা<মাঅ (প্রা)<মাতা ; মাখে<মক্‌খই (প্রা)<ম্রক্ষতি ; মশান<শ্মশান ;

২। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জন যুক্ত "ম্" প্রাকৃত সমীভূত হইয়া বাংলায় শুধু "ম" হইয়াছে—কুমার<কুম্ভআর<কুম্ভকার ; দাম<দম্ম (প্রা)<দ্রম্য<দ্রাখমে (গ্রীক) ; জাম<জম্বু ; কুমড়া<কুম্‌হণ্ডঅ<কুষ্মাণ্ডক ; ছাতিম<সপ্তপর্ণ ; গুমট<গ্রীষ্ম ; উমান<উষ্ণাপন।

৩। পদমধ্যবর্তী "ম্" অপভ্রংশে "বঁ" হইয়া বাংলায় পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করিয়া লুপ্ত হইয়াছে—গোঁসাই<গোস্‌সাবিঁ (প্রা)<গোস্বামিন্ ; গুঁই (পদবী)< গোবিঅ<গোমিঅ (প্রা)<গোমিন্ (গোমিক) ;

কখনো কখনো ব>ম হইয়াছে—গীম<গীবাঁ<গীবা (প্রা)<গ্রীবা।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্ত্য "ম্" প্রাকৃতে 'ং' হইয়া বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে—শ<সঅং (প্রা)<শতম্।

১। ং—পদমধ্যস্থিত "ং" পূর্ববর্তী স্বরকে নাসিক্য করিয়া লুপ্ত হইয়াছে।

যেমন, আঁশ<অংশু ; কাঁসা<কাংস্য ; মাঁস<মাংস ; হাঁস<হংস।

২। "ঙ্গ" বাংলায় বিকল্পে অনুস্বার হইয়াছে।

যেমন, রঙ্গ>রং, রঙ্ ; শিঙ্গ>শিং, শিঙ্ ; ভাঙ্গ>ভাং, ভাঙ্ ; গাঙ্গ>গাং, গাঙ্ ; বাঙ্গলা>বাংলা, বাঙ্‌লা।

ক্ষ

সংস্কৃত **ক্ষ** প্রাকৃতে (ক্)খ এবং (চ্)ছ হইয়াছিল।

বাংলায় "**ক্ষ**" এর তিন প্রকার পরিবর্তন দেখা যায়।

(১) ক্ষ>খ্—খেত<ক্ষেত্র ; খুদ<ক্ষুদ্র ; খণ<ক্ষণ ; খীর<ক্ষীর।

(২) ক্ষ<ক্খ—লক্খী<লক্ষ্মী ; পক্খী<পক্ষী ; লক্খ<লক্ষ্য।

(৩) ক্ষ>ঁ+খ—কাঁথ<কক্ষ ; আঁখ<অক্ষি।

ব্যঞ্জন ধ্বনির স্থান পরিবর্তন

সময় সময় একই অর্থদ্যোতক এক বর্গের বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্গের বর্ণের স্থান পরিবর্তন দেখা যায়। এই শব্দগুলি সম্ভবত দেশী।

(ক) ক, খ<চ ; খ<ছ

কোপ<চোপ, চোব ; খোঙ্গা, খুঙ্গী<চোঙ্গা, চুঙ্গী।

ঘুম<ঝিম ; খাল<ছাল ; খোলা<ছোলা।

(২) চ>ট ; চ>ত ; জ>দ।

চাখ>টাখ ; চাউল>তাউল ; জনাই>দনাই ; কচলা>কতলা।

সপ্তদশ অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology) ; রূপবিচার (Morphemics)

বাংলা পদ-পরিচয়

বৈয়াকরণেরা পদকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সুবন্ত, তিঙন্ত ও নিপাত। সুবন্ত শ্রেণীতে পড়ে, বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম। তিঙন্ত শ্রেণীতে পড়ে সমাপিকা ক্রিয়া। এতদ্ব্যতীত আর একশ্রেণীর পদ আছে, তাহাদিগকে নিপাত বা অব্যয় বলা হয়। সুবন্তপদে "সুপ্" অর্থাৎ কারকের বিভক্তি যুক্ত হয়। তিঙন্ত পদে "তিঙ্" অর্থাৎ "কাল-ভাব-বাচ্য দ্যোতক" বিভক্তি বসে। নিপাত পদে কোন বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না ; ফলে এই শ্রেণীর পদে কোন পরিবর্তন ঘটে না। প্র, পরা, উপ, সম্, নি প্রভৃতি উপসর্গগুলি আসল বা মৌলিক নিপাত। অন্যান্য নিপাতগুলি (যেমন—দিবা, রাত্রি, অথবা, ঈষৎ) এক সময় সুবন্ত পদেরই অন্তর্গত ছিল।

লিঙ্গ (Gender)

বিশেষ্যের লিঙ্গ—প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষায় নামপদের তিন লিঙ্গ ছিল—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। অপভ্রংশস্তরে পদান্তস্থিত "আ, ই, ঈ" অ-কারে পরিণত হওয়ার ফলে স্ত্রীত্ববোধক শব্দগুলি পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের সহিত একীভূত হইল। ফলে কেবলমাত্র বিশেষণ পদে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হইত।

প্রাচীন বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যপদের বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন, চর্যাপদে—**ছাড়েরি মালী ; লাগেলি আগি ; তোহারি কুড়িআ** ইত্যাদি।

আদি মধ্য-যুগের বাংলায় ও বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় পাওয়া যায়। যেমন, **উত্তরলী হয়িলী রাহী ; কোঁঅলী পাতলী বালী।**

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়াপদে ও স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন, সোণে **ভরিলী** করুণা নাবী ; সূজ লাউ সসী **লাগেলী** তান্তী ; ঈষত **হাসিলী** চন্দ্রাবলী।

বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী প্রভৃতি মগধীয় ভাষাগুলিতে এখন বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হয় না। কিন্তু হিন্দীতে ক্রিয়ায় স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয়। শুধু জাতি বা শ্রেণী বুঝাইতে বিশেষ্যপদে স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয়।

বাংলায় স্ত্রী-প্রত্যয় দুইটি—ঈ (-ই) ও (-ই) নী। প্রথমটি জাতিবাচক, দ্বিতীয়টি কার্যবাচক।

(১) ঈ—বুড়ী, বামনী, হাঁসী, কাকী, জেঠী, ভেড়ী, ছুঁড়ী, নেড়ী।

(২) নী,-ইনী—গয়লানী, মজুরনী (স্ত্রীমজুর), নাতিনী, শিবানী, মেথরানী, ডোমনী, নাগিনী, প্রেতিনী।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাছ "-ইনী" প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় "ইন" হইয়াছে। যথা, মিতিন<*মিত্রিনী ; নাতিন<নাতিনী।

স্ত্রীত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া ও স্ত্রীলিঙ্গের পদ গঠিত হয়।

যথা—মেয়ে-মাষ্টার ; মা-গোঁসাই ; গাই-গোরু ; কন্যা-সন্তান।

পুরুষ প্রাণী বুঝাইতে অনেক সময় পুংলিঙ্গ "আ" প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যথা—জোইয়া—জোইনী ; হরিণা—হরিণি ; বগা—বগী ; হাঁসা—হাঁসী ; অভাগা-অভাগী।

আবার বৃহৎ অর্থে পুংলিঙ্গে "আ" প্রত্যয় এবং ক্ষুদ্র অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা—তিয়ড়া—তিয়ড়ী (ম-বা); বড়া—বড়ী ; ঘড়া—ঘড়ী ; জাঁতা—জাঁতি।

নিন্দাসূচক অর্থে স্ত্রী-প্রত্যয় "ই" এর ব্যবহার চর্যায় পাওয়া যায়। যথা—কাহ্ন—কাহ্নি।

আধুনিক বাংলায় লিঙ্গের পার্থক্য বিশেষভাবে অনুসৃত হয় না।

বিশেষ্যের বচন

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার শব্দরূপে ও ধাতুরূপে দ্বিবচনের প্রয়োগ মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় লুপ্ত হইয়াছিল। কেবলমাত্র দ্বে, দো,<দ্বৌ, দুবে, দুবি, বে (<দ্বে), উভো<উভৌ এই পদগুলির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। চর্যায় বেণি<*দ্বীণি ও 'দু(ই)" শব্দ দুইটির প্রয়োগ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাংলায় "বেণি" শব্দের প্রয়োগ নাই। প্রাচীন ও আদি-মধ্য যুগের বাংলায় শব্দরূপে একবচন ও বহুবচনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যেমন, দেবের দেব আহ্মে; বৃক্ষের প্রধান। প্রাকৃতে এবং বাংলায় দ্বিবচনের প্রয়োগ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃতের দ্বিবচনের অনুরূপ পতী, মুনী, গুরু প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়।

বাংলায় নিম্নলিখিত উপায়ে বহুবচনের পদ গঠিত হইয়া থাকে।

১। সকল, সব, যত প্রভৃতি বহুত্ববোধক বিশেষণ শব্দের সাহায্যে। যেমন, "সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই" (প্রা-বা)।

সব দেব, তোহ্মে সব, যতলোক (ম-বা)।

২। প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে জাল, লোঅ, গণ, সমাজ, লোক, ভাগ প্রভৃতি বহুত্ব বোধক শব্দের সহযোগে।

যেমন, প্রাচীন বাংলায়—জোইণি জাল (=যোগিনীরা); পণ্ডিত লোঅ (=পণ্ডিতেরা); বিদুজন লোঅ (=বিদ্বজ্জনেরা)।

মধ্যবাংলায়—নৃপভাগ (=নৃপতিগণ); রমণীসমাজ; আভরণগণ; বাদ্যগণ। বহুবচন অর্থে "মান'<মানব শব্দের প্রয়োগ মধ্য বাংলায় পাওয়া যায়। যথা—বৃদ্ধমান (=বৃদ্ধেরা)। ওড়িয়ায় বহুবচনে "মান" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৩। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিয়া ও বহুবচনের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যেমন, চর্যায়—"জে জে আইলা, তে তে গেলা"। "কেহো কেহো তোহরে বিরুআ বোলই"; 'উচা উচা পাবত'; 'ছোই ছোই যাইসি'; "মিলি মিলি মাঙ্গা" ইত্যাদি।

মধ্যবাংলায়—"বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোয়ালারা বন্দিল চরণ"; "তবে গরুড় পক্ষী সর্পে ধর্যা ধর্যা খাই।" "বড় বড় বানরের শকতি অপার।"

আধুনিক বাংলায়—"দেশে দেশে মোর ঘর আছে" ; 'পাকা পাকা আম' ; "ভাল ভাল বই" ; "ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার" ; "প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণ দর্শন।"

বিশেষণরূপে ব্যবহৃত বিশেষ্যের দ্বৈত-প্রয়োগেও বহুবচনের অর্থ সূচিত হয়। যেমন, 'আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার' ; "ঝুড়ি ঝুড়ি আম।"

৪। ষষ্ঠী বিভক্তিজাত '-রা,-এরা" কর্তৃকারকের বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুত্ববোধক -রা, -এরা বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায়।

যেমন, আহ্মারা, তোহ্মারা। ব্যক্তি নামে ও এই বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন, শ্যামেরা (শ্যাম এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন)।

পূর্ববঙ্গের উপভাষায় "-রা" বিভক্তি তির্যক কারকেও ব্যবহৃত হয়। যথা—আমরার (=আমাদের) ; তারার (=তাহাদিগের) ; তোমরাকে (=তোমাদিগকে)।

৫। গুলি, গুলা, গুলো প্রভৃতি বহুবচনের বিভক্তিগুলি সম্ভবত সংস্কৃত কুল শব্দ হইতে আসিয়াছে। এইগুলির প্রয়োগ ষোড়শ শতকেই পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "কুল" শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন, "গোঁপীকুলের তোহ্মে কৈলে অপমানে।" আধুনিক বাংলায়—মানুষগুলি, বামনগুলা, কথাগুলো।

৬। আধুনিক বাংলায় প্রাণিবাচক শব্দের পূর্বে বা পরে সব, সকল, আবলী, দল, সমূহ, গুচ্ছ, মণ্ডলী, মালা, গণ, শ্রেণী, বৃন্দ, রাজি, কুল, রাশি, পুঞ্জ, যূথ প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের পদ গঠিত হয়। যেমন, দেবগণ, মৃগযূথ, দৈত্যকুল, পণ্ডিত-মণ্ডলী, বীরবৃন্দ, দৃশ্যাবলী, মেঘমালা, ফুলদল, পক্ষিসমূহ, অলকগুচ্ছ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ও "গণ" শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন করা হয়—আভরণগণ, প্রণামগণ, বাদ্যগণ ; আবার নির্দেশক-প্রত্যয় "খানী" প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গেও বসে। যেমন, নাতিনে খানী=নাতিনীকে।

৭। কর্তৃকারক ব্যতীত তির্যক কারকের বহুবচনে দিগ, দিগকে, দিগে, দিকে, দিগের, দের প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। এই বিভক্তিগুলি সংস্কৃত "আদিক" হইতে আসিয়াছে। ফারসী দিগর (ইত্যাদি) শব্দের সঙ্গে ও এই বিভক্তিগুলির সম্বন্ধ থাকিতে পারে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে "দিগের" শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৮। সংখ্যা বাচক বিশেষণ শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়।

চর্যায়—"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—সাতগুটি বিন্ধ (=সাতটি বিঁধ) ; দুই লাখ যোজনে।

আধুনিক বাংলায় দশজন লোক, পঞ্চাশটি বাড়ী ইত্যাদি।

বিশেষণ

বাংলায় বিশেষণে সাধারণত কারক-বিভক্তি যুক্ত হয় না। তবে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হইলে কারক-বিভক্তি থাকে। যেমন,

প্রাচীন বাংলায়—"মূঢ়া হিঅহি" (=মূঢ়ের হৃদয়ে)

আধুনিক বাংলায়—"বন্যেরা বনে সুন্দর"; "আমি র'ব নিষ্ফলের হতাশের দলে"; "অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা"।

কখনো কখনো বিশেষ্যপদ বিশেষণের অর্থে প্রযুক্ত হয়।

যথা—কল্যাণ হস্ত; সংস্কৃত ব্যাকরণ; লৌহ মানব।

বিশেষণের তারতম্য—সংস্কৃতে দুইব্যক্তি বা বস্তুর একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে -তর, -ঈয়স্ প্রত্যয় এবং দুইএর বেশি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বুঝাইতে -তম, -ইষ্ঠ প্রত্যয় যুক্ত হয়। তৎসম শব্দবহুল সাধু ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতের রীতিতে বিশেষণের তারতম্য দেখানো হয়। কিন্তু খাঁটি বাংলায় বিশেষণের তারতম্য ব্যাপারে ইংরেজী বা সংস্কৃতের মত কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। অনেক সময় অনুসর্গের সাহায্যে পার্থক্য নির্দেশিত হইয়া থাকে। যথা—

প্রাচীন বাংলায়—"ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিণালী"।

মধ্য বাংলায়—"তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ বীর নাহিক ভুবনে।"

আধুনিক বাংলায়—"শ্যাম অপেক্ষা যদু বড়"; "তোমার চেয়ে সে বেশি বুদ্ধিমান।"

কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যয়গুলি বাংলায় প্রযুক্ত হইলেও সাধারণ বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়। যেমন, তুমি গুরুতর অন্যায় করিয়াছে। রমেশবাবু উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত। কনিষ্ঠ পুত্র বড় ডাক্তার।

দুইএর বেশি বস্তু বা ভাবের মধ্যে তারতম্য বুঝাইতে নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন, তীর্থের মধ্যে বারাণসী শ্রেষ্ঠ; বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ শ্রেষ্ঠ।

কখনও কখনও অনুসর্গ ছাড়াই নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—ফলের সেরা আম; তুমি সবার অধম।

তারতম্যের ভাবটি অধিকতর সূক্ষ্মভাবে প্রকাশের জন্য বিশেষণের পূর্বে বেশী, ঢেরবেশী, আরও বেশী, অনেক কম, সামান্য, একটু প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়।

যেমন, রাম তোমাপেক্ষা অনেক বেশী চতুর। তালের মিছরী ঢের বেশী উপকারী।

খাঁটি বাংলায় (এবং ইংরাজীতেও) বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না। যেমন, ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে।

ক্রিয়া বিশেষণ

বাংলায় ক্রিয়াবিশেষণে সাধারণত -এ, -এঁ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন,

প্রাচীন বাংলায়—"ভবণই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী"; 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহেঁ সম যুঝঅ' (নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে)।

আধুনিক বংংলায়—আস্তে চল ; ধীরে ধীরে বায়ু বহে।

ক্রিয়া বিশেষণে কখনও কখনও বিভক্তি থাকে না। যেমন,

শীঘ্র যাও ; তাড়াতাড়ি কাজটা করিয়া ফেল।

দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে "-ই", "-ইয়া" অন্তক অসমাপিকা যোগ করিয়া ও ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন,

প্রাচীন বাংলায়—"থির করি"; "দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ" (দৃঢ় করিয়া মহাসুখের পরিমাণ কর)।

আধুনিক বাংলায়—যত্ন করিয়া কাজ কর ; কান দিয়া শোন ; মিট্‌মিট্‌ করিয়া আলো জ্বলে।

সহসা, হঠাৎ, অকস্মাৎ প্রভৃতি অব্যয়ের সাহায্যে ও ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ প্রকাশ করা হয়।

কারক-বিভক্তি

সংস্কৃতের আটটি বিভক্তি প্রাকৃত স্তরে চার-পাঁচটিতে দাঁড়াইয়াছে। চতুর্থী ও পঞ্চমী অনেকস্থলে এক হইয়াছে। সম্বোধন পদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত প্রায়। অপভ্রংশ স্তরে কারক-বিভক্তির সংখ্যা আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় কারক ছয়টি—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ। আধুনিক বাংলায় কর্তা, কর্ম, করণ-অধিকরণ ও সম্বন্ধ এই চারিটি কারকের অস্তিত্ব মিলে।

শব্দের সঙ্গে অনুসর্গ (Post-position) যোগ করিয়া অন্যান্য কারকের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। বাংলায়-এ, -কে, -রে, -র, -এর, -তে, -এতে এই কয়টি বিভক্তির প্রয়োগ মিলে। তন্মধ্যে একমাত্র "-এ" বিভক্তি সংস্কৃত তৃতীয়ার একবচন "-এন" হইতে আসিয়াছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় কারক মাত্র দুটি—**কর্তৃকারক বা মুখ্যকারক (Nominative)** এবং **তির্যক বা গৌণ কারক (Oblique)**। কর্তৃকারকের মধ্যে পড়ে—প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি। ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অনুসর্গ জাত বিভক্তিগুলি গৌণকারকের পর্যায়ভুক্ত।

অ-কারান্ত শব্দে এই বিভক্তি প্রাকৃত স্তরে হয় লুপ্ত নতুবা "-এ" হইয়াছিল। বাংলায় ও এই বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে। যেমন,

পুত্রঃ>পুত্তে>*পুত্তি>পুত>পুৎ।

স্বার্থিক "ক" প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রথমার একবচন "স্" যুক্ত হইয়া "অকঃ" বিভক্তি হইল। এই "অকঃ" হইতে প্রাচ্য ভাষায় "কে" বিভক্তি হইয়াছে। এই "কে" বিভক্তি অপভ্রংশে "ই" বিভক্তিতে পরিণত হয়।

যথা—সর্বকঃ>সব্বকে>সব্বএ>সব্বই>সবে ; পুত্রকঃ>পুত্তকে>পুত্তএ>*পুত্তই >পুতে।

সংস্কৃতে তৃতীয়ার '-এন' বিভক্তি জাত '-এ' বাংলায় কর্তৃকারকে প্রযুক্ত '-এ' বিভক্তির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। যেমন, পুত্রেন>পুত্তেনং>পুত্তেঁ>পুতেঁ>পুতে। অতীত ও ভবিষ্যৎকালে কর্তৃবাচ্য ও কর্ম-ভাববাচ্য মিলিত হওয়ার ফলে প্রথমার সহিত তৃতীয়া বিভক্তি একীভূত হইয়াছে। যেমন,

কাহ্নে গাই—কৃষ্ণকঃ গায়তি, কৃষ্ণেন গায়িতম্; প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় প্রথমার একবচনে '-এ' বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে। যেমন, চর্যায় 'কুম্ভীরে খাই' ; 'ভাদে ভণই'।

মধ্য বাংলায়—'না ছাড়ে নান্দের পোএ' ; 'গাইল চণ্ডীদাসে' ; 'মূর্খে রচিল গীত।

আধুনিকে বাংলায় অনির্দিষ্ট কর্তা বুঝাইতে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন,

লোকে বলে, বাঘে খায় ; তাকে শিয়ালে খাইয়াছে ;

'পাগলে কী না বলে ছাগলে কী না খায়' ইত্যাদি।

বাংলায় '-এ' বিভক্তির রূপভেদ-য়, -য়ে। যেমন,

'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' ; 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে।' পূর্ববঙ্গ ও কামরূপের উপভাষায় কর্তায় 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

যথা—মায়ে ডাকে ; বাপে কইছে।

পশ্চিমবাংলার অঞ্চল বিশেষে '-এ' বিভক্তির সহিত সপ্তমীর '-ত' বিভক্তি যুক্ত হইয়া কর্তায় '-তে' বিভক্তি হয়। যেমন,

শুনিয়া লোকেতে হাসে ; কালো গরুতে ভালো দুধ দেয় ; প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে।'

কর্মকারক—সংস্কৃতের কর্মকারকের "ম্" বিভক্তি বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কর্মকারকে বিভক্তি শূন্যতা দেখা যায়।

প্রাচীন বাংলায়—"গুরু পুচ্ছিঅ" ; তান্তি বিকণঅ ডোম্বী।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—"চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাও।"

এইহেতু কর্তায় ও কর্মে কোন পার্থক্য থাকে না।

আধুনিক বাংলায় অনির্দিষ্ট মুখ্যকর্মে বিভক্তি বসে না। যেমন, সে ফল বিক্রী করে; শিশু চাঁদ দেখে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় গৌণকর্মে-ক<কৃতম্ বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। ওড়িয়াতে ও এই "-ক" বিভক্তির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

যথা—প্রাচীন বাংলায়—"মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা"; নাশক থাতী"; "ছান্ধক বান্ধ।"

মধ্য বাংলায়—"মোক বিবুধি লাগল"; রাধাক বুলিল নিঠুর বাণী"; আপণাক চিহ্নিআঁ।

ওড়িয়ায়—"পণ্ডিতমানঙ্ক বচন।"

সংস্কৃত কৃতঃ হইতে বাংলায় কর্মকারকে "কে" আসিয়াছে।

যথা, প্রাচীন বাংলায়—"বাহবকে পারই"

মধ্য বাংলায়—"কংসকে বুলিল কন্যা"; "মথুরাকে চলী ভলী।"

আধুনিক বাংলায়—জলকে চল।

ষষ্ঠীর "-র,-এর" বিভক্তির সহিত তৃতীয়া-সপ্তমীর "এ" বিভক্তি যুক্ত হইয়া প্রাচীন বাংলায় গৌণকর্মে "রে" বিভক্তি হইয়াছে।

যথা—প্রাচীন বাংলায়—"কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই"; "জিম জিম করিয়া করিণিরেঁ রিসঅ"।

মধ্য বাংলায়—"দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল"। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্মপদের বিভক্তিগুলি সংস্কৃতের মত জীবন্ত। "-এ,-তে" বিভক্তিযুক্ত সপ্তমীর পদ ও গৌণকর্মে ব্যবহৃত হইত। যেমন,—"কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ"।

করণ কারক ঃ—

করণ কারকের -এ,-এঁ বিভক্তি সং "এন" হইতে আসিয়াছে।

প্রাচীন বাংলায়—"আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা"; সাঁচে<সত্যেন; বেগেঁ<বেগেন; মাঁসে<মাংসেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—"নিজ মাসেঁ জগতের বৈরী"; স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে"।

আধুনিক বাংলায় হাতে<হাথে, হাথেঁ<হত্থেণং<হস্তেন। "পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে"। "রঞ্জিয়াছ পুষ্পে পুষ্পে ধরিত্রীর বিচিত্র অলক"। 'দিআঁ' অনুসর্গের সাহায্যে প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় তৃতীয়ার অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যথা—"দিআঁ চঞ্চালী" (চেঁচাড়ী দিয়া); "বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী।"

করণ ও অধিকরণের বিভক্তি এক হওয়ার জন্য উভয় বিভক্তিই মিশিয়া গিয়াছিল। সেজন্য অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত বিভক্তি "-ত, -তে" করণে ও ব্যবহৃত হয়। যেমন, "সুখ দুখেতেঁ" (প্রা-বা); "নিচিত মরিঅই" (প্রা-বা); "হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে" (ম-বা)।

"-এঁ, -এ' বিভক্তি দুইটির প্রয়োগ কর্ম ও সম্প্রদান কারকে পাওয়া যায়। যেমন, "সাখী করিব জালন্ধরী পাএ" (প্রা-বা);

মধ্যবাংলায়—"কান্দিয়া জানাইবোঁ কাঁশে"; "দেহ মোর সরস বচনে"; মানুষ হঞা জিনিবে তুমি হেন রাবণে"।

আধুনিক বাংলায়—"অন্ধজনে দেহ আলো"; "সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে"।

আধুনিক বাংলায় করণে নির্বিভক্তিক রূপ ও পাওয়া যায়। যথা—আজ তাহাকে চাবুক মারেন; তুমি লাঠি খেলতে জান।

সম্প্রদান কারক :—

আধুনিক বাংলায় দ্বিতীয়া বিভক্তির অনুরূপ -এ, -কে, -রে বিভক্তির সাহায্যে সম্প্রদানের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যেমন, "অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে"; "ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন"।

অধিকরণ কারক :—

প্রাচীন বাংলায় অধিকরণে "-হি" ও "-এ" বিভক্তি যুক্ত হইত। "হি" ইন্দো-ইউরোপীয় *-ধি, *-ভিস্ অথবা *ভিম্ হইতে আসিয়াছে। যেমন, ঘরহি<*ঘরধি; হিঅহি<*হৃদয়ধি, *হৃদয়ভিম্, হৃদয়েভিঃ।

"-এ" বিভক্তি সংস্কৃত "ক" প্রত্যয়ান্ত শব্দে "-ই" বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। যেমন, ঘরে<ঘরই<ঘরএ<গৃহকে; দিবসই<দিবসকে। এইরূপ হাটে, বাটে। প্রাচীন বাংলায় সপ্তমীর "-এ" বিভক্তি কখনও কখনও "-ই" রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, নিয়ড়ি=নিকটে। প্রাচীন বাংলায় ষষ্ঠীর "-র" বিভক্তির সহিত সপ্তমীর "এ" বিভক্তির মিশ্রণ দেখা যায়—"চান্দরে চান্দকান্তি জিম পরিহাসঅ"।

সপ্তমীর "-ত" বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে সংস্কৃত -অন্তঃ হইতে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় এই "-ত" বিভক্তির প্রচলন ছিল। যেমন, প্রাচীন বাংলায়—দুয়ারত (=দ্বারে), সাঙ্কমত (=সাঁকোতে), গঅণত<গগণান্তঃ। মধ্য বাংলায়—"বাটত সৃজিআঁ দান"; "সেজাত সুতিআঁ"।

এই "-ত" বিভক্তি বরেন্দ্রী ও পূর্ববঙ্গের উপভাষায় প্রচলিত আছে। যথা—ঘরত, বাড়ীত।

"-ত" বিভক্তির পূর্বে ও পশ্চাতে "এ, -এঁ" যুক্ত হইয়া অধিকরণে "-এতেঁ, -এতে" বিভক্তি ও যুক্ত হয়। যেমন, ঘরেতে, মেঝেতে, "সিসতে সিন্দুর"।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপাদানার্থে "তে, -তে" ব্যবহৃত হইয়াছে—"আহ্মাতে চাহসি বাঁশী"; "জলতে উঠিলী রাহী"।

হাজঙ্গ অঞ্চলের বাংলায় সপ্তমীতে "মি" প্রত্যয় পাওয়া যায়। ইহা সংস্কৃত মধ্য হইতে আসিয়াছে।

আধুনিক বাংলায় কখনও কখনও অধিকরণে সপ্তমীর চিহ্ন লুপ্ত থাকে। "রামদাস গুরু তার ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার ফিরিছেন যেন অন্নহীন।" আমি বাড়ী গেলাম; সে ঘর গেল।

সম্বন্ধ পদ—

সংস্কৃতের ষষ্ঠীর "স্য" বিভক্তি অন্যান্য নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার মত বাংলায়ও লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় ষষ্ঠী বিভক্তিতে "স্য" বিভক্তি জাত "-আ, -আহ" প্রত্যয় পাওয়া যায়। যথা, খণহ<ক্ষণস্য ; গঅণহ<গগনস্য ; মূঢ়া (<মূঢ়স্য) হিঅহি ; আই-অনুঅণা (<আদি-অনুৎপন্নস্য)।

সর্বনামের তির্যক কারকে "-আ, -আহ" রক্ষিত হইয়াছে। যথা—তাহ, তাহা, তাহার<তস্য+কার।

বাংলার নিজস্ব ষষ্ঠী বিভক্তি হইতেছে "-র"<কর, "-আর"<কার ও "-এর" <কের। কেহ কেহ "-র, -এর" বিভক্তিগুলি সংস্কৃত কার্য হইত আসিয়াছে বলিয়া মনে করেন—কার্য>কাইর>কের>এর>র।

কর, কের, কার প্রভৃতি বিভক্তিসূচক অনুসর্গগুলি অপভ্রংশ যুগে মূল শব্দ হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করিত। এই বিভক্তিগুলি বাংলায় কতকগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন, মধ্য বাংলায়—রূপাকার (=রূপার); আজিকার<আজকের ; নদীকের ; আপনকার ; এখনকার। "কের" বিভক্তির প্রয়োগ রাজস্থানী ও জিপ্‌সী ভাষায় ও রহিয়াছে। ষষ্ঠীর-"র" বিভক্তি প্রাচ্য ভাষাসমূহ ও রাজস্থানীতে ও ব্যবহৃত হয়। সিন্ধী ভাষায় ষষ্ঠীর "-জো, -জী" সংস্কৃত কার্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ষষ্ঠীতে "-ক" বিভক্তির প্রয়োগ প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন, চর্যায়—ছান্দক বান্ধা (=ছন্দের) ; সমাধিক পাট ; আপন কাজক লাগি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—কাজক লাগি ; যমুনাক তীরে ; জরমক তরে। "-র, -এর" বিভক্তির ব্যবহার বাংলার প্রাচীন যুগ হইতেই আরম্ভ হয়। যেমন, চর্যায়—রুখের তেন্তলি ; তোহোর অন্তরে।

প্রাচীন বাংলায় সম্বন্ধপদ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গে "রি" প্রত্যয় যুক্ত হইত। যথা—কাহরি নাবেঁ (=কাহার নৌকায়) ; কাহেরি শঙ্কা। সংস্কৃতের ষষ্ঠী বিভক্তির কিছু চিহ্ন অপভ্রংশের মধ্য দিয়া প্রাচীন বাংলায় আসিয়াছে—গঅণহ< গগনস্য ; খনহ<ক্ষণস্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লজ্জার্থক বা নিমিত্তার্থক "লাগিয়া" শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধে -ত<অন্তঃ বিভক্তির প্রয়োগ ও দেখা যায়।

যেমন—নেহাত' লাগী ; বাবত' হএ লাজ।

কা>গা, গো বিভক্তি পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় সর্বনামের ষষ্ঠীর বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—আমাগো, তোমাগো, তাগো ইত্যাদি।

অপাদান কারক :—

বাংলায় অপাদানের অর্থে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ নাই। থেকে, হইতে, অপেক্ষা প্রভৃতি অনুসর্গের সাহায্যে অপাদানের অর্থ প্রকাশিত হয়। প্রাচীন বাংলায় অপভ্রংশের "হু, হুঁ" বিভক্তির নিদর্শন ক্বচিৎ পাওয়া যায়। যেমন, খেপহুঁ (=ক্ষেপাৎ) ; রঅণহু (=রত্নাৎ)। বাংলার পরবর্তী স্তরে এই "হু" বিভক্তি রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ওড়িয়ায় ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন, আজহুঁ, কৃষ্ণহুঁ ইত্যাদি। অপভ্রংশের -উ<-ও বিভক্তি ওড়িয়ায় চলিত আছে। যথা—মুখু, শঙ্কটু।

ষষ্ঠীর "-র" বিভক্তির সহিত "উ" যুক্ত হইয়া ওড়িয়ায় "রু" বিভক্তি হইয়াছে। যেমন—"হৃদয়রু।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় তৃতীয়, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি পঞ্চমীয় অর্থে ব্যবহৃত হইত।

যেমন, চর্যায়—ডোম্বিত আগলি ; দশদিশেঁ (=দশ দিক হইতে)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—"মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী" ; "আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে"।

নিম্নে বাংলার বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলি নির্দেশিত হইল।

কারক	বিভক্তি
কর্তৃকারক	শূন্য বিভক্তি, -এ (-য়ে, য়), -তে, -এতে
কর্মকারক ও সম্প্রদান	-এ (-য়ে, -য়), -ক, -কে, -রে, (-এরে)
করণ কারক ও অধিকরণ	-এ (-য়ে, -য়), -ত, -তে (-এতে)
সম্বন্ধ	-র, -এর, কর।

"-এ" বিভক্তির প্রয়োগ সমস্ত কারকেই পাওয়া যায়।

অনুসর্গ (Post-position)

অনুসর্গগুলি দ্বারা বিভক্তির কার্য নিষ্পন্ন হয়। অনু অর্থাৎ অন্য পদের পরে বসে বলিয়া ইহাদের নাম অনুসর্গ বা পরসর্গ। কর্তা ও মুখ্য কর্ম ছাড়া তির্যক কারকের অর্থে বিবিধ অনুসর্গ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। অনুসর্গ সাধারণত প্রাতিপদিকের পরে কিংবা বিভক্তিযুক্ত পদের পরে বসে। প্রায়ই সম্বন্ধ পদের পরে অনুসর্গ বসে। যথা—আমার সঙ্গে; "সকলের তরে সকলে আমরা"। দ্বিতীয় বিভক্তির পরেও অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যথা—আমাকে দিয়া একাজ সম্ভব হইবে না। মধ্যবাংলায় দুই একটি ক্ষেত্রে অধিকরণ পদের পরেও অনুসর্গের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, "গোঠে হৈতেঁ আসি আক্ষি"। ইংরেজীতে বিভক্তি-দ্যোতক কর্ম-প্রবচনীয় অব্যয় বা উপসর্গ (Preposition) শব্দের পূর্বে বসে।

বাংলায় অনুসর্গগুলিকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(১) নাম অনুসর্গ (Nominal Post-position)

(২) অসমাপিকা অনুসর্গ (Participial Post-position)

নাম অনুসর্গ—

(ক) (তৎসম—)

অন্তর (চতুর্থী—গৌণকর্ম)—"তোহোর অন্তরে" (প্রা-বা); "দানের আন্তরে (ম-বা)।

অপেক্ষা—তোমাপেক্ষা সে কাজে নিপুণ।

অর্থ—(চতুর্থী)—"ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই" (প্রা-বা)।

কর্তৃক—(তৃতীয়া)—শিশু কর্তৃক চাঁদ দৃষ্ট হইল।

কারণ—(চতুর্থী)—"কংশের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে" (ম-বা)।

গোচর—(চতুর্থী)—বিচারকের গোচরে এই অভিযোগটি আনা হইল।

চরণ—(চতুর্থী)—শিষ্য গুরুর চরণে ইহা নিবেদন করিল।

জন্য—(চতুর্থী)—তাহার জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

দ্বারা—(তৃতীয়া)—তোমার দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হইবে না।

দিক, দিশা—(চতুর্থী)—"কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোন দিশে" (ম-বা)

নিকট—(চতুর্থী-পঞ্চমী)—ছাত্র শিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেছে।

নিমিত্ত—(চতুর্থী)—দানের নিমিত্ত।

বিদ্যমান—(গৌণকর্ম-চতুর্থ)—"জিজ্ঞাসিল দামোদর নন্দ-বিদ্যমান"

বিনা—(তৃতীয়া)—"বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হোল মোর শিরে।"

প্রতি—(প্রাতিপদিক, ষষ্ঠী)—"একবার আজ্ঞা প্রতি দয়া ধর মনে" (ম-বা)

গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিবে।

মুখ—(তৃতীয়া-পঞ্চমী)—"শিশুমুখে পরবত টালী" (ম-বা)

সঙ্গ—(তৃতীয়া)—"ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো" (প্র-বা)

"তভোঁ তোর সঙ্গে রাধা নাহী ছাড়ে কাহ্ন।"

সকাশ—(চতুর্থী-পঞ্চমী)—গুরুদেবের সকাশে ইহা নিবেদন কর।

সদন—(চতুর্থী-পঞ্চমী)—"গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গ সদন"

সন্নিধান—(চতুর্থী-পঞ্চমী-সপ্তমী)—"তব সন্নিধানে এই মোর নিবেদন"

সমভিব্যাহার—(তৃতীয়া)—রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনে গেলেন।

সমীপ—(চতুর্থী-পঞ্চমী-সপ্তমী)—গুরুদেবের সমীপে গমন কর।

সহিত—(তৃতীয়া)—"ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিখ বাণী" (ম-বা)।

(খ) (তদ্ভব)

আগে<অগ্‌গ<অগ্র (চতুর্থী-সপ্তমী)

"আয়িলা কংশের আগক নারদ মুনী" (ম-বা)

কাছে<কক্‌খ<কক্ষ (চতুর্থী-পঞ্চমী)

"তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন"

চেয়ে< √চাহ্‌ (পঞ্চমী)—এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।

ছাড়া< √ছাড়্‌ (তৃতীয়া)—আমা ছাড়া তোমার গতি নাই।

ঠাঁই<স্থানিক (চতুর্থী-সপ্তমী)

"কেহে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাঁই।"

তরে<অন্তরে (চতুর্থী)—"তোহোর অন্তরে" (প্রা-বা)

থানে, থানত<স্থান (সপ্তমী)

—"সকল কহিল তত্ত্ব বসুদেব থানে।" (ম-বা)

দিয়া (তৃতীয়া)—"বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী।" (ম-বা)

নীচে (সপ্তমী)—প্রদীপের নীচে অন্ধকার।

পর<উপরি (সপ্তমী) —"স্তনের উপর"

পাছে<পশ্চাৎ—তাহার পাছে ঘুরিয়া কি ফল হইবে ?

পানে<প্রজ্ঞা, পন্ন (সপ্তমী)—"আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও"

পাশে<পার্শ্ব (সপ্তমী)—"কাহ্নের পাশে।"

বই<ব্যতীত (তৃতীয়া)—"সত্য বই মিথ্যা বলিবে না"

বিনু<বিধুন * বিভূন (তৃতীয়া)—"তঁই বিনু" (প্রা-বা); "বিনী দানে না এড়িব আজি তোহ্মা কাহ্ন" (ম-বা)।

বিহনে<বিহীন—"চূন বিহনে যে তাম্বুল তিতা"।

ভিতর<অভ্যন্তর (সপ্তমী)—ঘরের ভিতরে।

ভীত<ভিত্তি—(চতুর্থ-সপ্তমী)—"চারী ভিত চাহি রাধা বুইল বচনে।"

মাঝে<মজ্‌ঝ<মধ্য (সপ্তমী)—"বন মাঝে পাইল তরাসে" (ম-বা)।

হইতে<ভবন্ত্, সন্ত্ (পঞ্চমী) "এবে হতেঁ দৈবকীঞঁ যত গর্ব ধরিব (ম-বা)।

সনে<সন্ন (তৃতীয়া) "আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস" (ম-বা)

সাথে<সার্থ (তৃতীয়া)—তোমার সাথে আমি কোথাও যাইব না।

হাত<হাথ<হস্ত (তৃতীয়-চতুর্থী)—আমার হাতে তোমার রক্ষা নাই।

বিদেশী (ফারসী)

বাদ (পঞ্চমী)—এক ঘণ্টা বাদে গাড়ী পৌঁছিবে।

বরাবর (চতুর্থী-গৌর্ণ কর্ম)—হাকিমের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করা হইল।

হুজুর—আসামী বিচারকের হুজুরে দাঁড়াইল।

অসমাপিকা অনুসর্গ (Participial Post-position)

করিয়া< √কর্—"থির করি" (প্রা-বা)

গিয়া< √গম্—"কহি গই পইঠা" (প্রা-বা); সে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

চাহিয়া < √চাহ্—তোমার চাইতে শিশির বেশী বুদ্ধিমান্।

থাকিয়া< √থাক্—(পঞ্চমী) "কংসকে বুলিলে কন্যা আকাশে থাকিআঁ"। (ম-বা)।
দিয়া<√দা (তৃতীয়া)—'বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী' (ম-বা)।
বলিয়া<√বল্ (তৃতীয়া)—ধনী বলিয়া তোমার কথা শুনিব না।
লাগিয়া<√লগ্ (চতুর্থী)—'নেহাত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী' (ম-বা)
লইয়া< √লহ্ (দ্বিতীয়া-তৃতীয়া) "যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে' (ম-বা)।
হইতে<ভবন্ত্, সন্ত্ (পঞ্চমী) 'এবে হতেঁ দৈবকীঞঁ যত গর্ব ধরিবে'। (ম-বা)।

সর্ব্বনাম

পুরুষবাচক বা ব্যক্তি-বাচক (Personal) ও নির্দেশক বা নির্ণয়সূচক (Demonstrative) এই দুই শ্রেণীতে সর্ব্বনামের বিভাগ করা হয়।

পুরুষবাচক সর্বনাম দুইটি—অস্মদ্ ও যুষ্মদ্। ইহাদের লিঙ্গ ভেদ নাই এবং বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয় না। নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গভেদ আছে এবং এগুলি বিশেষণ রূপে ও প্রযুক্ত হয়। সাধারণ সম্ভ্রমসূচক অর্থে ইহাদের পৃথক রূপ ও রহিয়াছে। গৌরবে মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের বিভিন্ন রূপগুলি বাংলার বৈশিষ্ট্য। যেমন—আপনি, তিনি, ইনি, উনি।

"অস্মদ্" শব্দ—

উত্তম পুরুষের রূপে বাংলায় প্রাতিপদিক তিনটি—"ম", "মো" ও 'আমা"। তির্যক কারকের পদগুলি ষষ্ঠ্যন্ত পদ 'মো' এবং "আমা" হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আদিতে "ম", "মো" একবচনের এবং "আমা" বহুবচনের প্রাতিপদি করূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু প্রাচীন বাংলার শেষের দিকেই "আমা" একবচনে ও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বাংলায় প্রচলিত উত্তম পুরুষের পদের ব্যুৎপত্তি :—

হাঁউ, হঁউ—প্রাচীন বাংলায় কর্তৃকারকের পদ আধুনিক বাংলায় লুপ্ত।

সং অহকম্ (=অহম্)>হকং (প্রা)>হউ (অপ)>হাঁউ, হঁউ (প্রা-বা)>হোঁ (ম-বা)।

ম, মই—ময়া>মএ (প্রা)>মই (অপ)>ম, মই ; প্রাচীন বাংলায় তৃতীয়ার অর্থ যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। যেমন, "স্বপনে মই দেখিল তিহুবন শূন" ; "তরঙ্গ ম মুনিআ"।

অসমীয়ায় মই, ওড়িয়ায় মূঁ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

মুই, মই, মুঞি, মোঞি—

* ময়েন>মএঁ (অপ)>মইঁ, মই (প্রা-বা)>মুঞি, মোঞি (ম-বা)>মুই (কর্তৃকারকে একবচনে প্রযুক্ত)। মুই শব্দের প্রয়োগ আঞ্চলিক ভাষায় লক্ষণীয়।

মো—

মম>মঞো (অপ)>মো (প্রা-বা)>মো (ম-বা)।

কর্তৃকারকে প্রযুক্ত—"মো যদি জানিতাঙ"

ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত—"মো সম"

প্রাচীন বাংলার যুগ হইতেই "মো" শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিয়া তির্যক কারকের পদ গঠিত হইয়াছিল।

যেমন—দ্বিতীয়া-চতুর্থী—মোক, মোকে; মোরে।

তৃতীয়া— মোতেঁ (ম-বা)

ষষ্ঠী — মোর, মোরি

আধুনিক বাংলায় মোর, মোদের ইত্যাদি পদ কাব্যে ব্যবহৃত হয়।

মোহ—প্রাচীন বাংলায় প্রাতিপদিকরূপে পাওয়া যায়। *মভ্যম্ (=মহ্যম্)>মব্‌ভ> মহ, মোহ। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় "মোহো" এই প্রাতিপদিকের (বিভক্তিহীন শব্দ) সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি "র" যুক্ত হইয়া "মোহোর" পদ সৃষ্ট হইয়াছে।

ব্রজবুলিতে মঝু, মহু (ষষ্ঠ্যন্ত পদ) পাওয়া যায়।

মহ্যম্>মজ্‌ ঝং>মজঝঁ>মঝু ; *মভ্যম্>মব্‌ভং>মহ>মহু।

আমি—ইহা বৈদিক 'অস্মে' (চতুর্থী-সপ্তমী) অথবা তৃতীয়ার বহুবচন সংস্কৃত 'অস্মাভিঃ' হইতে আসিয়াছে।

অস্মে>অম্হে (প্রা)>অম্হে (প্রা-বা)>অম্হি>আহ্মি (ম-বা)>আমি।

অস্মাভিঃ>অম্হাহি (প্রা)>অম্হহি (অপ)>অম্হই>অম্হে (প্রা-বা)>অম্হি >আহ্মে, আহ্মি, আমি (ম-বা)>আমি।

আমা—এই প্রাতিপদিক সংস্কৃত ষষ্ঠীর বহুবচন 'অস্মাকম্' অথবা পঞ্চমীর একবচনের পদ 'অস্মৎ' হইতে আসিয়াছে।

অস্মাকম্>অম্হাকং (প্রা)>অম্হাআঁ (অপ)>*অম্হা>আহ্মা (ম-বা) ; অস্মৎ> অম্হং (প্রা)>*আম্হ>আহ্মা>আমা>আমা।

মধ্যযুগের বাংলায় আহ্মা, আমা কর্তৃকারকের বহুবচনে ও তির্যক কারকের প্রাতি-পদিকরূপে পরিণত হইয়াছে।

যথা, কর্তার বহুবচন—আহ্মারা (ম-বা)>আমরা

কর্মকারক —আহ্মাক, আহ্মাকে>আমাকে ; আহ্মারে>আমারে

অপাদান—অধিকরণ :—আহ্মাত, আহ্মাতে>আমাতে।

সম্বন্ধপদ—আহ্মার>আমার।

হাম—অসমীয়া ব্রজবুলীতে এই প্রাতিপদিকের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ইহা অহম্‌জাত 'হ' এর সহিত 'অস্ম' হইতে প্রাপ্ত 'আম' এর সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

অহম্‌>হ+অস্ম>আম=হ+আম=হাম

দ্বিতীয়া—চতুর্থী— হামাকু, হামাকে

ষষ্ঠী— হামারি, হামাকেরি

মধ্যম পুরুষ (Second Person)

যুষ্মদ্‌ শব্দ—

মধ্যমপুরুষের রূপে প্রাতিপদিক দুইটি পাই—'তো', 'তোমা'। প্রাচীন যুগের বাংলায় 'তো' তুচ্ছার্থক এবং 'তোমা' সম্ভ্রমার্থক প্রাতিপদিক ছিল। মূলত বহুবচন হইলেও 'তোমা' একবচনে প্রযুক্ত হইত। আধুনিক বাংলায় তুমি এবং তোমা সম্ভ্রমসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তৎপরিবর্তে নূতন সম্ভ্রমার্থক পদ আপনি, আপনা<আত্মন্‌ সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলায় **মধ্যমপুরুষের পদের ব্যুৎপত্তি ঃ—তু**—সং ত্বম্‌>তুঅং (প্রা)> তু (প্রা-বা)>তু (আ-বা)। প্রাচীন বাংলায় 'তু' কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হইত।

যথা—'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী'।

আধুনিক বাংলায় 'তু' শব্দের প্রয়োগ আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় দেখা যায়।

তুই—ত্বয়া (সং—তৃতীয়ার একবচন)>তএ, তুএ (প্রা)>তই, তোএ (অপ, প্রা-বা)>তুই।

প্রাচীন বাংলায়—'থাকিব তই' (=স্থাতব্যং ত্বয়া)। আধুনিক বাংলায় 'তুই' শব্দের তুচ্ছার্থে প্রয়োগ সর্বত্রই দেখা যায়।

তইঁ

*ত্বয়েন (=ত্বয়া)>তএ, তুএ (প্রা)>তই (প্রা-বা)>তোঁএ, তোএঁ, তুঞি (ম-বা)।

তো—তব (সং)>তো (প্রা)>তো (অপ, প্রা-বা)>তো (ম-বা)।

যেমন, প্রাচীন বাংলায় ঃ—প্রথমা—সুণ হরিণা তো।

দ্বিতীয়া—হালো ডোম্বী তো পুছমি সদ্‌ভাবে।

ষষ্ঠী—তো মুহ।

মধ্য বাংলায় ঃ—প্রথমা—তো নাসিলি দুই লোকে।

মধ্যযুগের বাংলায় 'তো' তির্যক কারকের প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—তোক, তোকে, তোর, তোরেঁ, তোত, তোতে।

তুমি—*তুষ্মে (=বৈদিক যুষ্মে)>তুম্হে>তুম্হি>তুমি ; অথবা *তুষ্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ) >তুম্হাহি (প্রা)>তুম্হহি (অপ)>তুম্হে (প্র-বা)>তুহ্মে, তুহ্মি, তুহিঁ>তুমি (ম-বা)>তুমি।

আপনি—**(আত্মবাচক সর্বনাম, Reflexive Pronoun)** আত্মন্>আত্মা> অপ্পা (অৎপা, গির্নার অনুশাসন)>আপ ; আপ+ন<নাম্ (ষষ্ঠীর বহুবচন)=আপন্ ; আপন্+ই=আপনি (তিনি, ইনি শব্দের সাদৃশ্যে প্রথমার একবচনে 'ই')।

তোমা—*তুষ্মাকম্ (=যুষ্মাকম্)>তুম্হাকং (প্রা)>তুম্হং (অপ)>তোম্হা (প্রা -বা)>তোহ্মা, তোহ্মা>তোমা।

মধ্য বাংলায় বিভিন্ন কারকের অর্থে 'তোহ্মা' র প্রয়োগ—

কর্তা—এক তোহ্মা গতী।

কর্ম—হঅঁা চাহে তোহ্মা বনমালী।

ষষ্ঠী—তোহ্মা সমে হৈল দরশনে।

প্রথমার বহুবচনে ও তির্যক কারকে 'তোহ্মা'-র প্রয়োগ—

প্রথমা (বহুবচন)—তোহ্মারা, তোমরা।

দ্বিতীয়া—তোহ্মাক, তোহ্মাকে, তোহ্মারে, তোমাকে।

পঞ্চমী—তোহ্মাত, তোহ্মাতে, তোমাতে।

ষষ্ঠি—তোহ্মার, তোমার।

তোহোর<তুভ্যম্+র (ষষ্ঠী) ; যেমন, তোহোর অন্তরে।

"অস্মদ্" শব্দের বাংলায় রূপান্তর

একবচন

	সংস্কৃত	প্রাকৃত	প্রা-বা	আ-বা
কর্তা—	অহম্	অহকং, হকং, হউং	হাঁউ, হঁউ	লুপ্ত
করণ—	ময়া	মএ, মই	মই, মই	মুই
সম্বন্ধ—	মম	মম	মো	মো

বহুবচন

	সংস্কৃত	প্রাকৃত	প্রা-বা	আ-বা
কর্তা—	অস্মে (বৈদিক)	অম্হে	আহ্মি, আম্হি	আমি
করণ—	অস্মাভিঃ	অম্হাহি, অম্হহি	আহ্মে, আম্হে	আমি
প্রাতিপদিকরূপ—	অস্ম	অম্হ	আহ্মা, আম্হা	আমা

"যুষ্মদ্" শব্দের বাংলায় রূপান্তর

	সংস্কৃত	প্রাকৃত	প্রা-বা	আ-বা
একবচন	ত্বং, ত্বয়া	তএ, তুএ	তই	তুই (তু)
বহুবচন	*তুষ্মে (=যুষ্মে বৈদিক)	তুম্হে, তুম্হহি	তুহ্মি, তুহ্মে	তুমি
	*তুষ্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ)	তুম্হাহি তুম্হহি	তুম্হে	তুমি

নির্দেশক সর্বনাম

(১) **সাধারণ নির্দেশক**—প্রথম পুরুষ (Third Person)

নির্দেশক সর্বনামে লিঙ্গভেদ আছে। মনুষ্যবাচক সর্বনামের দুইটি করিয়া রূপ আছে—(ক) সাধারণ—সে ; (খ) তিনি (সম্ভ্রমসূচক)

প্রথম পুরুষ সর্বনামের ব্যুৎপত্তি

সে—সঃ, সকঃ>সো, সে (প্রা)>সু, সউ (অপ)>সে। ওড়িয়ায় "সে", অসমীয়াতে "সি" এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষায় "হি"<সি পাওয়া যায়। মধ্য বাংলায় নির্দেশক "গুলা, গুলি" প্রত্যয়যুক্ত বহুবচনের পদ দৃষ্ট হয়। যথা—সেগুলা, সেগুলি প্রাচীন বাংলায় "সে" শব্দের বহুবচনে ছিল "তে"।

যেমন, "যে যে আইলা, তে তে গেলা"।

তিনি—*তেনাম্ (=তেষাম্, ষষ্ঠীর বহুবচন)>তেণ্হং, তিণ্হং (প্রা) >তিনি। উত্তর-পূর্ববঙ্গে সম্ভ্রমার্থে তাইন<তিনি ব্যবহৃত হয়।

পূর্ববঙ্গের উপভাষায় "তিনি" প্রাতিপাদিক রূপে ব্যবহৃত হয়।

যথা—তিনিরা, তিনির।

তাঁহা (প্রাতিপাদিক)—*তানাম্ (=তাসাম্)>তাঁহা।

তা, তাহ—*তাস (=তস্য)>তাহ (প্রা)>তাহ (অপ)>তা, তাহা।

প্রাতিপদিক রূপে প্রয়োগ—তারা, তাহারা (কর্তার বহুবচন)

তির্যক কারকে ব্যবহৃত—তাক, তাকে, তার, তারে, তাতে, তাহার, তাহাকে।

তছু (ব্রজবুলিতে প্রাপ্ত)—তস্য>তস্স (অপ)>তসু (প্রা-বা)>তছু

তহি, তহিঁ, (ম-বা)—* তভিম্ (=তত্র)>তহিং (প্রা)>তাহঁ (অপ, প্রা-বা) >তহি, তাহঁ।

(২) **নিকট-নির্দেশক বা প্রত্যক্ষ-নির্ণয়-সূচক সর্বনাম (Near or Proximate Demonstrative)**

প্রাতিপদিক—এ, ই, এই, এহা, ইহা, (সাধারণ)
ইনি, ইহাঁ (সম্ভ্রমসূচক)

এ—এতং>এদং (প্রা)>এঅ (অপ)>এ (প্রা-বা)>এ (ম-বা, আ-বা)।

ই—ইদম্>ইদং>ইঅ (ম-বা)>ই (আ-বা)।

এই—এভিঃ>এহি (প্রা)>এহি (ম-বা)>এই।

এহ—এষঃ>এসো, এসে, এস (প্রা)>এহ, এহু (অপ)>এহ, এহু (প্রা-বা)> এহ (ম-বা)।

এহা, ইহা—এতস্য>এহা (ইহা)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "এহি" (এ+নিশ্চয়ার্থক "হি" যোগে) পদ পাওয়া যায়।

ইনি—এষাম্ (ষষ্ঠীর বহুবচন)>এণ্হং (প্রা)>এণ, ইণ (অপ)>এনা>ইনি।

(৩) **দূর-নির্দেশক বা পরোক্ষ নির্ণয়-সূচক সর্বনাম (Far or Remote Demonstrative)**

প্রাতিপদিক—ও, উ, ওহা, উহা (সাধারণ)
ওঁ, উঁ, ওঁহা, উঁহা (সম্ভ্রমসূচক)

ও—* অবঃ (=অসৌ)>ও (অপ)>ও

ওহা, উহা—* অবস্য (তুলনীয়—প্রাচীন পারসীক অবহা)>ওহ (অপ)>ওহা (ম-বা)>ওহা, উহা।

সম্ভ্রমসূচক "উনি" সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বহুবচন "এষাম্" হইতে আসিয়াছে।

(৪) **সম্বন্ধ-নির্দেশক বা সংযোগ-বাচক (Relative Pronoum)**

যে, জে—সং যঃ, যকঃ, যৎ>জো, জএ; জং (প্রা)>জু, জি, জং (অপ) >জে, জ (প্রা-বা)>জে (ম-বা)।

জেঁ—সং যেন>জেণং (প্রা)>জেঁণ (অপ)>জেঁ (প্রা-বা)>জে (ম-বা)> যে (আ-বা)।

প্রাতিপদিক—যাহা, যাঁহা (সম্ভ্রমসূচক)

যাহা—* যাস (=যস্য)>জাহ (প্রা-বা)>যাহা।

যছু (ব্রজবুলি)—যস্য>জস্স (প্রা)>জস্‌সু, জাসু (অপ)>জসু (প্রা-বা)>যছু

যিনি—যেষাম>জেণ্হং (প্রা)>যিনি।

(৫) অনিশ্চয়-সূচক সর্বনাম (Indefinite Pronoun)

কে, কেউ, কেই, কোন, কিছু

প্রাতিপদিক—কি, কাহা।

কে—সং কঃ>কে, কো (প্রা)>কে, কি, কএ, কও (অপ)>কো, কে (প্রা-বা) >কে (ম-বা, আ-বা)।

কেউ—কয়স্য (বৈদিক)>কেহ (অপ)>কেহো (প্রা-বা)>কেহ, কেউ (ম-বা, আ-বা) (অনির্দিষ্ট কর্তা)

কেই—কঃঅপি>কোঽপি>কোবি, কেবি (প্রা)>কোই, কেই (প্রা-বা)>কেই (অনির্দিষ্ট কর্তা)

কোন—* কমণঃ>কবণ (অপ)>কমন, কোন (ম-বা)>কোন (অনির্দিষ্ট কর্তা, প্রশ্নবোধক)

কিছু—* কিশ্চ (=কিঞ্চ)>কিচ্ছ (অপ)>কিছ, কিছু।

কি—কিম্>কিং (প্রা, অপ)>কি

কি, কে মধ্য বাংলায় প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত।

কা—* কাস (=কস্য)>কাহ (প্রা, অপ)>কা (প্রা-বা, ম-বা)>কা (আ-বা)।

"কা" প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত—যেমন—কার, কারে, কাকে, কাএ, কাত ইত্যাদি।

কাহা—* কাস>কাহ>কাহা।

প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহৃত—কাহার, কাহারে, কাহাকে কাহাতে।

কিস—* কিষ্য (=কস্য)>কিস্স (প্রা, অপ)>কীস (প্রা-বা)>কিস।

প্রাতিপদিক—কিসক, কিসকে, কিসে, কিসের, কিসেরে ইত্যাদি।

কই—* কভিম্ (=কুত্র)>কহিং, কাহিং (প্রা, অপ)>কহি, কাহি, কাঁহি, (প্রা-বা)>কহি (ম-বা)>কই।

প্রাতিপদিক—কহির (=কোথাকার)

কিনা—কেন, * কিনা (তৃতীয়ার একবচন)>কেণং, কিণং>কেণ, কিণ (অপ)> কেঁ, কিণ>কিনা।

সর্বনাম জাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ

যেমন, তেমন, এমন, কেমন, অমন প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত 'মন্ত্' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন।

যেমন—* যেমন্ত্ * যিমন্ত্>জেম্, জিম (অপ)>জেঁব, জিম (প্রা-বা)> যেমন (ম-বা, আ-বা)।

তেমন—* তেমন্ত্, তিমন্ত্>তেম, তিম (অপ)>তিম (প্রা-বা)>তেমন।

এমন—* এমন্ত>এম (অপ)>এমন।

কেমন—*কেমন্ত>কেমন।

অমন—* অবমন্ত>অমন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংস্কৃত 'দৃশ' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন।

যাই>জাদি<যাদৃক ; তাই<তাদি<তাদৃক।

এহেন<*এতাদৃশন ; কেহেন, কৈছন, (ব্রজবুলি)<কইসা, কইসেঁ<কইসণ (প্রা-বা)<* কাদৃশন।

অইস, অইসন, ঐছন<*অবাদৃশন।

জৈছন (ব্রজবুলি)<জেহেণ (ম-বা)<জইসন, জইস, জইসা (প্রা-বা)<জইসন (অপ)<*যাদশন।

তৈছন<তেহেন (ম-বা)<তইসা, তইসন (প্রা-বা)<* তাদৃশন।

পদাশ্রিত নির্দেশক

(Enclitic Definitives, বা Numeratives)

অন্যান্য নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার মত বাংলায় ও কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশ বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত যুক্ত হইয়া ইহাদের সংখ্যা, পরিমাণ আকার প্রভৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

এইগুলিকে বলা হয় নির্দেশক। যেমন—খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি, টা, টি, টু প্রভৃতি।

(ক) খান, খানা, খানি<খণ্ড—দুইখানা হাত ; কাণ্ডখানা দেখ ; 'পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি'।

(খ) গাছ, গাছা<গচ্ছ (প্রা)—মালা গাছি, হার গাছা।

(গ) গোটা, গুটি, গুটী<গুটিকা—গোটা দুই টাকা। বাঁশী গুটি' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

(ঘ) জন—পাঁচ জনে কাজ কর।

(ঙ) টা, টি, টী<বৃত্ত, বৃত্তিকা

টা, টি যথাক্রমে গোটা, গুটি হইতেও আসিতে পারে। যেমন, 'শ্যামাটা ভারি দুষ্টু' ; তখন রাত বারোটা ; বেশ ছেলেটি ; একটু জল দাও।

(চ) টু<ট+উ—একটু দুধ দাও।

(ছ) থান<স্থান—দুই থান কাপড়।

(জ) তা—তাহ্ (ফারসী)—পাঁচ তা কাগজ।

বাংলায় এক, একটি ইত্যাদি শব্দ-দ্বারা অনির্দিষ্ট সংখ্যা (Indefinite article) প্রকাশ করা হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ধাতু

বৈয়াকরণগণের মতে সংস্কৃতে প্রায় ২০০০ ধাতু আছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ৭০০-র মত সিদ্ধ ধাতুর প্রয়োগ রহিয়াছে। বাংলা ভাষায় সিদ্ধ ও সাধিত ধাতুর সংখ্যা ১৫০০-র কাছাকাছি হইবে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলির ব্যবহার আধুনিক বাংলায় নাই।

বাংলার ধাতুগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচার করিলে ইহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) সিদ্ধধাতু (Primary roots) (২) সাধিত ধাতু (Derivative or Secondary roots) (৩) সংযোগমূলক ধাতু (Compounded roots)।

(১) যে সকল ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ তাহাদিগকে সিদ্ধ ধাতু বলে।

যেমন—দেখ্, শুন্, গর্জ্, আছ্, কর্, কাঁদ্, যা, লহ্, হ্ ইত্যাদি।

বাংলায় প্রায় ২০০ এর মত ধাতু আছে, যেগুলি সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে।

(ক) যেমন—কর (<কৃ); কাঁপ (<কম্প্); খেল (<খেল্); চল (<চল্); গিল (<গিল্); চর (<চর্); ইছ (<ইচ্ছ্); কষ (<কুষ্); দুহ (<দুহ্); দে (<দা); দেখ (<দৃক্ষ্); পুছ (<পৃচ্ছ); বট (<বৃৎ); বুঝ (<বুধ্); ভর (<ভৃ); লহ (<লভ্); লাগ (<লগ্) ইত্যাদি।

(খ) সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে বিকরণ যোগে বাংলায় নূতন ধাতুর সৃষ্টি :—

যেমন—অস্+চ্ছ>আছ্; ক্রী+না>কিন্; যুধ্+য>জুঝ্; নৃৎ+য>নাচ্; জ্ঞা+না>জান্; জি+না>জিন্; কৃন্ত্+অ>কাট্; ছিন্দ্+অ>ছিঁড়া ইত্যাদি।

(গ) উপসর্গ যোগে ধাতু সৃষ্টি :—

যেমন—আ+ √বিশ্>আবিশতি>আইশই>আইসে>আসে; আ+ √নী> আন্; উপ+ √বিশ্>বস্; উপ+ঈক্ষ্>উপেখ্; নি+ √ভাল্> √নিহার্; প্র+

√বিশ্>পইন্; পরি+ √ধা>পর্; বি+ √স্ম>বিস্মরতি>বিসরে; প্র+স্থা (ণিচ্) >প্রস্থাপয়তি>পাঠায়; নি+বৃৎ>নিবর্ত্ততে>নেওটে।

উদ্+ √স্থা (ণিচ্)>উত্থাপয়তি>উঠায়; প্র+ √স্থা (ণিচ্)>প্রস্থাপয়তি> পাঠায়; আ+জ্ঞা (ণিচ্)>আনা; উৎ+ √শল্>উছল; উৎপদ্যতে>উপজে; প্র+ √ক্ষাল্>পাখাল; সম্+ √ভাল্>সামাল; উৎ+লভ্>উলহ; উৎ+ √তৃ> উতর; নিঃ+ √সৃ>নিসর; উৎ+পত্ (ণিচ্)>উৎপাতয়তি>উপাড়ে।

বাংলায় কতকগুলি মূল ধাতু বিশেষ্য ও বিশেষণ হইতে আসিয়াছে। যেমন— গাড়্<গর্ত; মাত্<মত্ত; জুত্<জোত্ত<যোক্ত্র ইত্যাদি।

বাংলা কাব্যে ও সাহিত্যে কতকগুলি তৎসম ও অর্ধ-তৎসম ধাতু ব্যবহৃত হয়। যেমন—গর্জ, চুম্ব, ত্যজ, ভর্ৎস, বজ, শোভ, হিংস প্রভৃতি।

(২) সাধিত ধাতু ঃ

(ক) ণিজন্ত ধাতু—মূল ধাতুতে 'আ', 'ওয়া', প্রত্যয় যোগে ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু গঠিত হয়।

যেমন—দেখ্—দেখা; খা—খাআ>খাওয়া; দে—দেআ>দেওয়া ইত্যাদি।

(খ) নাম ধাতু—বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দে 'আ', 'ক', 'ড়', 'স', প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে নামধাতু গঠিত হয়।

যেমন—আগু>আগুয়া; আকুল>আউলা; বিষ>বিষা; রঙ্গ>রঙা; ধমক> ধমকা; দাবড়া; আঁচড়া; আগলা; ভাপসা; ভেঙ্চা ইত্যাদি।

(গ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু ঃ

যেমন—হাঁচ্, চিল্লা, চেঁচা, মচমচা, গলগলা, সড়সড়া, পিলপিলা ইত্যাদি।

'আ' প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি ধাতুর মূল অজ্ঞাত।

যেমন—গুটা, গুঁড়া, কাঁচা, জুড়া, লেলা ইত্যাদি।

(৩) সংযোগ-মূলক ধাতু ঃ

কর্, দে, পা প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর সঙ্গে বিশেষ্য, বিশেষণ, কিংবা ধন্যাত্মক শব্দ যোগ করিয়া বাংলায় সংযোগমূলক ধাতু গঠিত হয়।

যেমন—গুঁড়িমারা, সাজাদেওয়া, হাবুডুবু খাওয়া, ভালবাসা, শুরু করা, রক্ষা করা ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ

ক্রিয়ার মূল অংশ অর্থাৎ যাহার দ্বারা ক্রিয়ার ভাবটি যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয় তাহাকে ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি (root) বলে। ধাতুর উত্তর যে বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহাকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে। এইরূপ বিভক্তিযুক্ত ধাতুই ক্রিয়াপদ নামে অভিহিত। বাংলায় অধিকাংশ ধাতুই সংস্কৃত জাত। কিছু সংখ্যক ধাতু প্রাকৃত ও দেশী শব্দ হইতে আসিয়াছে। যেমন, ছোয়া<ক্ষুভ্; ভোলা<হ্বল্, কাড়া<কৃষ, বাঁচা<ব্রজ্, লাগা<লগ্, প্রভৃতি ধাতু সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে। প্রাকৃতে উদ্ভূত দেশী ধাতুর উদাহরণ বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন, ঢাকা<ঢক্ক; বুলা<বুল্; কোটা<কুট্ট ইত্যাদি।

সংস্কৃতে কাল, বাচ্য এবং ভাব (Mood) প্রত্যয় ও বিভক্তির সাহায্যে নির্ণীত হয়। কতকগুলি ধাতুর পরে বিকরণ যুক্ত হয়। বিকরণ অবলম্বনে ধাতুগুলিকে দশটি 'গণ' বা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বৈয়াকরণগণ কাল ও ভাবকে এক সঙ্গে বিচার করিয়া **ক্রিয়াপদকে এগারটি বিভাগে** ভাগ করিয়াছেন।

ক্রিয়াপদের কাল (Tense) ও ভাব বা প্রকার (Mood)

১। লট্—নির্দেশক বর্তমান (Indicative Present)

২। লোট্—বর্তমান অনুজ্ঞা (Imperative Present)

৩। লঙ্—সামান্য অতীত (Imperfect)

৪। বিধিলিঙ্—সম্ভাবক (Optative)

৫। লিট্—পরোক্ষ অতীত (Perfect)

৬। লুঙ্—নির্দেশক অতীত—অর্থাৎ যাহা পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে (Aorist)

৭। লৃট্—নির্দেশক ভবিষ্যৎ (Indicative Future)

৮। লৃঙ্—সম্ভাব্য (Conditional)

৯। লুট্—অন্য ধাতুর সাহায্যে গঠিত নির্দেশক ভবিষ্যৎ (Periphrastic Future)

১০। আশীর্লিঙ্—আশীর্বাদ-নির্দেশক (Benedictive)

১১। লেট্—অভিপ্রায় (Subjunctive)

লেট্-এর প্রয়োগ বৈদিকে বর্তমানে ও অতীতে মিলে। বৈদিক ভাষায় অনুজ্ঞা লিটে ও প্রচলিত ছিল।

সংস্কৃতে ধাতুর পরে কালবাচক প্রত্যয় বা বিকরণ (Temporal affix) বসিত। তাহার পরে ভাব বা প্রকার-বাচক প্রত্যয় (Model affix) আসিত। সর্বশেষে বচন ও পুরুষ-বাচক প্রত্যয় যুক্ত হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতুর অভ্যাস (Reduplication) ঘটিত। পরস্মৈপদ (Active) ও আত্মনেপদ (Middle) এই উভয় প্রকার বিভক্তিই ব্যবহৃত হইত। কর্ম-ভাব বাচ্যে শুধু আত্মনেপদীয় বিভক্তি যুক্ত হইত।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভক্তিগুলিকে **প্রাথমিক বা মুখ্য (Primary endings)** ও **দ্বৈতীয়িক বা গৌণ** (Secondary endings) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বর্তমান কালে যে বিভক্তিগুলি যুক্ত হয় সেগুলিকে বলা হয় প্রাথমিক এবং অতীতকালে যে বিভক্তিগুলি বসে তাহাদিগকে বলা হয় দ্বৈতীয়িক।

সংস্কৃতের বিভিন্ন প্রকার কালের মধ্যে প্রাকৃতে তিনটি কাল রক্ষিত হইল। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। এই যুগেই নূতন করিয়া অতীতকালের পদ গঠিত হইল। প্রাচীন বাংলার যুগে ভবিষ্যৎকাল লুপ্ত হইল এবং নূতন ভাবে ভবিষ্যৎকাল সৃষ্টি হইল। সুতরাং সংস্কৃতের ধাতুরূপের বৈচিত্র্য ও জটিলতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বাংলায় রহিল কেবলমাত্র বর্তমান কাল। সংস্কৃতে ক্রিয়ার বচন-ভেদ ও বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে। বাংলায় কাল ও ভাব প্রকাশের রীতি ও একটু স্বতন্ত্র ধরণের। এক হিসাবে বাংলার কালরূপের সঙ্গে ইংরেজীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। খাঁটি বাংলায় শতৃ ও নিষ্ঠা প্রত্যয়ের প্রয়োগ ও কতকটা সীমিত। সংস্কৃতে প্রত্যয়-বিভক্তি-যোগে কর্ম-ভাববাচ্য গঠিত হয়; কিন্তু বাংলায় অন্য ক্রিয়ার সহায়তায় বিশ্লেষণ-মূলক পদ্ধতিতে কর্ম-ভাববাচ্য হয়।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্যে পাঁচটি ভাব (Mood) ছিল। নির্দেশক বা অবধারক (Indicative), অনুজ্ঞা (Imperative), নির্বন্ধ (Injunctive), অভিপ্রায় (Subjunctive), এবং সম্ভাবক (Optative)। প্রাকৃতে নির্বন্ধ ও অভিপ্রায় লুপ্ত হয়। বাংলায় শুধুমাত্র নির্দেশক ও অনুজ্ঞা এই দুইটি ভাব রহিয়াছে।

বাংলায় ক্রিয়াপদের কাল চারিটি—বর্তমান (Present), অতীত (Past), ভবিষ্যৎ (Future) ও নিত্যবৃত্ত (Habitual past, conditional)। নির্দেশকভাবে এই চারিটি কালেরই রূপ পাওয়া যায়, তদুপরি যৌগিক বা মিশ্রকাল (compound বা

Periphrastie Tenses) রহিয়াছে। অনুজ্ঞায় কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের রূপ পাওয়া যায়।

উৎপত্তির দিক হইতে বাংলা ক্রিয়াপদের কালকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—(ক) **মৌলিক কাল (Radical Tense); (খ) কৃদন্তকাল (Participial Tense)**। বর্তমান (নির্দেশক ও অনুজ্ঞা) ও সাধারণ ভবিষ্যৎকে মৌলিক কাল বলা হয়, কারণ এই দুইটি কালের ক্রিয়ারূপ সংস্কৃত (লট্ ও লোট্) এবং ভবিষ্যৎ (লৃট) হইতে আসিয়াছে। সাধারণ অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ, ও নিত্যবৃত্ত অতীতকে বলা হয় কৃদন্তকাল। এই সকল কালের ক্রিয়ামূল যথাক্রমে সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় ক্ত (-ত), তব্য ও শতৃ প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। '-ত' ও 'তব্য' প্রত্যয়জাত কাল দুইটি প্রাচীন ও আদি-মধ্য বাংলায় কর্ম-ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হইত। পরবর্তীকালে কর্তৃকারক ও করণ কারক এক হওয়ায় কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের প্রভেদ লুপ্ত হয় এবং কাল দুইটি কর্তৃবাচ্যে পরিণত হয়।

যথা—ময়া কৃতম্>মএ করিঅং (প্রা)>মই করিঅ (অপ)>মুই করি। যেন কর্তব্যম্ >জেণং করিঅব্বং (প্রা)>জেণঁ করিব্ব (অপ)>জো করিব (প্রা-বা)>যে করিবে।

মৌলিককাল

সাধারণ বর্তমান ও সাধারণ ভবিষ্যৎকে মৌলিক কাল বলা হয়। কারণ এই দুইটি কালের ক্রিয়ারূপ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হইয়া বাংলায় আসিয়াছে।

নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান

মৌলিক বর্তমান কালের রূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বর্তমান কালের পুরুষবাচক বিভক্তিসমূহ সংস্কৃত লট্ বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। বাংলায় দ্বিবচন লুপ্ত।

প্রাচীন বাংলা—

(ক) **প্রথম পুরুষ—একবচন**।

(১) সং-তি>-ই (অপ)>-ই (প্রা-বা)। প্রাচীন বাংলায় "-ই" বিভক্তি কখনো কখনো লুপ্ত হইয়াছে।

যথা—করই, অচ্ছই, হোই, ভণই, কহই, অচ্ছ, উহ, দে।

(২) সং-য় (কর্ম-ভাববাচ্যের বিকরণ)+তি>-অই, -এই (অপ)>-অই, -এই (প্রা-বা)।

যেমন, পাবিঅই<*প্রাপ্যতি (=প্রাপ্যতে); করেই, করিঅই<*কর্ষতে (=ক্রিয়তে); সিজ্ঝই<সিধ্যতে; বন্ধাবএ<*বন্ধাপ্যতে।

বহুবচন—সং-ন্তি<-ন্তি (প্রা-বা)।

যেমন, চাহন্তি, ভণন্তি। প্রাচীন বাংলায় "থি" বিভক্তিও পাওয়া যায় (-থি<-ন্তি <অন্তি)। যেমন, ভণথি, বোলথি। মৈথিলীতেও "থি" বিভক্তি পাওয়া যায়।

(খ) মধ্যম পুরুষ—একবচন।

সং-সি>-সি (অপ, প্রা-বা)। যেমন, আছসি, পুচ্ছসি, বুঝসি। প্রাচীন অবধীতে "-সি" প্রত্যয় পাওয়া যায়। যেমন, করসি।

বহুবচন—সং-থন্>-হু (অপ, প্রা-বা)। যথা—আছহু ; প্রাচীন অবধীতে করহু।

(গ) উত্তম পুরুষ—একবচন

সং-স্মি (<অস্মি)>-ম্হি (প্রা)>-মি (অপ, প্রা-বা)

যথা—পুছমি, মারমি, জাণমি, পীবমি, লেমি ইত্যাদি।

বহুবচন—

সং-ধ্বম্>হুঁ। যথা—আচ্ছহুঁ, জানহুঁ, লেহুঁ, খেলহু ইত্যাদি।

মধ্য বাংলা—

মধ্য বাংলায় বচনভেদ রক্ষিত হয় নাই।

(ক) প্রথম পুরুষ—

(১) সং-তি>-ই, -এ

যেমন, করোতি>করে ; দয়তি>দেই।

(২) বিভক্তিহীনতা—

যেমন, কর<করই ; জাগ<জাগই।

(৩) সং-য় (কর্ম-ভাববাচ্যের বিকরণ)+-তি>-অএ, -ইএ

যেমন, কাটিএ, থাকিএ, শুনীএ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই পদগুলি কর্মভাববাচ্যের রূপ ছিল।

(৪) সং-ন্তি>-ন্তি। যেমন, দেন্তি, করন্তি।

সম্ভ্রমসূচক পদগুলি গৌরবে-বহুবচন হইতে উদ্ভূত।

-অন্তি, -এন্ত>-এন। যেমন, বোলন্তি, বোলন্ত, বোলেন।

(ক) মধ্যমপুরুষ—

(১) সং-সি>সি। যেমন, চাহসি, দেসি, করসি

(২) সং-থ>-হ,-হা। যেমন, যা, পালাহ, পালাহা।

(৩) সং-ত>-অ। যেমন বল, কর।

(গ) উত্তমপুরুষ—

(১) সং-ম : (পরস্মৈপদ বহুবচন)>-ম, -বঁ (অপ)>উঁ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একবচনে প্রযুক্ত)। যেমন, করোমঃ>করম, করবঁ (অপ)>করউঁ, করোঁ ; সেইরূপ বধউঁ, হউঁ। তুলনীয়, প্রাচীন ওড়িয়া অছুঁ, প্রাচীন অবধী করউঁ, হউঁ।

(২) -য+তি>-ইএ (কর্ম-ভাববাচ্য)

যথা—করিএ>*কর্যতে (=ক্রিয়তে)।

(৩) সং-ত (নিষ্ঠা)>-ই, -ঈ।

যেমন, করি, করী<করিতম্ (=কৃতম্)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে করি, করিএ পদগুলি বহুবচনে প্রযুক্ত হয়।

আধুনিক বাংলা—

(ক) প্রথম পুরুষ—

(১) সাধারণ :— -(ই) -এ (ম-বা)>-এ।

যেমন—করে, চলে, যায়, যাএ।

(২) সম্ভ্রমসূচক :— -(এ)ন্ত (ম-বা)>-(এ)ন্।

যেমন, যান, করেন।

(খ) মধ্যম পুরুষ—

(১) তুচ্ছার্থে :— -সি (ম-বা)> -ইস, -অস।

যেমন, চলিস, করস।

(২) সাধারণ :— -হ (ম-বা)> -অ।

যেমন, চল, কর।

(৩) সম্ভ্রমসূচক :— -(এ)ন্—চলেন, করেন।

(গ) উত্তম পুরুষ—

-ই (ম-বা)> -ই।

যেমন, বলি, হাসি, করি ইত্যাদি।

মৌলিক ভবিষ্যৎকাল (নির্দেশকভাবে)

মৌলিক ভবিষ্যৎকালের পদ প্রাচীন বাংলায় কেবলমাত্র প্রথম ও মধ্যম পুরুষে পাওয়া যায়।

প্রথম পুরুষ—করিহ <(প্রা-বা) <করিহিই, করিস্সই (প্রা) < করিষ্যতে ;
কহিহ<কহেস্সই<কথয়িষ্যতি।

মধ্যম পুরুষ—হোহিসি<হোইস্‌সসি (প্রা)<ভবিষ্যসি; মারিহসি<মারেস্‌সসি<
মারয়িষ্যসি।

বাংলায় অনুজ্ঞাভাবের কাল দুইটি (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) মৌলিক। কারণ সংস্কৃত সমাপিকা ক্রিয়া হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে। অনুজ্ঞাভাবে উত্তম পুরুষের রূপ নাই এবং বচনভেদও লুপ্ত।

অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান কাল

(ক) প্রথম পুরুষ—

(১) সং -তু> -উ (অপ)> -উ (প্রা-বা)> -উ (ম-বা)+ক (স্বার্থিক)
> -উক (আ-বা)।

সং—দয়তু (=দদাতু)>দেউ (প্রা-বা)>দেউ, দেউক (ম-বা)>দিক, দিউক (আ-বা)।

সং—করোতু>করউ (প্রা-বা)>করউ (ম-বা)>করুক।

সং—*যায়তু (=গম্যতান্)>জাইউ (প্রা-বা)>জাইউ (ম-বা) (ভাববাচ্য, অনুজ্ঞা)।

(২) -উন্ (সম্ভ্রমসূচক)—করুন, যাউন্ (যান্)।

(খ) মধ্যম পুরুষ—

(১) শূন্য বিভক্তি—পুছ<পুছ (ম-বা)<পুচ্ছ (প্র)<পৃচ্ছ; বোঝ<
বুঝ (প্রা-বা)<বুজ্ঝ (প্রা)<*বুধ্য; চাল্<চাল (প্রা)<চালয়।

(২) সং-হি, -ধি (একবচন)>-হি (প্রা)। জাহী (প্রা-বা)<জাহি
(প্রা)<যাহি; হোহি (প্রা-বা)<হোহি (প্রা)<*ভবহি (<ভব)।

(৩) সং-ত (বহুবচন)>-অ (প্রা)-অ (প্রা-বা)—জান্<জাণ (প্রা-বা)<জানত;
কর্<কর (প্রা-বা)<*করত; জা<*জাঅ (প্রা)<যাত।

(৪) সং-থ (নির্দেশক বর্তমান বহুবচন)>-হ (প্রা)>-হ (প্রা-বা)>-হ,
-হা (ম-বা)>-ও (আ-বা)।

যাও<জাহ, জাহা (ম-বা)< -জাহ (প্রা)< -যাথ। করো< -করহ (ম-বা)
< *করথ।

(৫) সং-থদ (নির্দেশক বর্তমান, দ্বিবচন)> -হু (প্রা)> -হু (প্রা-বা)। হোহু
(প্রা-বা)<হোহু (প্রা)<ভবথঃ; জাহু<যাথঃ।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Future Imperative বা Precative)

সংস্কৃতে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ ছিল না, তবে প্রাকৃতে ছিল। অনুজ্ঞাভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎকালের রূপ অপভ্রংশ স্তর পর্যন্ত যথাযথ রক্ষিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ কালের রূপ শুধু মধ্যম পুরুষেই পাওয়া যায়। যেমন, যাইহ<যাস্যথ। করিহ<করিষ্যথ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অতীতকালের 'লি' বিভক্তি ও দেখা যায়। যেমন—চলিহলি=চলিও; দিহলি=দিও; করিহলি=করিও।

কৃদন্ত অতীতকাল

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার অতীতকালের কিছু কিছু রূপ মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার স্তর পর্যন্ত আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রয়োগ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতে থাকে। অপভ্রংশ স্তরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অতীতকালের ক্রিয়ার রূপগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িল এবং তাহাদের স্থান সংস্কৃত নিষ্ঠা প্রত্যয়জাত '-ত, -ইত' (past participle) দ্বারা অধিকৃত হইল। ক্রিয়া অকর্মক হইলে -ত, -ইত প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে অথবা ভাববাচ্যে এবং সকর্মক ক্রিয়ায় কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হইত। যেমন, স গতঃ (কর্তৃবাচ্য); তেন গতম্ (ভাববাচ্য); তেন ইদং সমাপ্তম্ (কর্মবাচ্য)।

-ত, -ইত প্রত্যয় -অ, -ইঅ রূপে পরিবর্তিত হইল। পরবর্তীকালে অতীতকাল বুঝাইবার জন্য প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার 'ল' প্রত্যয় -অল, -ইল রূপে প্রসারিত হইয়া প্রায়ই যুক্ত হইতে লাগিল। মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে -অল, -ইল প্রত্যয় 'অল্ল' 'ইল্ল' রূপে পরিণত হইল। সংস্কৃত নিষ্ঠাপ্রত্যয় -ত, -ইত জাত-অ, -ইঅ এর সহিত অল্ল, ইল্ল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় 'ল' বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে।

সুতরাং সংস্কৃত অতীতকালের রূপ বাংলায় রক্ষিত হয় নাই। কেবলমাত্র একটি অব্যয় শব্দে পাওয়া যায়—নাই<নাহি (প্রা-বা)<নাসীৎ।

বাংলায় কৃদন্ত অতীতকালকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) 'ল' প্রত্যয়হীন (২) 'ল' প্রত্যয়ান্ত। 'ল' প্রত্যয়হীন রূপে বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ অনুযায়ী কোন পার্থক্য নাই। 'ল' প্রত্যয়হীন রূপ হইতে বাংলায় 'আ' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত বিশেষণ পদের উদ্ভব হইয়াছে। যথা—চলা<চলিঅ<চলিত; কিন্তু চলিত<চলিঅ; চলিঅ+ল=চলিল। এইরূপে খাদিত+ল=খাইল। সুতরাং 'ল' প্রত্যয়হীন রূপ বিশেষণরূপে এবং 'ল' প্রত্যয়যুক্ত রূপ বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—বলা মুখ, চলা পথ। কিন্তু রাম চলিল, সে বলিল।

প্রাচীন বাংলায় অতীতকালে সকর্মক ক্রিয়াপদ কর্মের অনুয়ায়ী লিঙ্গ বিভক্তি দ্বারা যুক্ত হইত। ক্রিয়াপদ অকর্মক হইলে কর্তার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইত। 'ল' প্রত্যয়হীনরূপে -ত, -ইত প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন, চঞ্চল চীঅ পইঠা (=প্রবিষ্ট) কাল ; ইন্দি বিষয়া ণঠা (=নষ্টঃ) ; সসহর গউ নিবাণে (গউ<গতঃ) ; কমল বিকসউ (= বিকশিতম্)।

মধ্য বাংলায় "ই, ঈ" <ইঅ<ইত রূপের উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা, বাপ বসুল মোর নন্দ ঘরে **জানী** (জানী<*জানিত=জ্ঞাতঃ) ; জোড় হাথ **করী** বনমালী (<* করিতঃ=কৃতঃ) ; দান ছাড়ী পরনারী কিসক **বাখানি** (<* ব্যাখ্যানিতঃ= ব্যাখ্যাতঃ) ; পদ্মার বচনে বেহুলা মনে মনে **হাসী**।

আধুনিক বাংলায় -ত, -ইত প্রত্যয়জাত অতীতকালের প্রয়োগ পৃথক ভাবে পাওয়া যায় না। বর্তমানের সহিত ইহা মিশিয়া গিয়াছে। এইগুলিকে **অতীত অর্থে বর্তমান** বলিয়া গণ্য করা হয়। যেমন, সে কথা যখন বলি, তখন আমার মানসিক অবস্থা অন্যরকম ছিল। ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিতে বর্তমানকালের ক্রিয়ারূপের অতীতকালের অর্থে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, সম্রাট অশোক দীর্ঘদিন রাজত্ব **করেন** (=করিয়াছিলেন) ; আমি যখন পাটনা **যাই**, তখন এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

"ল" প্রত্যয়হীন পদের বিশেষণরূপে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলায় পাওয়া যায়। যথা, **চলী** ভইলী চন্দ্রাবলী (=চলিতা) ; **বলা** মুখ, **চলা** পথ।

"(ই)ল" প্রত্যয় যুক্ত পদগুলিই বাংলা ভাষার অতীত কালের বিশিষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় কর্তা ও কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়াপদে স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করা হইত। যথা—**মেলিলি** কাচ্ছি (=মুক্তা কক্ষিকা) ; **হাসিলী** চন্দ্রাবলী ; জলেতে **উঠিলী** রাহী।

প্রাচীন বাংলার '(ই)ল' প্রত্যয়ান্ত রূপের নিদর্শন :—বাট **রুন্ধেলা** ; যে যে **আইলা** তে তে **গেলা**।

প্রাচীন বাংলায় অতীত কালে কর্মবাচ্যে কোন বিভক্তি যুক্ত হইত না। কর্তৃবাচ্যে উত্তম পুরুষে '-ই, -এসু', মধ্যমপুরুষে '-ই, -এসি', এবং প্রথমপুরুষে '-সি', '-আ', '-ই' প্রত্যয়গুলি যুক্ত হইত।

যথা—উত্তমপুরুষ—ভৈলী, আছিলেসু, সুতেলি।

মধ্যম পুরুষ—আইলেসি।

প্রথম পুরুষ—গেল, গেলা, ভরিলি।

মধ্যযুগের বাংলায় '(ই) ল' প্রত্যয়ান্ত অতীত কালের ক্রিয়ার উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। 'ইল' প্রত্যয়ান্ত অতীতের বিশেষণ রূপে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মধ্য বাংলায় প্রচুর। আধুনিক বাংলায় 'ল' প্রত্যয়হীন 'আ' প্রত্যয় বিশিষ্ট বিশেষণ পদ 'ইল' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণকে বিতাড়িত করিয়াছে।

যথা—পাকিল বেল (=পাকা)
ভাঁগিল নেহা (=ভাঙ্গা)
গেলী জাম (=গত জন্ম)

মধ্য বাংলায় উত্তম পুরুষে-'ওঁ', -'আহোঁ' (স্বার্থিক আ+অহম্ জাত হোঁ), আঙ্, মধ্যম পুরুষে '-আ, -আহা, -এ -ই' এবং প্রথম পুরুষে '-ই, -এ, আন্তি (-আন্ত, -আন্ত, -এন্ত), -এন' প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা—

উত্তম পুরুষ :—আইলাহোঁ, আইলো, আইলাঙ
মধ্যম পুরুষ :—আইলাহা, আইলা, আইলি
প্রথম পুরুষ :—গেলা, গেলান্তি, গেলান্ত, গেলেন্ত, গেলেন; আইলী, চলিলী (স্ত্রীলিঙ্গ)

আধুনিক বাংলায় উত্তম পুরুষে -'উম্, -আম্, -এম্', মধ্যম পুরুষে -'ই' (তুচ্ছার্থে), -'আ' (প্রাদেশিক), -'এ' (সাধারণ), -'এন' সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়।

যথা—উত্তম পুরুষ—গেলুম, গেলাম, গেলেম।
মধ্যম পুরুষ—গেলি, গেলে, গেলা।
প্রথম পুরুষ—গেল, গেলেন, দিলেন।

কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কাল

বাংলায় কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রত্যয় -'ইব' সংস্কৃত তব্য প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। তব্য>ইতব্য>ইঅব্ব>ইব্ব>ইব। 'ইব' প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরুষ-বাচক প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বাংলায় ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। প্রাচীন বাংলায় ভাব-কর্মবাচ্যে কোন বিভক্তি যুক্ত হইত না। -ইব প্রত্যয় আদিতে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ছিল। কর্মবাচ্যে উহা কর্মের বিশেষণ হইত এবং স্ত্রীলিঙ্গ হইলে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হইত। প্রাচীন বাংলায় এই রীতি রক্ষিত হইয়াছে। যেমন—বাক পথাতীত কাহিব (<কথয়িতব্য) কীস ; মই দিবি পিরিচ্ছা (=ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা) ; শাখি করিব জালন্ধরি পাএ। প্রাচীন বাংলায় -'ইব' অন্তক ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ কর্তৃবাচ্যেও দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে -এ, -এঁ বিভক্তি প্রযুক্ত হয়।

যেমন, 'জই তুহ্মে ভূহ্মকু অহেরি জাইবেঁ' ব্রজবুলির মাধ্যমে -'অব' অন্তক ভবিষ্যৎকালের পদ মধ্য বাংলার কিছু কিছু পাওয়া যায়।

ভবিষ্যৎ কালের পুরুষবাচক বিভক্তি :—

মধ্যবাংলায়—প্রথম পুরুষ -এ, -এঁ

মধ্যম পুরুষ -এ, -এঁ (সাধারণ), -ই (তুচ্ছার্থে)

যেমন, করিবে, করিবেঁ, করিবি।

উত্তম পুরুষ -ওঁ, -অওঁ—বধওঁ, নিবেদিবোঁ।

আধুনিক বাংলায় ভবিষ্যৎকালে উত্তমপুরুষে বিভক্তি যুক্ত হয় না।

প্রথম পুরুষে -এ (সাধারণ), -এন (সম্ভ্রমার্থে) এবং মধ্যমপুরুষে -ই (তুচ্ছার্থে), -এ (সাধারণ), -এন (সম্ভ্রমার্থে) প্রযুক্ত হয়। মধ্য বাংলার মত আধুনিক সাধুভাষাতে ও একসময় -এ বিভক্তির সঙ্গে স্বার্থিক -'ক' প্রত্যয় যুক্ত হইত। যথা—করিবেক, দিবেক। পূর্ববঙ্গের উপভাষায় -'ব', -'বা' প্রভৃতির পরিবর্তে 'বাম্', 'ম', 'মু' প্রভৃতির প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—করবাম্, করমু ইত্যাদি।

নিত্যবৃত্ত কাল

বাংলার নিত্যবৃত্ত কালের -'ইত' প্রত্যয় আসিয়াছে সংস্কৃত শতৃপদ হইতে। শতৃ-স্থানে প্রাকৃতে -'অন্ত' হইত। অন্ত>এন্ত>ইত।

এই -ইত প্রত্যয়ের সঙ্গে পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত হইয়া বাংলায় নিত্যবৃত্ত অতীতের ক্রিয়াপদগুলি গঠিত হইয়াছে। অপভ্রংশ স্তরে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন-কালেই শতৃপ্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা ক্রিয়ারূপে শতৃপ্রত্যয়ের ব্যবহার বিশেষ নাই। যাহা পাওয়া যায়, তাহাও নিত্যবৃত্ত বর্তমানের অর্থে এবং কদাচিৎ অতীতের অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'পাঞ্চ কেডুয়াল পড়ন্তে মাঙ্গে'; 'ণিঅ ঘরিণি লই কেলি করন্ত'; 'শান্তি ভণই পোহান্ত (<প্রভাতায়ান্ত্) পহারা'। নিত্যবৃত্তকাল মধ্য বাংলায় একটি পূর্ণকালে পরিণত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সামান্য অতীতের অর্থে কখনো কখনো নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

যেমন, 'পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি **চাহিত** (=চাহিল) মঙ্গলে; 'কিনা বিধি **লিখিত** (=লিখিল) কপালে'। পূর্ববাংলার উপভাষায় ভবিষ্যৎ অর্থে নিত্যবৃত্ত কালের প্রয়োগ আছে। যেমন, আমি যাইতাম (=যাইব) না। আধুনিক বাংলায় নির্দেশকভাব ছাড়া অভিপ্রায় (Subjunctive) অর্থেও নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, বৃষ্টি হইলে শস্য হইত। বাংলায় নিত্যবৃত্তের বিভক্তি সাধারণ

অতীতের মত প্রযুক্ত হয়। কেবলমাত্র প্রথম পুরুষে '-এ' বিভক্তি নাই। মধ্য বাংলায় উত্তম পুরুষে '-ওঁ' এবং মধ্যম পুরুষে—'-এ' বিভক্তি হয়।

যেমন—প্রথম পুরুষ—হৈত, থাকিত।

মধ্যমপুরুষ—খাইতেঁ।

উত্তমপুরুষ—খাইতোঁ, জানিতোঁ।

যৌগিক কাল (Compouud or Periphrastic Tenses)

যৌগিক কালের প্রথম অংশ শত্রন্ত বর্তমান (-ই, -ইতে অন্তক) অথবা কৃদন্ত অতীত (-ই, -ইয়া অন্তক) এবং শেষ অংশ 'আছ' (<অস্) ধাতুর সমাপিকা পদ। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ মিলিলে ও যৌগিক কালের উদাহরণ পাওয়া যায় নাই। বাংলায় প্রাচীন যুগের শেষের দিকেই যৌগিক কালের উদ্ভব হইয়া ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন মৈথিলী ও প্রাচীন ওড়িয়াতে যৌগিক কালের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। যেমন, প্রাচীন মৈথিলী—গেলছে (=গিয়াছে); প্রাচীন ওড়িয়া—কহিছন্তি (=কহিয়াছেন)। যৌগিক কালের ক্রিয়ারূপে দুইটি অংশ মিলিয়া এক হয়; কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ায় অংশ দুইটি ছাড়া ছাড়া থাকে।

যৌগিক কালের ক্রিয়ারূপ ছয় প্রকার—

১। ঘটমান বর্তমান (Present Progressive)

প্রথম অংশ '-ইতে' অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া, দ্বিতীয় অংশ 'আছ' ধাতুর বর্তমান কালের রূপ। ইহা অসম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—চিন্তিতেঁ আছে। আধুনিক বাংলায় করিতেছে, আসিতেছে; পূর্ববাংলায়—কর্‌ত্যাছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় 'আছ' স্থানে 'বট্' ধাতু ব্যবহৃত হয়। যেমন, সে করে বটে।

২। ঘটমান অতীত (Past Progressive)

প্রথম অংশ -ইতে অন্তক অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ 'আছ' ধাতুর অতীত কালের রূপ। ইহা অসম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, সাধুভাষায় করিতেছিল, বসিতেছিল। পূর্ববঙ্গে কর্‌ত্যাছিল।

৩। ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Progressive)

প্রথম অংশ -ইতে অন্তক অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ 'থাক্' ধাতুর ভবিষ্যৎ কালের রূপ। যেমন, করিতে থাকিবে।

৪। পুরাঘটিত বর্তমান (Present perfect)

প্রথম অংশ '-ইয়া' অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া, দ্বিতীয় অংশ 'আছ' ধাতুর বর্তমান কালের রূপ। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লইছে, ফুটিছে, ফুটিলছে, রহিলছে, নিআঁছিস, শুনিআছ প্রভৃতি। আধুনিক বাংলায় করিয়াছে (=করিয়া আছে), শুনিয়াছে (= শুনিয়া আছে)। ইহা সম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে। চলিত ভাষায় প্রথমাংশে -'ই' অন্তযুক্ত যৌগিক কাল অসম্পন্ন (continuous) অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, ক'রছে<করিছে =করিতেছে।

৫। পুরাঘটিত অতীত (Past Perfect)

প্রথম অংশ -'ইয়া' অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া, দ্বিতীয় অংশ 'আছ' ধাতুর অতীত কালের রূপ। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আলিছিল (=আইল' ছিল), রাখিআঁছিল (=রাখিয়াছিল)। আধুনিক বাংলায় আসিয়াছিল, গিয়াছিল। '-ইল' অন্তক প্রথমাংশযুক্ত যৌগিক কাল দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন, হ'লছে, গেলছে।

৬। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (Future Perfect)

প্রথম অংশ -ইয়া অন্তক অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ 'থাক' ধাতুর ভবিষ্যতের রূপ। যেমন, করিয়া থাকিবে।

যৌগিক ক্রিয়া (Compound verb)

একাধিক পদের সমন্বয়ে গঠিত হইলে ও যেখানে একটি মাত্র ক্রিয়াপদের অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যৌগিক কাল মূলত যৌগিক ক্রিয়া ; শুধু তফাৎ এই যে যৌগিক ক্রিয়ার অংশ দুইটি পৃথকভাবে অবস্থান করে এবং 'আছ' ধাতুর অর্থই সেখানে প্রধান। কিন্তু যৌগিক কালে দুইটি অংশ মিলিয়া এক অর্থ প্রকাশ করে।

অর্বাচীন সংস্কৃতে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল। যেমন, গমনং করোতি=গচ্ছতি ; শয়নং করোতি=স্বপিতি ; কর্তুং লভতে=কুর্যাৎ। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় ধাতুর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় নূতন ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কৃ, গম্, লভ্, ভূ, পত প্রভৃতির সহযোগে বিভিন্ন যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন দেখা যায়।

বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যেমন চর্যায়—গুণিআ লেহুঁ ; কহিআঁ দেই। আধুনিক বাংলায় দৌড় মারে, লাফ দেয়, পার করে, শুনে যা ইত্যাদি। গম্ ধাতুর যোগে ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, চর্যায়—টুটি গেলি কংখা ; সয়রা নিদ গেল। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ায় "বাস্" ধাতুর

ব্যবহার ছিল। যেমন, চর্যায়—ভান্তি ন বাসসি; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—ভয় না বাসসী, না বাসসি লাজ। ভোট-বর্মী ও আলতাই ভাষাবর্গে ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন আছে।

বাংলার প্রচলিত যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) দুইটি অংশই সমাপিকা ক্রিয়াপদ। যেমন— জানে শোনে, আসে যায়, লিখে পড়ে।

(খ) প্রথম অংশ সমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ অসমাপিকা। যেমন—খাও গিয়া, খাওগে, খাওসে, (=খাও আসিয়া)।

(গ) প্রথমটি সমাপিকা, দ্বিতীয়টি অসমাপিকা, তারপরে সমাপিকা। যেমন, কর্‌গে যা।

(ঘ) প্রথম অংশ অসমাপিকা, দ্বিতীয় অংশ সমাপিকা।

যেমন, লিখে ফেল, খেয়ে নাও, চলে এস।

(ঙ) প্রথম অংশ নাম, দ্বিতীয় অংশ সমাপিকা।

যেমন— রান্না করে, ডুব মারে, ঝাপ দেয়।

(চ) অসমাপিকা + অসমাপিকা + সমাপিকা।

যেমন— বলিতে গিয়া কাঁদিল।

কর্ম-ভাববাচ্য (Passive Voice)

সংস্কৃতে ও বাংলায় সকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্য ও অকর্মক ক্রিয়ার ভাববাচ্য হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় ধাতুর সহিত-য় বিকরণ যোগ করিয়া আত্মনেপদী বিভক্তির সাহায্যে কর্ম-ভাববাচ্যের পদ গঠিত হইত। যেমন, ক্রিয়তে, গম্যতে ইত্যাদি। এই ভাবে প্রত্যয়-যোগে কর্ম-ভাববাচ্যের গঠনকে "Inflexional Passive" বলা হয়। সংস্কৃতে বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে ও কর্ম-ভাববাচ্যের পদ গঠিত হইতে দেখা যায়। যেমন, কৃতম্ অস্তি (=ক্রিয়তে)।

প্রাকৃতে আত্মনেপদী ধাতুর স্থানে পরস্মৈপদী বিভক্তি বসিত এবং স্বরযুক্ত "-য়" বিকরণ -ইঅ (-ঈঅ) রূপে পরিবর্তিত হইল এবং স্বরহীন '-য়' য-ফলা হইল।

যেমন, লভ্যতে>লভিঅই, লব্‌ভই (প্রা); *কার্যতে (ক্রিয়তে)>করিঅই (করীঅই)। প্রাকৃত-অপভ্রংশের "ইঅ" প্রত্যয়যুক্ত কর্ম-ভাববাচ্যের রূপ প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন, করিঅই>*কর্যতে; মধ্য বাংলায়-অই>-এ হইয়াছে। করিঅই >করিএ—"হেন কাম না করিএ" : দেখিয়ে>দেক্‌খিঅই>দৃশ্যতে। আধুনিক বাংলায়

এমন পদ কর্তৃবাচ্যের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। যেমন, এমন কাজ করে না ; রবিবারে মাছ খায় না। এই জাতীয় পদের মধ্যে সংস্কৃত বিকরণ-ঘটিত (Inflected passive) কর্ম-ভাববাচ্যের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

প্রাকৃতের য-ফলা উদ্ভূত কর্মভাববাচ্যের রূপ অপভ্রংশ স্তর পর্যন্ত বজায় ছিল। প্রাচীন বাংলায় এই পদগুলি কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আসিলে ও অপভ্রংশের প্রভাবে কিছু কিছু প্রয়োগ প্রাচীন বাংলায়ও দৃষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে য-ফলা ইঅ>ঈ না হইয়া পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সহিত সমীভূত হইয়াছিল। যেমন, দৃশ্যতে>দিস্‌সই (প্রা, অপ)>দিসঅ (=দীসই) (প্র,-বা); *ছিদ্যতু (=ছিদ্যতাম্)>ছিজ্জউ>ছিজউ (প্রা-বা); লভ্যতে>লব্‌ভই। বজ্‌ঝই (=বধ্যতে) মূঢ়ো। শুভঙ্করের আর্যায়ও এই ধরণের পদ পাওয়া যায়। যেমন, কুড়বা কুড়বা লিজ্জে। আধুনিক বাংলায়ও এইরূপ পদের সন্ধান মিলে। যেমন, "যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে ভাব-কর্মবাচ্য **(Periphrastic Passive)** গঠিত হইয়া থাকে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেই এই রীতি প্রচলিত ছিল। যেমন, চর্যায়—ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জায় ; ছুলি ছুলি পিঠা ধরণ ন জাই ; এইরূপ লেপন জায় ; ভেউ ন জাঅ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ ; প্রাণ, যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ; পুণ্য কইলেঁ স্বর্গে জাইয়ে (=যাওয়া যায়) নানা উপভোগ পাইয়ে (=পাওয়া যায়) ; আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।

-অন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে 'যা' ধাতুর যোগে ভাব-কর্মবাচ্যের পদ গঠনের রীতি পূর্ববঙ্গের ভাষায় দেখা যায়। যেমন, এই কষ্ট সওন যায় না ; এই কথা কওন যায় না। কর্ম ও ভাববাচ্যের বিশ্লেষণাত্মক রূপই (Analytical Passive) বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য।

বাংলায় আছ্, পড়্, যা, হো, চল্ প্রভৃতি ধাতুর সাহায্যে কর্ম-ভাববাচ্যের পদ গঠিত হইয়া থাকে। যেমন, চোর ধরা পড়েছে ; অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না ; বইটা আমার পড়া আছে ; এখানে থাকা চলে না ; মাছ ধরা আছে।

অনেক সময় অপরিচিত বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলিবার সময় যখন মধ্যমপুরুষের কর্তা প্রযুক্ত হয়, তখন নিম্নোক্ত বহুভাষিত ভাব-কর্মবাচ্যের পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোথায় থাকা হয় ? কি কাজ করা হয় ?

বাংলায় নিষ্ঠান্ত তৎসম পদের সাহায্যে ও কর্ম-ভাববাচ্যের পদ গঠিত হয়। যেমন, শিশু কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইল ; ঘটনাটি তাহার কর্ণগোচর হইল।

বাংলায় কর্ম-কর্তৃবাচ্যের (Quasi-Passive Voice, Middle Voice) প্রয়োগ ও লক্ষণীয়। এখানে আসল কর্তার সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্মই যেন নিজের উপরে ক্রিয়া করে। যেমন—কাপড় ছিঁড়ে ; ফল পাকে, শাঁখ বাজে, বাঁশ ভাঙ্গে ইত্যাদি।

সংস্কৃতের মত বিভক্তি-মূলক কর্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া ও বাংলায় প্রচলিত আছে। 'আ' প্রত্যয় যোগে এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন, বেশ মানায় (<মানাপয়তি) ; ইহা ভাল শুনায় না ; দোষ খণ্ডায় না।

✓ অস্ত্যর্থক ধাতু (Substantive Verbs)

বাংলায় অস্ত্যর্থক ধাতু পাঁচটি—

আছ্, হ্, বট্, থাক্, রহ্।

(ক) আছ্ ধাতু—

সংস্কৃত অস্ ধাতুর বর্তমান কালের একটি রূপ 'অস্তি' পাওয়া যায়। প্রাকৃতে ধাতুটির বর্তমানের রূপ অস্তি>অত্থি রক্ষিত ছিল। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায়ও অস্তির রূপ দৃষ্ট হয়। অস্তি>অত্থি>আথি (প্রাচীন অবধী)। প্রাচীন ভারতীয়-আর্যের উপভাষায় গচ্ছতির সাদৃশ্যে 'অস্' ধাতুর আর একটি রূপ হইত অচ্ছতি। তাহা হইতে বাংলায় 'আছে' আসিয়াছে। *অচ্ছতি>অচ্ছই>আছই (প্রা-বা)>আছে। *অসতি (=অস্তি) ও ভবতি মিলিয়া আধুনিক ভারতীয়-আর্যে 'হই' হইয়াছে।

বাংলায় 'আছ' ধাতু অসম্পূর্ণ—সকল কালে ও ভাবে ইহার রূপ নাই।
প্রাচীন বাংলা—

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
আছ	অচ্ছসি	অচ্ছম

অসমাপিকা—(আ)চ্ছন্তে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
মধ্য বাংলা—	আছে, আছএ, আছেন্ত	আছহ	আছোঁ, আছি
	আছিলাহা, (আ) ছিল	আছিলা	আছিলাহোঁ, আছিলো

অনুজ্ঞা—ছুক (প্রথম পুরুষ)

অসমাপিকা—ছিতে।

আধুনিক বাংলায় 'আছ' ধাতুর আদিস্বর লুপ্ত 'ছ' রূপ শুধু যৌগিক কালেই পাওয়া যায়।

(খ) "হ" —ধাতু

সংস্কৃত ভবতি>হোদি (প্রা)>হোই (অপ)>হোই (প্রা-বা)।

বাংলায় হ, হো ধাতুর পূর্ণরূপ পাওয়া যায়।

(গ) "বট্" ধাতু—

সংস্কৃত 'বৃৎ' ধাতু হইত উৎপন্ন বাংলায় 'বট্' ধাতুর রূপ শুধু বর্তমান কালে পাওয়া যায়। বর্ত্ততে>বট্টই (প্রা)>বটে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই—বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞির দান বটে।

বাংলার রাঢ় অঞ্চলের উপভাষায় বট্ ধাতুর প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন, সে বটে, তিনি বটেন, তুমি বট, আমি বটি ইত্যাদি।

(ঘ) "রহ" ধাতু—

অশোক অনুশাসনে প্রাপ্ত 'লঘ্' ধাতু (অপেক্ষা করা অর্থে) হইতে 'রহ' ধাতু আসিতে পারে বলিয়া শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন।

(ঙ) "থাক্" ধাতু—

সংস্কৃত √স্থা হইতে আসিয়াছে।

তাছাড়া, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অস্ত্যর্থক ক্রিয়ারূপে 'বস্' ধাতুর প্রয়োগ ও লক্ষণীয়। যেমন, তোমার দেহত কাহ্নাঞি না বসে কি পীত।

নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া (Negative verbs)

অর্বাচীন অপভ্রংশে নাস্ত্যর্থক ক্রিয়ার একটি মাত্র উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা—নী আণহ<নি+জানাতি। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রথম স্তরে নিষেধার্থক অব্যয় 'ন' উপসর্গের মত ক্রিয়াপদের পূর্বে বসিত। বাংলায় নাস্ত্যর্থক ধাতু দুইটি (ক) নহ্, নহো ; (খ) নার।

(ক) 'নহ্' আসিয়াছে সংস্কৃত ন+ √ভূ। অসমীয়া ও ওড়িয়ায় নোহে, নুহে পাওয়া যায়। মধ্য বাংলায় 'নহ্' ধাতুর রূপ যৌগিক কাল ব্যতীত সব কালেই পাওয়া যায়।

যেমন— বর্তমান—নহে।
অতীত—নহিল।
ভবিষ্যৎ—নহিব, নহিবেক।

নিত্যবৃত্ত—নহিত।

অসমাপিকা—নহিলে।

বর্তমান অনুজ্ঞা—নহ, নহুক।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—নহিহ।

আধুনিক বাংলায় নির্দেশক বর্তমানের রূপ পাওয়া যায়।

সাধু ভাষায়—নহি, নই।

চলতি ভাষায়—প্রথম পুরুষ—নয়, ন'ন।

মধ্যম পুরুষ—নও, ন'স।

উত্তম পুরুষ—নই।

অসমাপিকা—নহিলে

(খ) নার<না+পার।

নার ধাতুর ব্যবহার শুধু কাব্যে ও কোন কোন উপভাষায় পাওয়া যায়। মধ্য বাংলায় ইহার ব্যবহার দেখিতে পাই—নারে, নারিএ, নারোঁ, নারিল, নারিব ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে ইহার রূপ পাওয়া যায়। যথা—নারে, নারি, নারিনু, নারিলি, নারিলি, নারিব, নারিবে, নারিস্ ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকটি নাস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়। এইগুলি আসলে নঞর্থক যৌগিক ক্রিয়াপদ। যেমন, নাঁদে<না+দেই; নাছিল<না+আছিল; নাসিতোঁ<না+আসিতোঁ; নাসিবোঁ<না+আসিবোঁ। আধুনিক বাংলায় নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া—না, না হয়, ন হয়, নয়, নাহি, নাহী, নাই, নার, লার।

অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite verbs)

বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদ তিনটি—

(১) -, -ইয়া অন্তক ল্যবর্থ অসমাপিকা (Conjunctive)

(২) -ইলে অন্তক ভূতার্থ অসমাপিকা (Conditional)

(৩) -ইতে অন্তক শত্রন্ত ও তুমর্থ অসমাপিকা (Infinitive, Gerund)

(১) -ই, -ইয়া অন্তক অসমাপিকা সংস্কৃত ক্ত্বাচ্ ও ল্যপের অর্থ প্রকাশ করে। ক্ত>ইত>ইঅ; ল্যপ্>য>ইয়>ই।

-ই অন্তক অসমাপিকার নিষ্ঠান্ত অতীতের বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। অপভ্রংশে ও প্রাচীন বাংলায় -ই অন্তক অসমাপিকার দৃষ্টান্ত মিলে। যেমন, বেজ্জ দেক্খি কি রোগ পলাই (বৈদ্যঃ * দৃক্ষিতঃ (=দৃষ্ট।) কিং রোগং পলায়িতঃ);

সহজ ছড়্ডি—ছর্দ্দি+লাপ্>ছড্ডইঅ>ছড্ডি ; সহজ নলিনী বন পইসি (=প্রবিষ্টঃ) নিবিতা।

'-ইঅ, -ইআ' অন্তক নিষ্ঠান্তের পদ প্রাচীন বাংলায় অসমাপিকার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, থির করি<স্থিরং কৃতম্ (কৃত্বা) ; জা লই<যৎ লব্ধং (=যৎ লব্ধ্বা)।

মধ্য বাংলায় -ই ও -ইয়া অন্তক দুই প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল। আধুনিক বাংলায় -ই যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ শুধু কাব্যে প্রচলিত।

শতৃপদের অর্থে ও '-ইয়া' অন্তক অসমাপিকার প্রয়োগ প্রাচীন বাংলায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ছোই ছোই যাই (=স্পৃশন্ যাতি)।

(২) -ইলে অন্তক অসমাপিকা আসিয়াছে ভাবে সপ্তমী (**Locative absolute**) কিংবা ভাবে তৃতীয়া (**Instrumental absolute**) হইতে। ক্ত>ত, ইত>ইঅ>ইল্ল >ইল+এ>ইলে (তৃতীয়া-সপ্তমী)।

প্রাচীন বাংলায়, সাঙ্কমত চড়িলে (=আরূঢ়ে, আরূঢ়েণ) 'সাঁকোতে চড়িলে'।

জীবন্তে মইলেঁ (মৃতে, মৃতেন)

মধ্য বাংলায়—দধি নঠ হৈলেঁ (=ভূতে, ভূতেন)

হাত বাঢ়াইলেঁ কি চান্দের লাগ পাই।

আধুনিক বাংলায়—সূর্য অস্ত গেলে সে কাজে গেল।

(৩) -ইতে অন্তক অসমাপিকা আসিয়াছে তৃতীয়া-সপ্তমীযুক্ত শতৃপদ হইতে। শতৃ>অন্ত>এন্ত>ইত>ইত্ + এ>ইতে (তৃতীয়া-সপ্তমী)।

যেমন—প্রাচীন বাংলায়, মূঢ়া আচ্ছন্তে (<*অচ্ছন্তেন, *অচ্ছন্তে=ভবতা), ভবতি) ; অমিঅঁ আচ্ছন্তে বিস গিলেসি ; আন চাহন্তে আন বিণঠা। দ্বিত্ব প্রয়োগও দেখা যায়—যেমন, চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর।

মধ্য বাংলায়—ভার লআঁ জাইতেঁ পসার টলিআ গেল ; না শুনিলোঁ তোর বোল লআঁ জাইতেঁ পাণী।

শত্রন্ত -ইতে অন্তক অসমাপিকা আধুনিক বাংলার ক্রিয়ায় দ্বিত্ব হইয়া থাকে। যেমন, প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতেছে।

তুমর্থরূপে আধুনিক বাংলায় -ইতে অন্তক অসমাপিকাই ব্যবহৃত হয়। যেমন, আমি কাজ করিতে আসিয়াছি।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় -ইব অন্তক পদ তুমর্থের অর্থে প্রযুক্ত হইত। যেমন, প্রাচীন বাংলায়—ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা (=বক্তুং) জায়। বাহবকে পারই (বাহিতে পারে)।

মধ্য বাংলায়—পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে।

সাধু ভাষায় -ইয়া ও -ইতে অন্তক অসমাপিকার অর্থে শতৃ জাত -অত, অন্তক অসমাপিকা ব্যবহৃত হয়। যেমন, তাহার বাক্য শ্রবণ করত মুনিবর কহিলেন।

ক্রিয়ায় স্বার্থিক প্রত্যয়

ক্রিয়াপদে স্বার্থিক প্রত্যয়ের ব্যবহার অপভ্রংশ স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলায় স্বার্থিক 'ক' পাই। যেমন, কএলেক, জালিলেক। মধ্য বাংলায় র, রু, ক প্রভৃতি কয়েকটি স্বার্থিক প্রত্যয়ের ব্যবহার রহিয়াছে। যেমন, বাজের (=বাজে); শোভের (=শোভে); দিয়ার (=দিয়া), কহিয়ারোঁ, দিবারু প্রভৃতি।

অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত পদ ছাড়া স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, বর্তমান—পোড়েক; অতীত—জালিলেক, দিলেক; ভবিষ্যৎ—নিবোঁক; অনুজ্ঞা—আছুক, ছুক, দেউক।

এতদ্ব্যতীত স্বার্থিক অনুসর্গস্থানীয় হা, হে, হো প্রভৃতি অব্যয়ের প্রয়োগ ও মধ্যবাংলায় লক্ষণীয়।

যেমন—অতীতকালে—গেলাহা, পসরিলহে;

ভবিষ্যৎকালে—দিবেঁহে।

সিআঁ<আসিয়া (=সে, আ-বা), গিআ (=গে, আ-বা) প্রভৃতি স্বার্থিক প্রত্যয়ের ব্যবহারও মধ্যবাংলায় দেখা যায়।

যেমন, আনগিআঁ চন্দ্রাবলী (আন-গে); আপন ইচ্ছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ (=চড়সে)।

ণিজন্ত ক্রিয়া বা প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verb)

সংস্কৃতে ণিজন্ত ক্রিয়ায় 'অয়' প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। একস্বর কিংবা আ-কারান্ত ধাতুতে '-অয়' স্থানে '-পয়' হইত। প্রাকৃত যুগেও নিজন্ত ক্রিয়ায় 'পয়' বিকরণই ব্যবহৃত হইত। বাংলায় ণিজন্ত ধাতুর '-আ' প্রত্যয় সম্ভবত '(আ)পয়' হইতে আসিয়াছে।

যেমন, সং প্রতাপয়তি>*পতিআবেই (প্রা)>পতিআই (প্রা-বা)>পাতিয়াএ (ম-বা); ত্রোটয়তি>তোড়েতি>তোড়ই; *বন্ধাপয়তি (=বন্ধয়তি)>বন্ধাবেই (প্রা)>বন্ধাবএ (প্রা-বা)>বাঁধায় (আ-বা); *কারাপয়তি (=কারয়তি)> করাবেই (প্রা)>করাএই (অপ)>করাঅই>করায়।

বাংলার প্রাচীন যুগে 'কৃ' ধাতুর যোগে যৌগিক ণিজন্ত ক্রিয়া প্রচলিত আছে। যেমন, ডাহ্ কএলা (প্রা-বা)>দাহ কৈলা (ম-বা)>দাহ করিলা (আ-বা)।

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কৃদন্ত বিশেষণের সঙ্গে 'কর্' ধাতু যোগ করিয়া ণিজন্ত ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, দাঁড় করোনো, শোয়া করানো, খাওয়া করানো।

বাংলায় মৌলিক ধাতুতে 'আ' প্রত্যয় যোগ করিয়া ণিজন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন, কর্+আ=করা—করায়; দেখ্ + আ=দেখা—দেখায়; দে+আ=দেওয়া—দেওয়ায়।

বাংলায় কতকগুলি মৌলিক ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে সংস্কৃত ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ হইতে। যেমন, চাল্ + আ=চালা—চালায়; পাড়্+আ=পাড়া—পাড়ায়।

নামধাতু (Denominative Verb)

কোন নাম বা শব্দ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে নামধাতু বলা হয়। বাংলায় ণিজন্তের মত "আ" প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু গঠিত হইয়া থাকে। কতকগুলি পুরানো নামধাতু বর্তমানে সাধারণ ধাতুর মত ব্যবহৃত হয়। যেমন, বাখানে (ম-বা) <ব্যাখ্যান; কামায়<কর্ম; দাঁড়ায়<দণ্ড; আগুলিয়া<আগল<অর্গল; গোড়াইল (ম-বা)<গোড় ("পা" অর্থে)।

মধ্য বাংলায় অনেক তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত মিলে। সাধুভাষায় ও নামধাতুর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, লতাইবে<লতা; অন্বেষিল<অন্বেষণ; প্রশংসিলা<প্রশংসা; চেতাইল<চেতন; দাঁড়াইয়া<দণ্ড।

বাংলায় "আ" প্রত্যয় ছাড়া ও নামধাতুর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, নিঃশঙ্কিল< নিঃশঙ্ক; নীরবিলা<নীরব।

উপভাষাগুলিতে নামধাতুর প্রচলন বেশি। যেমন, পাকিয়ে<পাকান; কিলাচ্ছে।

অকর্তৃক ক্রিয়া (Impersonal Verb)

বাংলায় এমন অনেক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে যেখানে কর্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেগুলিকে অকর্তৃক ক্রিয়ারূপ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ঐতিহাসিক বিচারে কর্তাহীন ক্রিয়া বাংলায় নাই। এখানে আসল কর্তা ভাবে ষষ্ঠী বিভক্তি-যুক্ত পদ। যেমন, ভয় করা, ইচ্ছা করা, শীত করা, রাগ হওয়া, ক্ষুধা পাওয়া, ইচ্ছা হওয়া ইত্যাদি।

"আকাশে মেঘ করেছে"—বাক্যে খাঁটি অকর্তৃক ক্রিয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়।

অ-পূর্ণরূপ ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া (Defective Verb)

প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহাদের সবকালে ও ভাবে রূপ পাওয়া যায় না। এইগুলিকে বলা হয় অ-পূর্ণরূপ ক্রিয়া। যেমন, সংস্কৃতে দশ্ ধাতুর বর্তমান কালে রূপ নাই। স্পশ্ ও ব্রূ ধাতুর শুধু বর্তমান কালেই রূপ পাওয়া যায়।

এইরূপ বাংলায় আছ<অস্ ধাতুর রূপ ভবিষ্যৎকালে নাই। গম্ ধাতুর রূপ কেবলমাত্র অতীতকালে ও অসমাপিকায় পাওয়া যায়। যেমন—গেল, গিয়াছিল, গিয়া।

চলতি ভাষার "যা" ধাতুর প্রয়োগ অতীতকালে ও অসমাপিকায় নাই। "আ" ধাতু <আ+যা শুধু অতীত কাল, অনুজ্ঞা ও অসমাপিকায় ব্যবহৃত হয়। যেমন, প্রাচীন বাংলায়—আইলা ; মধ্যবাংলায়—আইল ; আধুনিক বাংলায় এল, এলাম, এলে, এলেন ; অনুজ্ঞায়—আয়।

বট্ ধাতুর প্রয়োগ শুধু বর্তমানকালে মিলে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সংখ্যাবাচক শব্দ (Numerals)

তিন শ্রেণীর সংখ্যাবাচক শব্দ বাংলায় প্রচলিত।

(১) বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ (Cordinal numpers)—কেবল মাত্র সংখ্যা বুঝাইলে তাহা বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ—যেমন, পাঁচ, দশ, পনর। বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ বিশেষ্য, আর ক্রমিক সংখ্যা শব্দ বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়। যেমন, পাঁচজন, দশ ঘর ইত্যাদি। সংখ্যাশব্দের পর নির্দেশক শব্দ বা প্রত্যয় যুক্ত হইলে বিশেষণের অর্থ দ্যোতিত হয়। যেমন, পাঁচতা কাগজ, দশজন লোক, পঁচিশটা বাড়ী। তুইমণ চাউল, চারি আনা, পাঁচগজ কাপড় প্রভৃতি বাক্যাংশে সংখ্যা শব্দ সহযোগী বিশেষ্য (Noun in apposition)।

বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দগুলির উৎপত্তির ইতিহাস জটিল। অনেক ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। তুই একটি দেশী কিংবা বিদেশী শব্দ ছাড়া বাংলা সংখ্যা বাচক শব্দগুলির সবই তদ্ভব।

এক<এক্ক (প্রা)<এক। শ্রীযুক্ত স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় "এক" শব্দকে অর্ধ-তৎসম মনে করেন। বাংলা উচ্চারণ "এ্যাক্" (ae:k)। সংস্কৃতে এক শব্দ বিশেষণ। একুশ, একুন প্রভৃতি শব্দে এক<এক্কু (অবহট্ঠ) হইতে আসিয়াছে।

দুই—বাংলা দুই আসিয়াছে দ্বি শব্দের প্রথমার একবচনে ক্লীবলিঙ্গের রূপ "দ্বে" হইতে। দ্বে>দুবে, দুবি>দুএ>দুই>দু (কথ্য ভাষায়)। "দু" প্রাতিপাদিকে পরিণত হইয়াছে। যেমন, দুফলা দুনলা, দুপর।

"দো" আসিয়াছে পুলিংঙ্গ প্রথমার একবচন দ্বৌ হইতে।

দ্বৌ>দো (প্রা)>দো (প্রা-বা) ; যেমন, দো-বাটা।

দো শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসে ও ব্যবহৃত হয়। যেমন, দোহারা, দোফলা, দোসরা ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলায় প্রাপ্ত বেণি<*দ্বীণি হইতে আসিয়াছে। দ্বীণি (ত্রীণি-শব্দের সাদৃশ্যে)>বেণ্নি>বেণি।

দ্বা (বৈদিক পুংলিঙ্গ প্রথমার রূপ)>দ্‌বা (প্রা-বা)ব, বা। যেমন, বত্রিশ, বার, বাহান্ন, বাষট্টি, বাহাত্তর।

দ্বি>বিআ—বিয়াল্লিশ ; বিআ>বিরা—বিরাশী, বিরানব্বই।

তিন—সং ত্রীণি>*তীরণি>তিণ্ণি (প্রা)>তিনি, তিনা (প্রা-বা)>তিন।

তিঅ (প্রা-বা)<ত্রিক।

অন্য সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ইহার রূপ তে, তি, তিরা।

সং ত্রয়ঃ>তে (আদি-মধ্য আর্য)>তে

যেমন, তেইশ, তেসরা, তেমাথা, তেজ।

সং ত্রি>তি (প্রা)>তি। যেমন, তিপ্পান্ন, তিয়াত্তর। প্রাচীন বাংলায় তিহুঅন, মধ্যবাংলায় তিয়জ।

চারি—সং চত্বারি (প্রা)>চারি (অপ)>চাইর>চার। চো, চৌ—সং চতুঃ>চউ (প্রা)>চউ, চৌ।

যেমন, চৌদ্দ, চৌগুণ, চৌঠা।

পাঁচ—(১) পঞ্চ>পঞ্চ (প্রা)পঞ্চ, পাঞ্চ (প্রা-বা)>পাঁচ। (২) পঁয়, পঞ্<পংজ (গান্ধারী প্রাকৃতে)<পঞ্চ।

যেমন, পঁয়ত্রিশ, পঁয়ষট্টি, পঞ্চান্ন।

(৩) পঁচ<পঞ্চ। যেমন, পঁচিশ, পঁচাশী।

(৪) পন<পন্ন<পঞ্চ। যেমন, পনর, তিপ্পান্ন, পঞ্চান্ন।

ছ, ছয়—সং ষট্>ছ (প্রা)>ছহ (অপ)>ছ, ছয় ; অন্য শব্দের সঙ্গে ছা, ছি হয়। যেমন, ছাব্বিশ, ছিয়াত্তর।

সাত—সপ্ত>সত্ত (প্রা)>সাত ; অন্য শব্দের সঙ্গে ইহার রূপান্তর সাঁয়, সাতা ; যেমন—সাঁয়ত্রিশ, সাতানব্বই।

আট, আঠ—অষ্ট, অষ্টা>অট্‌ঠ (প্রা)>আঠ>আট।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় অট, অঠ পাওয়া যায়। অন্য সংখ্যার পূর্বে আটা হয়। যেমন, আটাত্তর, আটানব্বই।

ন, নয়—সং নব>নঅ, নো (প্রা)>ন, নয়।

দশ—সং দশ>দস (প্রা, অপ)>দশ। প্রাচীন বাংলায় দহ<দহ (প্রা, অপ)<দশ।

এগার হইতে আঠার পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দগুলির মধ্যে দুইটি ধ্বনিপরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম দ>র হইয়াছে (দ>ড>ল>র) ; শ>হ হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে।

এগার—একাদশ>এগ্‌গারহ (অপ)>এগারঅ>এগার (ম-বা)>এগার। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে 'এবার' পাওয়া যায়।

বার—দ্বাদশ>দ্‌বাদস (আদি মধ্য-আর্য)>বারস>বারহ (প্রা)>বারহ (প্রা-বা, ম-বা)>বার।

বিষমীভবনের জন্য দ>র হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আঠ চারি (=১২) পাওয়া যায়।

অর্ধতৎসম দুবাদশ, দোয়াদশ<দুবাদশ (আদি মধ্য-আর্য)<দ্বাদশ।

তের—ত্রয়োদশ>ত্রেদশ (গির্ণার অনুশাসন)>তেদশ (আদি মধ্য-আর্য)>তেরস (প্রা)>তেরহ (অপ)>তের।

চৌদ্দ, চোদ্দ—চতুর্দশ>চউদ্দশ, চোদ্দস (প্রা)>চউদ্দহ (অপ)>চৌদ্দ, চোদ্দ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দশচারি>দহচারি (অপ) (=১৪) পাওয়া যায়।

পনর, পনের—পঞ্চদশ>পন্নরহ>পনরঅ>পনর, পনের।

ষোল—ষোড়শ (ইন্দো-ঈরাণীয় খ্‌ষ্‌দশ)>সোলস (প্রা)>সোলহ (অপ)>ষোল।

সতর, সতের—সপ্তদশ>সত্তরস>সত্তরহ>সতরঅ>সতর, সতের।

আঠার—অষ্টাদশ>আট্‌ঠারস (প্রা)>অট্‌ঠারহ (অপ)>আঠার।

উনিশ—(ক) একোনবিংশ (=একোনবিংশতি)>এগুনবীস>অউণবীস (অর্ধ-মাগধী)>উনিশ।

(খ) ঊনবিংশতি>ঊনবীসই>ঊনবীস>ঊনঈশ>ঊনিশ।

বিশ—বিংশ (=বিংশতি)>বীস (প্রা)>বিশ। কুড়ি শব্দ কোল ভাষা হইতে গৃহীত।

একুশ—একবিংশ(=একবিংশতি)>এক্ক+বীস (অপ)>এক্কুঈশ>একুঈশ> একুশ।

তুলনীয় হিন্দী একইস, পূর্ববঙ্গের ভাষায় একইশ।

বাইশ—দ্বাবিংশ (=দ্বাবিংশতি)>বাবীস (প্রা)>বাইস (অপ)>বাইশ।

তেইশ—ত্রয়োবিংশ (=ত্রয়োবিংশতি)>তেবীস (প্রা)>তেইস (অপ)>তেইশ।

চব্বিশ, চবিশ—চতুর্বিংশ (=চতুর্বিংশতি)>চউবীস (প্রা)>চবিশ।

পঁচিশ—পঞ্চবিংশ (=পঞ্চবিংশতি)>পঞ্চবীস (প্রা)>পচীস (অপ)>পঁচিশ।

ছাব্বিশ—ষড়বিংশ (=ষড়বিংশতি)>ছব্বীস (প্রা, অপ)>ছাব্বিশ।

সাতাইশ—সপ্তবিংশ (=সপ্তবিংশতি)>সত্তবীস (প্রা)>সাতাইশ।

আটাইশ, আটাশ—অষ্টবিংশ (=অষ্টবিংশতি)>অট্‌ঠঈশ>আটাইশ, আটাস।

ঊনত্রিশ—একোনত্রিংশ (=একোনত্রিংশৎ)>একুনত্রিশ>এউনত্রিশ>ঊনত্রিশ।

ত্রিশ, তিরিশ—(অর্ধ-তৎসম)<ত্রিংশৎ।

তিস, তীস (প্রা-বা)<ত্তীস (প্রা)<ত্রিংশৎ ; বত্তিশ, তেত্তীস শব্দে লক্ষণীয়।

বত্রিশ, বত্তিশ—দ্বাত্রিংশৎ>বত্তিস (প্রা)>বত্তিস (প্রা-বা)>বত্রিশ, বত্তিশ।

তেত্রিশ, তেত্তিশ—এয়স্ত্রিংশৎ>তেত্তীস (প্রা)>তেতীস (প্রা-বা)>তেত্রিশ, তেত্তিশ।

পঁয়ত্রিশ—পঞ্চত্রিংশৎ>পনতীস (প্রা)>পঁয়তিস>পঁয়ত্রিশ।

চল্লিশ, চাল্লিশ—ইহা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মের মধ্যে পড়ে না। চত্বারিংশৎ>চত্তালিসং> চয়ালীস (অর্ধ মাগধী>চালীস (অপ)>চল্লিশ, চাল্লিশ।

বিয়াল্লিশ, বেয়াল্লিশ—দ্বাচত্বারিংশৎ> *দ্‌বাতারীস>বায়ালীস (অর্ধ-মাগধী)> বিয়াল্লিশ।

বিয়াল্লিশ ও চুয়াল্লিশ শব্দে চল্লিশের 'চ' লুপ্ত হইয়াছে।

তেতাল্লিশ শব্দের সাদৃশ্যে পঁয়তাল্লিশ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে 'পাঁচচল্লিশ'।

পঞ্চাশ—পঞ্চাশৎ>পঞ্চাশ।

একান্ন—একপঞ্চাশৎ>একান্ন।

বায়ান্ন—দ্বাপঞ্চাশৎ>*বাবন্নাহ>বায়ান্ন।

পিশেল একান্ন (এক+অন্ন), বায়ান্ন (=বা+অন্ন) শব্দের অন্ন পঞ্চাশৎ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করেন।

পঞ্চাশৎ>পঞ্চশৎ>* পঞ্চৎ>বন্নঃ>অন্ন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।

বাহান্ন—দ্বাপঞ্চাশৎ>বাহান্ন (হ-শ্রুতি)

পঞ্চান্ন, পাঁচপান্ন—পঞ্চ পঞ্চাশৎ>পঞ্চান্ন।

ছাপ্পান্ন—ষট্‌পঞ্চাশং>ছপ্‌পঞ্‌ঞাস (পালি)>ছাপ্পান্ন।

তিপ্পান্ন শব্দের "প" দ্বিত্ব হইয়াছে ছাপ্পান্ন শব্দের সাদৃশ্যে।

ষাটি, ষাট—ষষ্টি>সট্‌ঠি (প্রা)>ষাটি>ষাইট>ষাট।

চৌষট্টি—চতুঃষষ্টী>চউশঠী, চউষট্‌ঠী (প্রা-বা)>চৌষাট (ম-বা)>চৌষট্টি।

সত্তর—সপ্ততি>সপ্তটি>সপ্তডি>সত্তরি>সত্তর (স্বতোমূর্ধন্যীভবন)।

জুলব্লকের মতে বিষমীকরণ হেতু ত>র হইয়াছে। সপ্ততি>সত্তরি>সত্তর।

একাত্তর—এক সপ্ততি>এক হত্তরি>একহত্তর>একাত্তর।

বাহাত্তর শব্দ ব্যতীত পরবর্তী সংখ্যাবাচক শব্দগুলিতে "হ" লুপ্ত হইয়াছে।

আশি, আশী—অশীতি>অসীই (প্রা)>অসি (অপ)>আশী। (শ্বাসাঘাত হেতু আদিস্বরের দীর্ঘতা)

বিরাশী<দ্বি-অশীতি ; বিরাশী শব্দের "র" তিরাশির সাদৃশ্য জাত।

তিরাশি<*ত্রয়ঃ অশীতি, ত্রি-অশীতি।

চুরাশি—চতুঃঅশীতি>চৌআশি>চুরাশি।

নব্বই—অর্ধ-তৎসম ; নবতি শব্দের মধ্যবর্তী স্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণ ব-কারের দ্বিত্ব হইয়াছে।

নই—নবতি>ণউই (প্রা)>নই।

বিরানব্বই, তিরানব্বই, চুরানব্বই, নিরানব্বই প্রভৃতি শব্দের "র" তিরাশি, চুরাশি প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্য জাত।

শ, শো—শত>সঅ>শয়>শো, শ।

ভগ্নাংশিক শব্দ (Fractional numbers)

চৌঠা (১/৪)—চতুর্থ>চউট্‌ঠ>চৌঠা (শুধু মাসের তারিখেই প্রযুক্ত হয়)। চৌথ—চতুর্থ>চউত্থ>চৌথ।

তেহাই (১/৩)<ত্রিভাগিক।

আধ (১/২)—অর্ধ>অদ্ধ (প্রা)>অধ (প্রা-বা)>আধ (ম-বা) ; যেমন, আধলা, আধ-পয়সা।

আড়—অর্ধ>অড্‌ঢ (প্রা)>আড় ; যেমন, আড় ঘোমটা।

সাড়ে—সার্ধ>সাড্‌ঢ>সাড়ে; যেমন, সাড়ে পাঁচ। দেড় (১১/২)—দ্বি+অর্ধ>দিঅড্‌ঢ>দিআঢ়>দেঢ়>দেড়। আড়াই (২১/২)—অর্ধতৃতীয়, অর্ধত্রিক>অড্‌ঢতীয় (প্রা)>অড্‌ঢঈঅ>আড়াই।

আহুঠ (৩½)—অর্ধচতুর্থ>*অধউট্‌ঠ>আউট (ম-বা)>আহুঠ (তুলনীয়-পালি, অড্‌ঢউড্‌ঢ, অর্ধ মাগধী অদ্ধউথ)

বাংলার সংখ্যাশব্দের সাহায্যে ভগ্নাংশ প্রকাশ করা হয়; সেক্ষেত্রে বৃহত্তর সংখ্যায় ষষ্ঠী বিভক্তি যোগ করা হয়। যেমন, সাতের এক = ১/৭, আটের তিন = ৩/৮ ইত্যাদি।

নিম্নমানের মুদ্রাবাচক ও উন্মানবাচক শব্দগুলিও ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। যেমন, আনা = ১/১৬; সিকি = ১/৪।

পোয়া (১/৪)<পাদ; সওয়া<সপাদ; পৌনে<পাদোন।

পূরণবাচক বা ক্রমিক শব্দ (Ordinal numbers)

তদ্ভব পূরণবাচক শব্দ মাসের তারিখ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়।

যেমন, পয়লা, পহেলা<পহিলে (প্রা-ব্য)<পধমিল্ল (খারবেল লিপি)<প্রথম+ইল।

দোসরা<দ্বিসর; তেসরা<ত্রি+সর (হিন্দীতে দুসরা, তিসরা); চৌঠা<চউঠ<চউট্‌ঠ<চতুর্থ; পাচই<পঞ্চমিক (মিক>বিঅ>বি>ই); ছয়ই<ছয়+ই (<মিক); দসই<দশমি, দশমী (প্রা-বা, ম-বা)<দশমিক; সাতাসে<সাত-মাসিয়া; আটাসে<আট-মাসিয়া; চৌতিসা<চতুদ্‌-ত্রিংশৎ-ইকা।

অপর কয়েকটি প্রচলিত পূরণবাচক শব্দ :—

দোজ<দুঅজ (ম-বা)<দুইজ্জ (প্রা)<*দ্বিত্য (=দ্বিতীয়)

তুলনীয়—আবেস্তীয় দ্‌বিত্য; যেমন, দোজবর। মেজ<মজ্‌ঝঅ<মধ্যক; যেমন, মেজদা।

তেজ<তিঅজ (ম-বা)<তিঅজ্জ, তিজ্জ, তইজ্জ (প্রা)<*ত্রিত্য(=তৃতীয়); যেমন, তেজবর। সেজ<ফারসী সে (তৃতীয় অর্থে)+জ।

আধুনিক বাংলায় পূরণবাচক সংখ্যা শব্দ গঠনে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন—পাঁচের নামতা, দশের কোঠা।

গুণিতক (Multiplicative)

একলা<একলা (ম-বা)<একল্ল (অবহট্‌ঠ)<এক+ল। একহারা<*একভার; একসর (ম-বা)<এক+সর—(লোক ব্যুৎপত্তির ফলে "একেশ্বর"); একসরী (স্ত্রীলিঙ্গ)<একেশ্বরী। দোস্‌রা (মাসের তারিখে ব্যবহৃত)<দোসর (ম-বা)<*দ্বিস্বর। দোহারা<*দ্বিভার; দ্ব্যভার, (দোহারা চেহারা)।

একুন<এক-পূর্ণ>উণ্ণ।

দুনা<দুগুণ (ম-বা)<দুউণ (প্রা.)<দ্বিগুণ।

দুআ (প্রা-বা)<*দ্বিক, দ্বিত্য।

তেসর<তেসর (ম-বা)<*ত্রিস্বর (মাসের তারিখে ব্যবহৃত); তেহারা<ত্রিভার; চৌগুণা (ম-বা)<চতুঃগুণ;

সাতেসরী (ম-বা, স্ত্রীলিঙ্গ)<সপ্তস্বরী।

অনির্দেশক (Indefinite)

দুইটি পৃথক সংখ্যাশব্দ একত্রে ব্যবহৃত হইলে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায়। যেমন—তখনে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত (ম-বা)।

অবহট্‌ঠেও এইরূপ প্রয়োগ ছিল। প্রাকৃত পৈঙ্গলে পাই—"জনা দুই চার"। সংখ্যা-বাচক শব্দের পূর্বে নির্দেশক শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায়। যেমন, সাত পাঁচ ভাবিয়া কি লাভ হইবে?" গুটি চারি ফল হের আছে মোর হাতে!" (ম-বা)। পরিমাণ বাচক শব্দের পরে সংখ্যা শব্দ প্রযুক্ত হইলেও একই অর্থ দ্যোতিত হয়। যেমন, সের দই দুধ; শ পাঁচেক টাকা।

বিংশ অধ্যায়

অবহট্‌ঠ ও প্রাক্-বাংলাভাষা

অপভ্রংশের যুগে একমাত্র শৌরসেনী অপভ্রংশই সমগ্র উত্তর-ভারতে লৌকিক সাহিত্যের বাহনরূপে প্রচলিত ছিল। অন্যান্য অপভ্রংশগুলি শুধু কথ্য ভাষারূপেই ব্যবহৃত হইত। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী হইতে শৌরসেনী অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ পূর্বভারতেও সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। জৈনগণ, বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ ও অন্যান্য কবিগণ অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ ভাষাতেই বিভিন্ন কাব্য, কবিতা ও দোহা রচনা করেন। দশম শতাব্দীতে রচিত জৈন সাহিত্যে পুষ্পদন্তের 'নায়কুমার চরিউ' (নাগকুমার চরিত) ও 'জসহর চরিউ' (যশোধর চরিত্র) গ্রন্থ দুইটি উল্লেখযোগ্য। অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত সরহপাদ, কাহ্নপাদ ও তিল্লোপাদের দোহাগুলি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের রচনা। অবহট্‌ঠ ভাষায় অনেক প্রকীর্ণ কবিতাও রচিত হইয়াছে। জৈন হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে কিছু প্রকীর্ণ অর্বাচীন কবিতার নমুনা

পাওয়া যায়। শুভঙ্করের আর্যায় এবং ডাক ও খনার বচনে অবহট্‌ঠের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়।

যেমন, (১) কুড়্‌বা কুড়্‌বা কুড়্‌বা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়্‌বা কাঠায় লিজ্জে॥
(শুভঙ্করের আর্যা)

(২) পড়িলে পাবা দুধু ভাতা।
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতা॥
(ডাকের বচন)

বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের সঙ্গে 'দোহাকোষ' এবং 'ডাকার্ণব' নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দোহাগুলি এবং ডাকার্ণব শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রমুখ সিদ্ধাচার্যগণ একদিকে যেমন চর্যাগীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহারাই আবার অর্বাচীন অপভ্রংশে দোহাগুলি লিখিয়াছিলেন। সুতরাং ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে দোহাকোষগুলিতে প্রাক্ বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, চর্যাগীতিগুলি রচিত হইবার পূর্বেই অপভ্রংশ এবং মাগধী প্রাকৃতের মিশ্রণে প্রত্ন বাংলা ভাষার (**Proto-Bengali**) কাঠামো তৈয়ারী হইয়াছিল। ধর্মপ্রচারে জৈন ও বৌদ্ধসাধকগণ লৌকিক অবহট্ট ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্যদের রচিত দোহাকোষে যে ধর্ম সাধনার কথা ব্যক্ত হইয়াছে, চর্যাপদেও সেই সাধনার কথাই বিবৃত হইয়াছে। পরবর্তীকালে নাথ সাহিত্যে ও বাউল সঙ্গীতে এই ধারাই প্রবাহিত হইতে দেখি।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত "প্রাকৃত পৈঙ্গল" এর কয়েকটি শ্লোকে প্রত্ন-বাংলা ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

যেমন, আরে রে বাহহি কাহ্ন নাব ছোড়ি
ডগমগ কুগত্তি ণ দেহি।
তই ইত্থি ণঈহি সন্তার দেহি
যো চাহসি সো লেহি॥

ওরে রে কৃষ্ণ, তুমি ছোট নৌকাটি অস্থিরভাবে বাহিতেছ। (আমাদিগকে) কুগতি দিও না। অতএব এই নদীতে সাঁতার দিয়া (পার করিয়া দিয়া) যাহা চাও, তাহাই লও।

সো মঝু কন্তা দূর দিগন্তা।
পাউস আবে চেলু দুলাবে॥

সেই আমার কান্ত দূর প্রবাসে (আছে)। বর্ষা আসিতেছে, আমার বস্ত্রাঞ্চল দুলিতেছে (অর্থাৎ চিত্ত চঞ্চল)।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতির "কীর্তিলতা" কাব্যখানিও অবহট্‌ঠে রচিত। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

দেসিল বঅনা সবজন মিট্‌ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পওঁ অবহট্‌ঠা॥

দেশী বচন সকলের নিকট মিষ্ট ; এই হেতু অবহট্‌ঠে জল্পনা করিতেছি।

জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" কাব্যের শ্লোকগুলির ভাষা, রচনা শৈলী ও ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া অনেক পণ্ডিতের ধারণা হইয়াছে যে, গ্রন্থটি প্রথমে প্রাচীন বাংলায় কিংবা শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে গ্রন্থটি সংস্কৃতে অনূদিত হয়।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের "টীকাসর্বস্ব" গ্রন্থে এবং বাংলায় প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন তাম্রশাসন লিপির মধ্যে এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি নিঃসন্দেহে প্রত্ন-বাংলার শব্দরূপে গৃহীত হইতে পারে। আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষার উদ্ভবের পরেও অবহট্‌ঠের প্রভাব খানিকটা বজায় ছিল। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন, ব্রজবুলি ভাষা হইতেছে অর্বাচীন অপভ্রংশের "সাক্ষাৎ বংশধর"। বাংলা ছন্দেও অবহট্‌ঠের প্রভাব লক্ষণীয়। অবহট্‌ঠের ব্যাকরণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কারক-বিভক্তি মাত্র দুইটি—(১) কর্তা-কর্ম ; (২) করণ-অধিকরণ। ক্রিয়াপদে যৌগিক ক্রিয়ার (Compound Verb) প্রচলন দেখা যায়। প্রাচীন বাংলায়ও যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার আছে। সুতরাং অবহট্‌ঠ ভাষাই ছিল প্রাচীন বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

বাংলা ভাষার যুগ বিভাগ

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাওয়া যায়—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদি ও মধ্যযুগের বাংলাকে সাধারণত প্রাচীন বাংলা বলা হইয়া থাকে।

বাংলা ভাষার সাধারণ লক্ষণ :—

(ক) -"রা, -এরা" দ্বারা কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ গঠন।

(খ) "দিগকে, দিগের, দের" প্রভৃতির সাহায্যে তির্যক কারকের বহুবচনের পদ সৃষ্টি।

(গ) -'রে, -ক, -কে' দিয়া গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের এবং -'ত, -তে' দিয়া অধিকরণের পদ গঠন।

(ঘ) মাঝ, সঙ্গে, কাছে, হইতে, থেকে প্রভৃতি অনুসর্গের সাহায্যে কারকের অর্থ প্রকাশ।

(ঙ) "-ইল" প্রত্যয়ের অতীতকালে এবং "-ইব" প্রত্যয়ের ভবিষ্যৎকালে প্রয়োগ

(চ) -ইলে, -ইতে দ্বারা অসমাপিকার পদ সৃষ্টি।

প্রাচীন বাংলার নিদর্শন

বাংলার আদিযুগের স্থিতিকাল দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী (খ্রীষ্টীয়-১০০০-১৩০০)। এই যুগের প্রধান নিদর্শন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত **বৌদ্ধগাণ ও দোহা** নামক গ্রন্থের অন্তর্গত "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" এর বৌদ্ধগানগুলি। সূচনায় বাংলা সাহিত্যের নিঃসঙ্গ নিদর্শনরূপে চর্যাগীতিগুলির মূল্য অসীম। বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ বিরচিত অমর কোষের ব্যাখ্যা গ্রন্থ **'টীকা সর্বস্ব'** (দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ) নামক গ্রন্থে চারি শতাধিক বাংলা তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম ও দেশি শব্দের সন্ধান মিলে। যেমন, চিড়া<চিপিটক; উআরী<উপকারিকা; পেড়া<পেটক; মউড়<মুকুট; লাচ্ছ<রথ্যা; পরশু<পরশ্বঃ; ফোড়<স্ফোটক; থলি (=থইল); চাল; ঝাব (=ঝাউ); তেলাকোচ; পগার<প্রাকার (তুলনায় ফারসী পইগার); পিম্পড়ী (পিপিড়া); তেলাবনী; ভরুড; ঝম্পাণ (পাল্‌কি); জুয়াল (জোয়াল) ইত্যাদি।

সেক শুভোদয়ায় সঙ্কলিত কয়েকটি গান ও ছড়া, বৌদ্ধ কবি ধর্মদাসের রচিত "বিদগ্ধ মুখ মণ্ডনম্" গ্রন্থের দুই চারিটি ছত্রে কিছু কিছু প্রাচীন বাংলার নমুনা পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত কতকগুলি তাম্রশাসনে (Copper-plate Inscriptions) এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলিকে বাংলার প্রাচীন রূপ বলিয়া মনে হয়।

যেমন, জোল (নালা, খাল অর্থে), বরজ (পানের বোরজ), খাড়ী, খিল, আড়া (ধানের মাপ), বাল্লহিট্ঠা (আধুনিক বালুটে, স্থানের নাম), বেতড্ড (=বেতড়, স্থানের নাম), বকতক (=বাকতা), খড্ডজোটিকা (=আধুনিক খাঁড়জুলি) প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক গীতি কাব্য, মঙ্গল কাব্য, গ্রাম্যছড়া ও গান সম্ভবত এই যুগে রূপ পাইতেছিল।

প্রাচীন যুগের বাংলার বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি হইতেছে এই:— ধ্বনিতত্ত্বের রীতি অনেকটা অন্ত্য অপভ্রংশের মত। তবে সংযুক্তবর্ণের সমীভবন ও পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে এই যুগে। অ-কারের উচ্চারণ বিবৃত অ (`o) হয় নাই। ইঅ>ঈ হইত, অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্ত্যস্বরধ্বনির উচ্চারণ বজায় ছিল। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জন-

ধ্বনির বিলুপ্তি ঘটিত এবং উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে য-ধ্বনি বা ব-ধ্বনির আগম ঘটিত। ষষ্ঠী বিভক্তিতে আ, আহ<অস্য, -অর<কর, -এর<কের প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইত। সপ্তমীতে -ই, -অহি, -অহী প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল। কারক বিভক্তির অর্থে কিছু কিছু অনুসর্গের ও প্রচলন ছিল। উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ সর্বনামের একবচনে বহুবচনের পদ ব্যবহৃত হইত। অতীতকালে "-ইল" প্রত্যয়ের ব্যবহার পাওয়া গেলে ও অনেক সময় "ল" প্রত্যয়হীন অতীতকালের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ও অকর্মক ক্রিয়ার বিশেষণরূপে প্রয়োগ লক্ষণীয়। ভবিষ্যৎকালে হ<ষ্য এবং কর্মবাচ্যে "-ইঅ" প্রত্যয়ের প্রয়োগ ও দৃষ্ট হয়। সামান্য কিছু তৎসম শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গেলেও শব্দ-ভাণ্ডারে তদ্ভব শব্দই বেশি।

চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতাব্দী। এই সময় লৌকিক সাহিত্যের বাহন ছিল শৌরসেনী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ। এজন্য চর্যার ভাষায় অবহট্‌ঠের প্রভাব দেখা যায়। যেমন—জিম, তিম, কইসে, জইসোঁ, জসু, তসু, অইসন, জৈসন, কিম্‌পি, মা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ। "মি" বিভক্তিযুক্ত উত্তম পুরুষের ক্রিয়া—লেমি, পুছমি, পীবমি ইত্যাদি ; "ইউ" বিভক্তি যুক্ত অতীতকালের ক্রিয়াপদ—গউ<গত;, তোড়িউ<ত্রোটিতঃ, প্রভৃতির ব্যবহারও লক্ষণীয়।

চর্যাগীতিগুলি বাংলা ভাষারই প্রাচীন রূপ বলিয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তবে অন্যান্য ভাষার পণ্ডিতগণ চর্যাগীতিগুলিকে তাহাদের ভাষার প্রাচীন রূপ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন চর্যার পদগুলি প্রাচীন হিন্দীভাষায় রচিত বলিয়া মনে করেন। ডঃ কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল বলেন—চর্যার ভাষা পাটনা ও মগধের প্রাচীন ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীজয়কান্ত মিশ্রের মতে চর্যাপদ প্রাচীন মৈথিলী ভাষায় রচিত। আবার কেহ কেহ মনে করেন চর্যাগীতি কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রাচীন রূপ নয়, ইহা একটি মিশ্রিত ভাষা। কিন্তু নিম্নের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে তাহাদের এই সিদ্ধান্ত কষ্ট-কল্পনা প্রসূত।

চর্যায় ২২ জন কবির রচনা-সম্বন্ধ সাড়ে ছয়চল্লিশটি গান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কাহ্নপাদের ১২, ভুসুকুর ৮, সরহের ৪, লুই, কুকুরী, শান্তি, শবর প্রত্যেকের ২টি করিয়া পদ আছে। অন্যান্য সাধক-কবির প্রত্যেকের একটি করিয়া পদ পাওয়া যায়। ইহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রত্যেক কবির ভাষা যে একরূপ হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া যে সময়ে চর্যাগীতিগুলি রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষাগুলি মাগধী অপভ্রংশ হইতে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এক গোষ্ঠীজাত ভাষা বলিয়া ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। বৌদ্ধগানের ভাষা প্রাচীন বলিয়া শৌরসেনী অপভ্রংশ ও হিন্দীর সহিতও কিছু সাদৃশ্য থাকিতে পারে। আর অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার দুই একটি শব্দ বা প্রত্যয়-বিভক্তি থাকিলেই যে গীতিগুলিকে সেই ভাষার প্রাচীনতম রূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহাও যুক্তিগ্রাহ্য নহে। এতদ্ব্যতীত তখন পর্যন্ত ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ করে নাই। চর্যাগীতির ভাষার মধ্যে আর্যদেবের রচনায় ওড়িয়া, শান্তিপাদের রচনায় মৈথিলী, কাহ্ন, সরহ ও ভুসুকুপাদের রচনায় বাংলার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। অসমীয়া ভাষারও দুই একটি প্রত্যয়-বিভক্ত এবং শব্দ রহিয়াছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ চর্য্যাগীতিকে হিন্দী ভাষার পূর্বরূপ বলিয়া যে মনে করেন, তাহার পিছনেও কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নাই। এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে চর্যার পদকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন ওড়িশা, মিথিলা ও কামরূপের অধিবাসী হইতে পারেন। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মৈথিলী, ওড়িয়া হিন্দী ও অসমীয়ার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি চর্যাগীতিগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

মৈথিলীর অতীতকালে "-অল", ভবিষ্যৎ কালে "-অব", বর্তমানকালের প্রথম পুরুষের "-অথি" প্রত্যয়ের প্রয়োগ শান্তিদেবের পদ ব্যতীত অন্যত্র নাই। ওড়িয়ার অধিকরণে "-রে", আছ ধাতুর অতীতকালে "থিল" প্রত্যয়ের ব্যবহার আর্যদেবের পদ ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না।

অসমীয়ার বহুবচনের বিভক্তি "বোর", "হঁত", "বিলাক" প্রভৃতির প্রয়োগ চর্যায় নাই। কর্মে "-ক", অধিকরণে "-ত" বিভক্তির প্রয়োগ প্রাচীন বাংলা ও অসমীয়ার বৈশিষ্ট্য। তুলি (অসমীয়া "তুরু") শব্দ সিলেটে প্রচলিত। কুক্কুরীপাদের পদ "ধরণ না যাই" (ধরণ না যায়) পূর্ববঙ্গের ভাষার বৈশিষ্ট্য। চর্যার পটভূমি হইতেছে নদী মাতৃক বাংলা দেশ। চর্যায় পউমা (=পদ্মা), বঙ্গাল প্রভৃতি শব্দের মধ্যে বাংলার সমাজ-জীবনের কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভদ্রেতর জীবনের যে পরিচয় চর্যাপদে উপস্থিত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত যে সব উপকরণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে এইগুলি বাংলাদেশের নিজস্ব।

পদান্বয় ও ধ্বনিতত্ত্ব বিচারে দেখা যাইবে যে চর্যাগীতিগুলিতে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

চর্যার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল—

১। পদান্তের স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইত :—জলিত>জলিঅ ; ভণতি>ভণই ; সংবোধিত>সংবোহিঅ।

ইঅ>ঈ রূপে উচ্চারিত—উত্থিত>উট্‌ঠিঅ>উঠি ; পুস্তিকা>পোত্থিআ>পোথী।

২। করণ কারকে "-এঁ", অপাদানে "-হুঁ" এবং অধিকরণে "-হি, -অহি" বিভক্তি প্রযুক্ত হইতে। এইগুলি অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য। যেমন, মতিএঁ, রঅণহুঁ, হিঅহি< হৃদয়েভিঃ, হৃদয়ধি ; মোহিঅহি।

৩। অধিকরণে -ই, -এ, -ত বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, নিয়ড্ডী< নিঅডি<নিকটে ; ঘরে<গৃহকে ; নেউর চরণে ; সাঙ্কমত<সংক্রম+অন্তঃ ; বাটত< বর্ত্ম+ত। করণের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় সপ্তমীতে "-এ" বিভক্তি ও দৃষ্ট হয়। যেমন, ঘরেঁ।

৪। গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের বিভক্তি—"-ক, -কু, -কে, -রে"। যেমন, মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা ; বাহবকে পারই ; মকুঁ ণঠা ; করিণিরে রিসঅ ; তোহোরে বিরুআ বোলই।

৫। -র, -অর, -আর, -এর বিভক্তির দ্বারা ষষ্ঠীর পদ গঠন। যেমন—হরিণীর নিলঅ ; রুখের তেন্তলি ; ডোম্বীএর সঙ্গে ; হরিণার-খুর। র-যুক্ত ষষ্ঠীর পদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—যেমন, কাহেরি শঙ্কা (=কাহার শঙ্ক) ; হাড়েরি মালি (=হাড়ের মালা)। -আ, -আহ ও -ক যুক্ত পদও বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন, মূঢ়া হিঅহি ; জাহের বাণ চিহ্ন রূব ; ছান্দক বান্ধ।

৬। প্রাচীন ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ও কদাচিৎ পাওয়া যায়—খণহ<ক্ষণস্য ; গঅণহ< গগনস্য ; সমুদ্রা>সমুদ্দাহ<সমুদ্রস্য ; জাহ<যস্য।

৭। পঞ্চমীতে অপভ্রংশ হইতে প্রাপ্ত "হুঁ" বিভক্তির প্রয়োগ ও ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। যেমন, রঅণহুঁ<রত্নাৎ ; খেপহুঁ<ক্ষেপাৎ। অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ ও দেখা যায়—যেমন, ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী ; জামে কাম কি কামে জাম।

৮। করণে মুখ্যত এঁ<এন বিভক্তি ব্যবহৃত হইত ; তবে সপ্তমীর-তে, -তেঁ, -এতেঁ বিভক্তির প্রয়োগ ও দেখা যায়।

যেমন, বোহেঁ<বোধেন ; মতিএঁ<মন্ত্রী+এন ; কুঠারেঁ ছিজঅ (=কুঠারেন ছিন্নতে) ; সুখ দুখেতেঁ<সুখ দুঃখ+অন্তঃ+এন।

৯। তির্যক কারকে বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপনের জন্য অনুসর্গের প্রয়োগ—দিআঁ চঞ্চালী ; তঁই বিনু ; তোহোর অন্তরে ; অধরাতি ভর ; শবরো লইআ সুণ-মেহেলী।

১০। একবচনে হউ<হকং<অহকম্‌ শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। হউ হইতে আগত "হুঁ" কর্তৃবাচ্যে উত্তমপুরুষের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত—আহ্মে দেহুঁ (=আমি দেই)।

উত্তম পুরুষে মো<মম পদও কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হইয়াছে। কর্ম-ভাববাচ্যে মই<*ময়েন, তঁই<*ত্বয়েন কর্তা হিসাবেই ব্যবহৃত হইত। যেমন, মই দেখিল।

১১। যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ায় পূর্বের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে—জাম<জন্ম ; ধাম<ধর্ম।

১২। সংস্কৃত বহুবচন হইতে আগত আহ্মে ও তুহ্মে একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

১৩। ক্রিয়াপদে কর্ম-ভাববাচ্যে অতীত কালে -ই, -ইল এবং ভবিষ্যৎ কালে -ইব বিভক্তি যুক্ত হইত। ক্রিয়া সকর্মক হইলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি এবং অকর্মক হইলে প্রথমা বিভক্তি হইত। ক্রিয়াপদ কর্তার বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইত ; সেজন্য কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও ক্রিয়ায় স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন, তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী ; বাট রুন্ধেলা ; চলিল কাহ্ন (=কৃষ্ণঃ চলিতকঃ) ; মই বুঝিল (=ময়া বুদ্ধম্) ; লাগেলি আগি (=অগ্নিকা লগ্না) ; মই দিবি পিরিচ্ছা (=ময়া পৃচ্ছা দাতব্যা)।

১৪। সংস্কৃতের কর্ম-ভাববাচ্যের প্রয়োগ পাওয়া যায়—বাট জাইউ<বর্ত্ম যায়তু (=যায়তাম্) ; করিঅই<ক্রিয়তে ; দীসই<দিস্সতি<দৃশ্যতে।

মিশ্র ক্রিয়ার সাহায্যে গঠিত যৌগিক কর্ম-ভাববাচ্যের প্রয়োগও পাওয়া যায়। যেমন, ধরণ ন জাই<ধরণং ন যাতি।

১৫। নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয়ে '-এ' বিভক্তি যুক্ত হইয়া অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হইয়াছে—চাহন্তে চাহন্তে (=চাহিতে চাহিতে) ; সাঙ্কমত চড়িলে (=সাঁকোতে চড়িলে)।

১৬। য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির ব্যবহার চর্যায় লক্ষণীয়—নিয়ড়ি<নিকটে ; আবই<আয়াতি।

১৭। আধুনিক বাংলার মত চর্যায় কখন ও কখনও কর্তৃকারকে ও কর্মকারকে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই—কায়া তরুবর পঞ্চ বি ডাল ; বান্ধন তোড়িউ।

১৮। শব্দ সমষ্টি প্রধানত তদ্ভব হইলে তৎসম শব্দেরও সন্ধান মিলে। যেমন, তথাগত, তরুবর, রাজপথ, অজরামর।

কিছু কিছু অনার্য শব্দও পাওয়া যায়। যেমন, ডোম্বী, ঠাকুর।

১৯। আদিস্বরে শ্বাসাঘাত পড়িলেও অনাদ্য শ্বাসাঘাতও লক্ষণীয়—যেমন, অবনাগমন <আগমন গমন ; অন্ধার<অন্ধকার।

২০। বাংলার বাগ্ধারা ও ইডিয়ম চর্যার ভাষায় সুস্পষ্ট। যেমন, গুনিয়া লেহঁ = গুনিয়া লই ; থির করি=স্থির করিয়া ; সড়ি পড়িআ ; নিদ গেল ইত্যাদি।

২১। বাংলায় ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচনের কয়েকটি চর্যায় দেখিতে পাওয়া যায়—অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী ; হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

মধ্যযুগের বাংলা (খ্রীষ্টাব্দ ১২০০-১৮০০)

মধ্যযুগের বাংলাকে দুইটি স্তরে ভাগ করা যায়—(ক) **আদি-মধ্য** (খ) **অন্ত্য-মধ্য**। আদি-মধ্য যুগের বাংলার স্থিতিকাল আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ১৩০০—১৫০০। এই সময়ের বাংলার একমাত্র নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। আদি-যুগ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে বাংলা ভাষার একটি সন্ধি যুগ (transitional period) ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু এই যুগের বাংলা সাহিত্যের কোন বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাছাড়া, প্রাচীন বাংলার রচনাগুলির বেশির ভাগই অষ্টাদশ শতকের নকল করা পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। তবে গোপীচাঁদের পাঁচালী, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতি নাথ-সাহিত্য ও বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য এই যুগ সন্ধিক্ষণেই সম্ভবত রূপ পাইতেছিল। এই সময় হইতেই বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি আত্ম প্রকাশ করিতে থাকে।

আদি-মধ্য যুগ

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বাংলা সাহিত্য পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে বাংলার উপর সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পুরাণের আশ্রয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ঘটে; তৎসম শব্দের প্রয়োগ পূর্বাপেক্ষা বেশি, অনেক প্রাচীন তদ্ভব শব্দের বিলুপ্তিও ঘটে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে ভিত্তি করিয়া আদি-মধ্য যুগের বাংলার প্রধান লক্ষণগুলি আলোচিত হইল।

১। অ-কার ও আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ক্ষীণভাবে উচ্চারিত হইত বলিয়া অই, আই, অউ, আউ প্রভৃতি যৌগিক স্বরের সৃষ্টি। বড়াই>বড়াই; আউলাইল>আউলাইল।

২। হ্ম (=ম্‌হ), হ্ন (ন্‌হ) প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণের মহাপ্রাণতার লোপ। যেমন, আহ্মি>আমি; কাহ্ন>কান। কিন্তু পদমধ্যবর্তী ঢ়-কারের মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয় নাই—কাঢ়ে, বুঢ়া, বাঢ়ে।

৩। '-রা' বিভক্তির দ্বারা সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ গঠন—যেমন, আহ্মারা, তোহ্মারা, তারা।

৪। উদ্বৃত্ত স্বরের বিভিন্ন রূপান্তর লক্ষণীয়—

(ক) কোন কোন শব্দে উদ্বৃত্ত স্বর রক্ষিত হইয়াছে—যেমন, কঅলী, গরুঅ, সরুঅ।

(খ) উদ্বৃত্ত স্বরের বিলুপ্তি—আসে (আইসে), বসিল (বইসিল)।

৫। ক্রিয়াপদে উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য—যেমন, একবচনে 'ওঁ (ও), বিভক্তি—নিশিবোঁ, করোঁ ; বহুবচনে '-ই' বিভক্তি—করি।

৬। -ইল অন্তক অতীতের এবং -ইব অন্তক ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ—যেমন, মোঁ শুনিলোঁ ; মোই করিবোঁ।

৭। প্রাচীন -ইঅ বিকরণযুক্ত কর্ম-ভাববাচ্যের ক্রমশ বিলুপ্তি এবং 'যা' ও 'ভূ' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্ম-ভাববাচ্যের প্রচলন। যেমন, সে কথা কহিল নয় ; ততেকে স্থঝাণ গেল মোর মহাদানে।

৮। অসমাপিকার সঙ্গে 'আছ' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রচলন—যেমন, লইছে> লই+আছে ; রহিল>রহিল+অছে।

৯। তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে প্রয়োগ—যেমন, ভাণ্ডিব<ভণ্ড ; আস্থখিল< অস্থখ।

১০। গিয়া ও সিয়া এই অসমাপিকা ক্রিয়া দুইটি অনুসর্গ রূপে প্রয়োগ। যেমন, দেখ গিয়া, দেখ সিয়া (=দেখ আসিয়া)।

১১। নিষেধসূচক 'না' অব্যয়ের ক্রিয়ার পূর্বে প্রয়োগ—না আইসে (=আসে না) ; না জাইহ (=যাইও না)।

১২। ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক চতুষ্পদী হইতে চতুর্দশ অক্ষর বিশিষ্ট পয়ার ছন্দের উৎপত্তি।

১৩। অল্পসংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ।

অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য—

১। (ক) ই, উ ধ্বনির অপিনিহিতি—চারি>চাইর ; মারি>মাইর ; কালি>কাইল ; সাধু>সাউধ।

(খ) অপিনিহিত উ>ই ; পরে ই-ধ্বনির লোপ—

যেমন, দক্র>দাদু>দাউদ>দা'দ ; ধাতু>ধাউত>ধাইত>ধা'ত ; মাস্থয়া> মাউস্থয়া>মাইস্থয়া>মেসো।

(গ) অপিনিহিত ধ্বনির লোপ—মাগু>মাউগ>মাগ ; কালি>কাইল >কাল ; ফল্গু>ফগ্‌গু>ফাগু>ফাউগ>ফাগ ; রামশালি>রামশাইল>রামশাল।

(ঘ) অপিনিহিতি-জাত দ্বিস্বরের সন্ধি—চাউলের>চাইলের>চেলের ; জাতি-এর >জাইতের>জেতের।

(ঙ) অপিনিহিত স্বরধ্বনির প্রভাবে চলিত ভাষায় পরবর্তী স্বরধ্বনির অভিশ্রুতি— করিয়া>কইর‍্যা>ক'রে ; পাতিয়া>পাইত্যা>পে'তে।

(চ) ইআ>এ্যা, এ ; উআ>ও—জালিয়া>জাল্যা>জেলে ; বানিয়া>বান্যা> বেনে ; মাথুয়া>মেথো।

২। পদান্ত অ-কারের লোপ প্রবণতা—দাস>দাস্ ; বার>বার্।

৩। কর্তৃকারকে বিশেষ্যের বহুবচনে 'রা' বিভক্তি এবং নির্দেশক বহুবচনে গুলা, গুলি প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ।

৪। সপ্তদশ শতকে তির্যক কারকের বহুবচনে দি, দিগ বিভক্তির ব্যবহার।

৫। -ইল ও-ইব অন্তক ক্রিয়াপদের বহুল পরিমাণে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ—মুই করিলাঙ (=অহং কৃতবান্) ; সে করিবে।

৬। 'আছ্' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন—রহিলছে, আসিছি (=আসিতেছি)

৭। যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যাপক ব্যবহার—অনুগমন করা ; পাছু পাছু যাওয়া।

৮। তৎসম শব্দের নাম ধাতুরূপে ব্যবহার—সান্ত্বাইব (=সান্ত্বনা করিব) ; অনুব্রজি (=অনুগমন করিয়া) ; নিমন্ত্রিয়া (=নিমন্ত্রণ করিয়া)।

৯। অধিক পরিমাণে আরবী-ফারসী এবং কিছু সংখ্যক তুর্কী ও পোর্তুগীস শব্দের আগমন।

১০। বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষায় ব্যবহার।

আধুনিক যুগের বাংলা—

(অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হইতে বাংলায় আধুনিক যুগের শুরু।)

আধুনিক বাংলার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হইতেছে এই—

১। মধ্যযুগের শেষস্তর পর্যন্ত লেখ্য ও কথ্য ভাষার মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে লিখিবার ভাষা কথ্য ভাষা হইতে স্বতন্ত্র রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

২। পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষায় অপিনিহিত স্বর পূর্বস্বরের সহিত মিলিত হইয়া অভিশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে। যেমন, নাটুয়া>নাউটুয়া>নেটো ; মাধব>মাধুয়া>মেধো ; করিয়া>কইর‍্যা>ক'রে।

৩। কথ্য ভাষায় স্বরসঙ্গতি আসিয়াছে—জলুয়া>জ'লো ; দেশি>দিশি ; বিলাতি>বিলিতি।

৪। তদ্ভবশব্দে পদমধ্যবর্তী ঢ়>ড় হইল এবং অন্ত্য 'হ' লুপ্ত হইল।
যেমন, বাঢ়ই>বাঢ়ে>বাড়ে ; করহ>কর ; বারহ>বার।

৫। সাধু ভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদের বহুল প্রচলন—আহার করা, ধ্যান করা, উপবেশন করা।

৬। সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির দ্বিস্বর ধ্বনিতে রূপান্তর—আইল>এলো ; পইসই> পইসে>পশে।

৭। সমাপিকা ক্রিয়া পদের পরে নঞর্থক 'না' শব্দের ব্যবহার—যায় না, শোনে না।

৮। কারক-বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপনের জন্য অনুসর্গের ব্যবহার।

৯। ভাববচন শব্দের সঙ্গে 'পূর্বক' যোগে অসমাপিকার অর্থ জ্ঞাপন—যেমন, আগমন পূর্বক (=আসিয়া) ; শ্রবণ পূর্বক (=শুনিয়া)।

১০। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজী শব্দ ও ইডিয়মের ব্যবহার। অনেকগুলি ইংরেজী শব্দ বাংলায় সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছে। যেমন, আপিস, লাট, লণ্ঠন, টিকেট, চেয়ার প্রভৃতি।

১১। পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ।

১২। আধুনিক বাংলার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে গদ্যরীতির সৃষ্টি। প্রথম অবস্থায় গদ্য লেখকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাই সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বেশি।

১৩। ইংরেজী রাজকার্যের ভাষা ও উচ্চ-শিক্ষার বাহন হওয়ায় বাংলায় লেখ্য ও কথ্য ভাষায় ইংরেজী শব্দ ও বাক্যরীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

একবিংশ অধ্যায়

বাংলার উপভাষা (Bengali Dialects)

কোন ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অঞ্চল বিশেষে ব্যবহৃত ভাষার নাম উপভাষা। ভাষা-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অধিক হইলে এবং বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলে আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। কারণ এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চল একই ভাষার কথ্যরূপটি যথাযথভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফলে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে গোষ্ঠীগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ভাষায় প্রবেশ করে—তখনই সৃষ্টি হয় উপভাষার। বিভিন্ন উপভাষাগুলির মধ্যে ভাষার যথার্থ রূপটি বিবৃত হয়। উপভাষাগুলিতে অনেক সময় প্রাচীন শব্দ এবং ভাষাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ভাষাতাত্ত্বিক লিউনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leonard Bloomfield) তাঁহার 'Language' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The progress of historical linguistics showed that the standard language was by no means the oldest type, but had arisen, under particular historical conditions, from local dialects. Standard English, for instance is the modern form not of literary old English, but of the old local dialect of London which had become first a provincial and then a national standard language absorbing, meanwhile, a good many forms from other local and provincial dialects.'

উপভাষাধ্বনির ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠন রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে যে যে অঞ্চলে উপভাষাগুলি প্রচলিত সেই সব অঞ্চলের সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই উপভাষার সম্যক রূপটি জানা সম্ভব হইবে। ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন—"The real and natural life of language is its dialects'. প্রাচীন বাংলার পাঁচটি বিভাগ ছিল—রাঢ়, সুহ্ম (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ) পুণ্ড্রবর্ধন (বরেন্দ্রভূমি), বঙ্গ ও কামরূপ। মুসলমান আমলে বঙ্গ শব্দের সঙ্গে 'আল' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বঙ্গাল হইয়াছে। পরে বঙ্গাল+আ=বাঙ্গালা, বাংলা হইয়াছে। তৎকালে সমগ্র পূর্ববঙ্গই বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।

অনুরূপভাবে বাংলার আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকেও **পাঁচটি প্রধান ভাগে** বিভক্ত করা যায়—

(১) রাঢ়ী—রাঢ় অঞ্চল অর্থাৎ ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষা।

(২) ঝাড়খণ্ডী—দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা।

(৩) বরেন্দ্রী—উত্তর-মধ্য বঙ্গের উপভাষা।

(৪) বাঙ্গালী—পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষা।

(৫) কামরূপী—উত্তর-পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট-কাছাড় ও উত্তরবঙ্গের অঞ্চল বিশেষের কথ্যভাষা।

এই আঞ্চলিক উপভাষাগুলিরও আবার অনেকগুলি বিভাষা রহিয়াছে।

(১) রাঢ় অঞ্চলের উপভাষার বৈশিষ্ট্য ;—

(ক) অ-কারের ও-কার রূপে উচ্চারণ প্রবণতা—অ>ও।

যেমন—মধু>মোধু ; অতুল>ওতুল ; বন>বোন।

(খ) অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির ফলে ধ্বনি পরিবর্তন—

যেমন—রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখে ; বানিয়া>বাইন্যা>বেনে ; দেশি>দিশি ; বিলাতি>বিলিতি ; আইল>এল।

(গ) আনুনাসিক স্বরধ্বনি পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত—যেমন, কাঁটা, চাঁদ, বাঁধ। সময় সময় স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্তও মিলে—খোঁকা, হাঁসি, পুঁথি।

(ঘ) অশিক্ষিত লোকের উচ্চারণে পদের আদিতে র-কারের আগম ও লোপ হয়। যেমন, আশু>রাশু ; ওঝা>রোজা ; রস>অস ; রায়বাহাদুর>আয়বাহাদুর।

(ঙ) শব্দের আদিতে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ যথাযথভাবে উচ্চারিত হয় ; কিন্তু শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের দরুণ পদান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতার লোপ ঘটে। যেমন, দুধ>দুদ্ ; মধু>মদু ; পথ>পত্।

(চ) কখনো কখনো পদান্ত অঘোষ ধ্বনির ঘোষবৎ ধ্বনিতে রূপান্তর। যেমন, শাক>শাগ ; কাক>কাগ ; ছাত (<ছত্র)>ছাদ।

(ছ) সাধারণ লোকের উচ্চারণে ল>ন হয়—যেমন, নুচি<লুচি ; নেপ<লেপ ; নুআ<লৌহ ইত্যাদি।

(জ) চব্বিশপরগণার অঞ্চল বিশেষে শ>স রূপে উচ্চারিত হয়। কলিকাতায় অশিক্ষিত লোকের উচ্চারণেও এই রীতি দেখা যায়।

যেমন, আশু>আসু ; শশী>সসী ইত্যাদি।

(ঝ) শব্দরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে তির্যক কারকের বহুবচনে "দের," গৌণকর্ম-সম্প্রদানে "-ক" এবং অধিকরণে "-তে" বিভক্তির প্রয়োগ।

(ঞ) ক্রিয়ারূপের প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে, সামান্য অতীতের অকর্মক ক্রিয়ায় প্রথম পুরুষে "-ল" বিভক্তি এবং সকর্মক ক্রিয়ায় "-লে" বিভক্তির ব্যবহার—যেমন, রাম গেল, রাম দিলে।

সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষে -লুম্, -নু, লম্ বিভক্তির প্রয়োগ—

যেমন, আমি দেখলুম্, দেখনু, দেখলম্।

(ট) যৌগিক ক্রিয়াপদে "ই" অন্তক অসমাপিকার সাহায্যে অসম্পন্ন কালের এবং "-ইয়া" অন্তক অসমাপিকা দ্বারা সম্পন্ন কালের পদ গঠন।

যেমন, করিছে>ক'রছে ; করিয়াছে>ক'রছে ; করিয়াছিল>ক'রেছিল।

(ঠ) বাক্যের বা শব্দের আদিস্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত লক্ষণীয়।

(ড) চব্বিশ পরগণার অঞ্চল বিশেষে অশিক্ষিত লোকের ভাষায় সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, কথাটা হতেছেন যে···।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ—

(ক) ঝাড়খণ্ড বা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষায় আনুনাসিকধ্বনির প্রাচুর্য।

যেমন, চাঁ, হইঁছে, গধাঁচ্ছে ইত্যাদি।

(খ) অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারক—বাসকে গেল্‌ছে ; জলকে চল ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও অনুরূপ প্রয়োগ লক্ষণীয়—"পাণিকে আইস"।

(গ) নামধাতুর বহুল প্রয়োগ—জলটা গধাঁচ্ছে ; জাড়াবে।

(ঘ) আছ্ ধাতুর স্থানে "বট্" ধাতুর প্রয়োগ—করি বটে = করছে।

(ঙ) ক্রিয়াপদে স্বার্থিক "ক" প্রত্যয়ের ব্যবহার—যাবেক, করবেক, বল্‌লেক।

বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ—

(ক) স্বরধ্বনি রাঢ়ীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। সানুনাসিক স্বরধ্বনিও বজায় আছে।

(খ) শব্দের আদিতে ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণ রক্ষিত আছে।

(গ) সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়িলেও অনাদ্য শ্বাসাঘাত সময় সময় লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) পূর্ববঙ্গের উপভাষার প্রভাবে জ-ধ্বনি কখনো কখনো জ˙ (z) রূপে উচ্চারিত হয়।

(ঙ) শব্দের আদিতে র-কারের আগমও লোপ এই অঞ্চলের উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—আশু>রাশু ; রস>অস ; রামবাবু>আমবাবু।

(চ) রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির ভাষা মূলত একছিল। সেজন্য শব্দরূপে ও ধাতুরূপে রাঢ়ীর সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাবে বঙ্গালীর কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন—সপ্তমীতে '-ত' এবং অতীতকালে উত্তম পুরুষে '-লাম্' বিভক্তির প্রয়োগ।

(৪) বঙ্গালী-উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ—

বঙ্গালী বা পূর্ব অঞ্চলের উপভাষার দুইটি বিভাগ রহিয়াছে।

(ক) পূর্ববঙ্গের উপভাষা—মহেশ্বরদি পরগণা ব্যতীত সমগ্র ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, দক্ষিণ-পূর্ব চব্বিশ পরগণার অংশ বিশেষ, খুলনা ও যশোহর জেলা সমূহের উপভাষা ও বিভাষাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষা।

পূর্ববঙ্গের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য —

(ক) অপিনিহিত স্বর রক্ষিত আছে—রাখিয়া>রাইখ্যা ; করিয়া>কইরিয়া> কইর‍্যা ; কান্দিয়া>কাইন্দা।

(খ) য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে অপিনিহিতি ই-কারের আগম হয়।

যেমন, সত্য>শইত্ত ; কাব্য>কাইব্ব ; রাক্ষস>রাইক্‌খস্।

(গ) আনুনাসিক স্বরধ্বনি রক্ষিত হয় নাই। অর্ধ-আনুনাসিক ধ্বনি বজায় আছে— —চন্দ্র>চান্দ ; স্কন্ধ>কান্ধ ; বন্ধ>বান্ধ।

(ঘ) অর্ধ-সংবৃত 'এ' (e) ধ্বনি অর্ধ বিবৃত, 'এ' (অ্যা) ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, শেষ>শ্যাষ্ ; লেপ>ল্যাপ্, এবং>এ্যাবং।

(ঙ) সাধারণত রাঢ় অঞ্চলের মতই শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে ; তবে রাঢ়ীর মত ইহা প্রবল নহে। সময় সময় অনাদ্য শ্বাসাঘাত ও লক্ষ্য করা যায়।

(চ) ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণ মহাপ্রাণতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠনলীয় স্পর্শযুক্ত তৃতীয় বর্ণে (Glottal stops) পরিণত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চারণরীতি সিন্ধী, গুজরাট ভাষায় ও দেখা যায়। তবে সিন্ধীতে অঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ কণ্ঠনলীয় স্পর্শযুক্ত প্রথমবর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। যেমন, ঘর>গ'র, ধান>দা'ন ; ভয়>ব'য় ইত্যাদি।

(ছ) তালব্য বর্ণ দন্ত-তালব্য ঘৃষ্টবর্ণ (Palato-Dental affricate) রূপে উচ্চারিত হয়—চ>ৎস ; ছ>স ; জ>জ় (z)।

(জ) ড়, ঢ়>র হয়—বাড়ী>বারি ; দৃঢ়>দৃর ;

(ঝ) পদমধ্যস্থিত অঘোষবর্ণ ঘোষবৎ বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন, দিকে>দিগে ; ছোট>ছুডু ; কে-টা>কেডা, বক>বগা, শাক>হাগ।

(ঞ) শ, ষ, স>হ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, সে>হে ; শালা>হালা ; সকল> হগল ; শয়তান>হয়তান।

(ট) পদের আদিতে কিংবা মধ্যস্থিত হ-কার 'অ (') রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, হয়>'অয় ; হইবে> 'অইবে।

(ঠ) শব্দরূপে কর্তায়-'এ', গৌণকর্ম-সম্প্রদানে'রে', অধিকরণে -ত, -তে ও তির্যক কারকে -রা, -গো বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন, বাপে করছে ; মায়ে ডাকে ; তারে মারছে ; হে বাড়ীত্ (=বাড়ীতে) গেছে ; আমরাকে, আমরার, আমাগোর, তাগোর।

(ঙ) ক্রিয়াপদের গঠন প্রণালীতে রাঢ়ী-বরেন্দ্রী হইতে অনেকটা পার্থক্য রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ অর্থে নিত্যবৃত্ত কালের প্রয়োগ—যেমন, হে যাইত না (=সে যাইবে না); ভবিষ্যৎ অর্থে উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে 'উম্, মু' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন, আমি খেলুম্ (=খেলিব) ; করমু (=করিব)।

ঘটমানের অর্থে সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগ—যেমন—কাকায় ডাকে (=কাকা ডাকিতেছে)। অতীত কালে উত্তম পুরুষে 'লাম্ বিভক্তির ব্যবহার—যেমন, খাইলাম, কর্‌লাম (=করিলাম)।

(চ) যৌগিক ক্রিয়াপদে -'ই' অসমাপিকার সাহায্যে সম্পন্ন কালের এবং -'ইতে' অসমাপিকা দ্বারা অসম্পন্ন কালের পদ গঠন—যেমন, করছি=করিয়াছি ; করিতে+আছি>কইর্‌তাছি (=করিতেছি)।

(ণ) যশোহর-খুলনার বিভাষায় তুমর্থে 'তে' এর পরিবর্তে 'তি' প্রত্যয় হয়। যেমন, যাতি=যাইতে ; শুতি=শুইতে।

দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষার বৈশিষ্ট্য—

(ক) 'উ' কখনো কখনো 'ও' হয়—যেমন, সুন্দর>হোন্দর।

(খ) আনুনাসিক-ধ্বনির ছড়াছড়ি—যেমন, আমি>আঁই ; আকাশ>আঁশ। স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্ত ও মিলে>কুকুর>কুঁউর ; শিকড়>হিঁওর ; টাকা>টেআ ; কমলা>কঁওলা।

(গ) শব্দের আদিতে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ক, প, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় উষ্মবর্ণ খ· (x) ও ও ফ· (f) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন কাপড়>খওর (xɔor), কালীপূজা>খালীফুজা (xalifudza)। ফোঁইর<পুকুর ; ফোতলা<পুতুল ; আবার কখনে কখনো স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, উষ্মবর্ণ হইয়া 'হ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, পানি>ফানি>হানি ; হরাণ<ফরাণ<প্রাণ।

(ঘ) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মত শব্দমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়। যেমন, আকাশ>আঁশ ; কুকুর>কুঁউর ; শিকড়>হিঁওর ; নকুল>নেউল।

অঅত্তর<একত্র ; হঅল<সকল ; অ'ন<এখন ; ফিআ<পিশা ; খোঅল<কপাল ; সুআরি<সুপারি।

কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।

(ক) ক হইতে ঢ পর্যন্ত বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যগুলির প্রায় সবই কামরূপীতে বজায় আছে।

(খ) ও>উ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, ছোট>ছুডু ; ভোর>বু'র ; চোর>চুর ; সোণালী>সুনালী ; গুআলা<গোপাল ; জুতিষ>জ্যোতিষ ; জুনি<জোনাকী ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই ওয়ালি=গোয়ালী।

(গ) শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের আদিতে "অ" কখনো কখনো "আ" হয়। যেমন, অম্বল>আম্বল ; অষ্ট>আষ্ট ; লম্বা>লাম্বা ; অবস্থা>আবস্থা ; অলস>আইল্সা ; আকথা<অকথা ; লাতাপাতা<লতাপাতা ইত্যাদি।

(গ) পদান্তস্থিত অ>ও হয়। যেমন, হইত>অইতো ; বসিত>বইতো।

(ঘ) শব্দের আদিস্থিত "অ" কখনো কখনো "উ" হয়। যেমন, বুক্কা<বক্ষ ; লুলুক<নলক ; ডুগা<ডগা ; খুতি<ক্ষতি ; সুমুদ্রু<সমুদ্র।

(ঙ) শব্দের আদিতে "অ" কখনো কখনো "এ" হয়।

যেমন, খের<খড় ; লেনটন<লণ্ঠন ; কেওয়ার<কপাট ; খেমা<ক্ষমা।

(চ) শব্দের আদিস্থিত "এ" কখনো "অ" কিংবা "আ" হয়। যেমন, অখন<এখন ; অতলি<এতগুলি ; অতক্খন>এতক্ষণ ; খাজুর<খর্জুর।

(ছ) শব্দমধ্যস্থিত "অ" কখনো কখনো "উ" হয়।

যেমন, বাসুন<বাসন ; এমুন<এমন ; আসুন<আসন ; সুসুঙ্গ<সুসঙ্গ "স্থানের নাম" ; দ'মুক<ধমক ; বিষুরি<বিষহরি ; লুলুক<নলক ; সুরুঙ্গ<সুরঙ্গ।

(জ) অন্ত "অ" অনেক সময় "উ" রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন, তুচ্ছু<তুচ্ছ ; শুদ্হু<শুদ্ধ ; দুক্খু<দুঃখ ; ছুডু<ছোট ; দুষ্টু<দুষ্ট।

(ঝ) শব্দমধ্যস্থিত "প" উষ্মধ্বনি "ফ·" (f) রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন, আপদ>আফ·দ ; আপনার>আফ·নার।

সময় সময় প>ব হয়—সুপারি>সুবারি ; দীপান্বিতা>দীবান্বিতা।

(ঞ) সময় সময় শব্দের মধ্যে "র-কারের" আগম ঘটে। যেমন, সাহার্য, জর্মাষ্টমী, সর্ম্মান, নবর্দ্বীপ ইত্যাদি।

(ট) কখনো কখনে ন>ল হয়। যেমন, ননী>লনী ; নীল>লীল ; নাড়াচাড়া>লরাচরা ; নামা>লামা ; আবার ল>ন রূপেও উচ্চারিত হয়। লাঙ্গল>নাঙ্গল।

(ঠ) ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎকালে "বাম্" প্রত্যয় হয়।

যেমন, করবাম্=করিব ; খাইবাম্=খাইব।

কাছাড় জেলার ভাষার সঙ্গে নোয়াখালী-চট্টগ্রামের ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

বাংলার উপভাষা সমূহের শ্রেণী বিভাগ

- ঝাড়খণ্ডী
  - মানভূম, সিংভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বীরভূম দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া
- রাঢ়ী
  - দক্ষিণ-পশ্চিম
    - দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর (ওড়িয়া প্রভাবিত)
  - পশ্চিম
    - পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিম বীরভূম পশ্চিম বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর
  - পূর্ব
    - পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, পূর্ব বাঁকুড়া, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা, ২৪ পরগণা
- বরেন্দ্রী (উত্তর-মধ্যবঙ্গ)
  - মালদহ, দক্ষিণ-দিনাজপুর রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া

- বঙ্গালী
  - পশ্চিম ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, উত্তর-পূর্ব নদীয়া
  - দক্ষিণ-পূর্ব
    - নোয়াখালী, চট্টগ্রাম
- কামরূপী
  - পশ্চিম
    - জলপাইগুড়ি, পূর্ব-পূর্ণিয়া, উত্তর দিনাজপুর, রঙ্গপুর, কোচবিহার পশ্চিম গোয়ালপাড়া
  - পূর্ব
    - পূর্ব গোয়াল পাড়া, নওগাঁ, কাছাড়, শ্রীহট্ট, পূর্ব-ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, মহেশ্বরদি পরগণা (ঢাকা)

সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা

প্রত্যেক দেশেই শিক্ষিত ভাষার দুইটি রূপ দেখা যায়। একটি হইতেছে সাহিত্যের ভাষা; আর একটি তাহার মৌখিক বা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জন্য কথোপকথনের ভাষা। প্রত্যেক ভাষারই আবার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ রহিয়াছে। এক অঞ্চলের ভাষা যাহাতে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীর বোধগম্য হয়, তজ্জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতানুগ করিয়া সাধুভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার প্রভাব ও ইহার উপর পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত গদ্য সাহিত্যে ও চিঠি পত্রাদিতে সাধু ভাষার ব্যবহার চলে। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি এই ভাষায় লক্ষণীয়—

(ক) তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি। (খ) সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপগুলি পূর্ণতর এবং উহার মুল স্থানীয়। (গ) বাক্য গঠন রীতি কতকগুলি বিশেষ নিয়মের শাসনাধীন।

সংস্কৃত শব্দের অধিক পরিমাণে প্রয়োগের ফলে সাধু ভাষায় একটা গাম্ভীর্য ও প্রাঞ্জলতা পরিলক্ষিত হয়। বিষয় গৌরবের জন্য ইহার আভিজাত্য ও পারিপাট্য বর্ধিত হয়। ভাষাশিল্পী বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারের রচনার ফলে ইহার প্রসাদগুণ বাড়িয়াছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র এই ত্রয়ীর সাধনার ফলে এই ভাষা সুষমামণ্ডিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

সাধু ভাষার পাশাপাশি বাংলার বিবিধ অঞ্চলের কথ্য ভাষার ও নানারূপ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা ও ভাগীরথী-নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত কথ্য ভাষা সমগ্র বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। **এই মৌখিক ভাষাকেই চলিত ভাষা (Standard Colloquial Dialect) বলা হয়।** আজকাল সাধু ভাষার পাশাপাশি চলিত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। শুধুমাত্র উপন্যাস ও নাটকে এই চলিত ভাষার ব্যবহার সীমাবদ্ধ নহে। নানারূপ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে ও এই ভাষার প্রয়োগ বর্তমানে দেখা যাইতেছে। কলিকাতা ও নবদ্বীপ বাঙ্গালী জাতির প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র হওয়ায় কলিকাতা-নবদ্বীপ অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা গত দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বাংলার সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য এই উভয় অঞ্চলের কথ্য ভাষা সাহিত্যে একটা বিশেষ আসন লাভ করিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রচেষ্টায় চলিত ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা অনেকগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলী, ইহার চটুল ও সাবলীল গতি ও বিশিষ্ট বাগ্-ভঙ্গী সবই জীবন্ত। সাহিত্যিক চলিত ভাষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়—

(ক) ইহাতে তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ বেশি। (খ) ইহাতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের প্রয়োগ হইয়া থাকে। (গ) চলিত ভাষায় অভিশ্রুতি ও স্বর- সঙ্গতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। অভিশ্রুতি—করিয়া>ক'রে; বলিয়া>ব'লে; করিতে- ছিলাম>ক'রছিলাম। স্বরসঙ্গতি—দেশী>দিশী; বিলাতী>বিলিতি; পূজা>পূজো; হিসাব>হিসেব। (ঘ) এই ভাষার বাচনভঙ্গী, বাক্যগঠন রীতি সাধু ভাষা অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র।

চলিত ভাষার উপর ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে। ফলে অনেক সময় এই ভাষার প্রয়োগ যথাযথভাবে হয় না। সাধারণ বাংলা ব্যাকরণে সাধু ভাষারই আলোচনা থাকে। চলিত ভাষার সুষ্ঠু ও শুদ্ধরূপ ব্যবহার করিতে হইলে ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার ব্যাকরণ ও বিশিষ্ট বাগ্ভঙ্গীর রীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বাংলা শব্দ ভাণ্ডার

ভাষার প্রধান সম্পদ শব্দ ভাণ্ডার। অপর ভাষা হইতেও শব্দ আহরণ করিয়া ভাষা শক্তিশালী হয়। আর্যগণ ভারতে অনার্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক নূতন বস্তু ও বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ফলে সংস্কৃত ভাষায় আমরা অনেক অনার্য শব্দ পাই। বাংলা ভাষার শব্দগুলিকে মুখ্যত চারিটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ—

(১) **মৌলিক** (২) **দেশী বা দেশজ** (৩) **বিদেশী** (৪) **মিশ্র**। মৌলিক শব্দগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। (ক) তদ্ভব বা প্রাকৃতজ (খ) তৎসম (গ) অর্দ্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম।

(ক) তদ্ভব শব্দগুলিই বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। সুপ্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যগণ যে ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, সেই ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এইরূপ পরিবর্তিত শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে—"তৎ" অর্থাৎ মূল আর্য-ভাষা সংস্কৃত হইতে "ভব" উৎপত্তি যাহার। এই জাতীয় শব্দকে প্রাকৃতজ শব্দও বলা হয়।

যেমন, কৃষ্ণ>কণ্‌হ ; ধর্ম্ম>ধম্ম ; হস্ত>হত্থ।

প্রাকৃতের এই সমস্ত তদ্ভব শব্দ ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রের শেষ দিকে বাংলা শব্দে পরিণত হইল।

যেমন, হস্ত>হত্থ>হাথ (প্রা-বা)>হাত ;

আবিশতি>আবিসই>আইসই>আইসে>আসে ; কৃষ্ণ>কণ্‌হ>কাণ্‌হ (প্রা-বা)> কান (ম-বা); পরে আদরসূচক 'উ' বা 'আই' প্রত্যয় যোগে কানু, কানাই।

কার্য>কজ্জ>কাজ ; ইন্দ্রাগার>ইন্দ্রাআর>ইঁদারা ; নপ্তৃক>ণত্তিঅ>নাতি ; রাজ্ঞিকা>রণ্ণিআ>রাণী ; উপাধ্যায়>উবজ্‌ঝাঅ>ওজা ; গায়তি>গাঅই>গায়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বর্গ হইতে গৃহীত কতকগুলি তদ্ভব শব্দ বাংলায় পাওয়া যায়।

যেমন, কর্শ (প্রাচীন পারসীক)>সং কার্ষাপণ>কাহাবণ (প্রা)>কাহন ; মুদ্রায় (প্রাচীন পারসীক)>সং মুদ্রা (শীল মোহর)>মুদ্দা (প্রা)>মুদা ; গ্রীক, দ্রাখ্‌মে (drakhme) (মুদ্রা বিশেষ)>সং দ্রম্য>দম্ম (প্রা)>দাম।

গ্রীক স্যুরিংক্‌স (Surinks)>সং সুরঙ্গ, সুরুঙ্গ, সুরঙ্গ, সুরুঙ্গ (প্রা)>সুড়ঙ্গ; পহ্‌ল্‌বী, পোস্ত (লিখিবার "চামড়া" অর্থে)>সং পুস্তিকা>পুত্থিঅ>পুথি>পোথী।

গ্রীক, সেমিদালিস্ (semidalis) ('ময়দা' অর্থে)>সং সমিতা>সমিতা (প্রা)> সিমুই।

কতকগুলি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গল ভাষা গোষ্ঠীর শব্দ সংস্কৃতের মধ্য দিয়া স্বাভাবিক পরিবর্তন লাভ করিয়া বাংলায় আসিয়াছে। ইহারাও তদ্ভব শব্দের মধ্যে পড়ে।

দ্রাবিড় গোষ্ঠী হইতে গৃহীত তদ্ভব শব্দ :—

যেমন, মুট্টৈ (তামিল)>সং মুট্টক>মুডঅ (প্রা)>মোট ; উলবৈ (তামিল ulavai) সং উলুপ>*উলুঅ (প্রা)>উলু (খড়)। তামিল কুলকম্>সং কুটপ>কুডব (প্রা)> কুড়া ('বিঘা' অর্থে)। তামিল পিল্লৈ>সং পিল্লিক>পিল্লিঅ (প্রা)>পিলে।

তামিল কুটম্>সং ঘট>ঘড় (প্রা)>ঘড়া।

অষ্ট্রিক গোষ্ঠী হইতে গৃহীত শব্দ :—

যেমন, সং টঙ্ক (উচ্চস্থান)>টঙ্ক (প্রা)>টঙ্গ ; তাম্বুল>তাঁবোলা (প্রা-বা) ; সং তুলি (কচ্ছপ)>তুলি (প্রা)>তুলি ; ঢৌকয়তি>ঢুক্কই (প্রা)>ঢোকে।

(খ) **তৎসম শব্দ**—যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহাদিগকে বলা হয় তৎসম ('তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃতের 'সম')। যেমন, নদী, বৃক্ষ, পর্বত, জল, অন্ন, কৃষ্ণ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। সাধুভাষায় তৎসম শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গভীর চিন্তা ও ভাব-দ্যোতক শব্দগুলিই সাধারণত তৎসম শব্দ।

(গ) **অর্ধ-তৎসম**—সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ বিকৃত সংস্কৃত শব্দকে অর্ধতৎসম বলা হয়।

যেমন, কৃষ্ণ>কেষ্ট, কিষ্ট ; নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন ; শ্রাদ্ধ>ছেরাদ্দ ; পুরোহিত>পুরুত ; বৈষ্ণব>বোষ্টুম, বোষ্টম ; মহোৎসব>মোচ্ছব ; যজ্ঞ>যজ্ঞি।

(ঘ) দেশী শব্দ—বাংলায় আর্য ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি আসিবার পর অনার্য ভাষার (অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর) যে সমস্ত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে দেশী বা দেশজ শব্দ বলা হয়।

যেমন, ডাঁসা, ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঢেঁড়শ, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, কুলা প্রভৃতি। বাংলা গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি শব্দ বা প্রত্যয় ও অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত।

যেমন, ডাঙ্গা, ডিঙ্গি, ডহর।

বিদেশী শব্দ—বাংলা ভাষার উৎপত্তির পরে যে সকল শব্দ বিভিন্ন বিদেশী ভাষা হইতে বাংলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত শব্দ বিদেশী শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত। প্রাকৃত যুগে কতকগুলি বিদেশী শব্দ বাংলায় আসিয়াছে। কিন্তু এই সব শব্দ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এগুলিকে ব্যংলার মৌলিক উপাদান বলিয়াই স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। বাংলায় বিদেশী শব্দগুলি উচ্চারণ প্রভাবে বহুস্থলে বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় যে সকল বিদেশী উপাদান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সর্বাগ্রে ফারসী শব্দগুলির উল্লেখ করিতে হয়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে তুর্কী বিজয়ের পর হইতেই বাংলায় ফারসী শব্দ ঢুকিতে থাকে। বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর হইতেই অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষে প্রচুর পরিমাণে ফারসী শব্দ বাংলায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। এখন প্রায় আড়াই হাজার ফারসী শব্দ বাংলায় পাওয়া যায়। ফারসীর* মারফৎ কিয়ৎ পরিমাণে আরবী ও তুর্কী শব্দ ও বাংলায় আসিয়াছে।

বাংলায় ফারসী শব্দের কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাজদরবার ও যুদ্ধ সংক্রান্ত শব্দ—আমীর, উজীর, ওমরাহ, বাদশা, বাহাদুর, খেতাব, দৌলৎ, দরবার, তাজ, মালিক, হুজুর, সোয়ার, সেপাই, তাঁবু, বাহাদুর, রসদ, শিকার, তোপ, দুশমন ইত্যাদি।

আইন-আদালত ও শাসন সংক্রান্ত শব্দ—আদম শুমারী, আবাদ, জমা, তালুক, পিয়াদা, দপ্তর, মহকুমা, সরকার, বীমা, হিসাব, হিস্যা, আইন, আদালত, বাজেয়াপ্ত, মোকদ্দমা, শনাক্ত, সালিস, হাকিম, দখল, খাজনা, খারিজ, গোমস্তা, নালিশ, পেশা, রুজু, ফেরার, রায়, কসুর, কানুন, এজাহার, হেফাজৎ প্রভৃতি।

শিক্ষা ও সংস্কৃত বিষয়ক শব্দ—আদব, এলেম, কেচ্ছা, খৎ, গজর, সেতার, হরফ, শাগরেদ।

ধর্মসংক্রান্ত শব্দ—অজু, ইমান, কবর, কোরবাণী, গাজী, জুম্মা, দরবেশ, দীন, দোয়া, নবী, নিকাহ, মোহরম, মোল্লা, শহীদ, শিয়া।

প্রসাধন সামগ্রী, বিলাস ও শিল্প সংক্রান্ত শব্দ—আয়না, আতর, গোলাপ, চশমা, তকমা, তাকিয়া, পাজামা, পোলাও, মশলা, মিছরী, রেশম, শানাই, শাল, সিন্দুক, হালুয়া, হাউই।

---

*ফারসী ভাষা বাংলার মত আর্য-শাখার ভাষা। এই দুই ভাষার মধ্যে লিপির পার্থক্য সত্ত্বেও যে মৌল সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আরবী সেমীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলিয়া বাংলার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

দৈনন্দিন জীবন সম্পৃক্ত শব্দ—অন্দর, আওয়াজ, আবহাওয়া, আসমান, ওজন, কদম, কারখানা, খবর, খোরাক, চাকর, জানোয়ার, জাহাজ, তাজা, দানা, দোকান, রোশনাই, সাদা, সাফ, হপ্তা, হজম, হুজুগ প্রভৃতি।

আরবী শব্দ—(ফারসীর মধ্য দিয়া)।

আইন, আক্কেল, হুঁকা, কেচ্ছা, খাসী, কেতাব, তাজ্জব, ফসল, বাকি, মুহুরী, হজম, তামাসা, জিলা, জবাব, গলদ, খাজনা।

তুর্কী শব্দ—আলখাল্লা, কোর্মা, খাঁ, খাতুন, গালিচা, চিক, চাকু, তুর্ক, তবক, কুলী, বোঁচকা, দারোগা, বাবুর্চী, বাহাদুর, বিবি, বেগম, বকশী, মুচলকা, লাশ, সওগাৎ ইত্যাদি।

ফারসী হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রত্যয় ও উপসর্গের প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন, "গিরি" (বাবুগিরি); "দার" (অংশীদার, জোতদার); "আনা" (বাবুআনা); "সই" (মাপসই, টেকসই); "ফি" (ফি-হপ্তা); "বে" (বে-বন্দোবস্ত)।

পোর্তুগীস শব্দ—

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার উপলক্ষে পোর্তুগীসগণের বাংলায় আগমন ঘটে এবং পোর্তুগীস ভাষায় শতাধিক শব্দ বাংলায় প্রবেশ লাভ করে। এই শব্দগুলি বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে ইহাদিগকে আগন্তুক শব্দরূপে পৃথকীকরণ শক্ত হইয়া পড়ে। যেমন,

আনারস, আলপিন, আলকাতরা, নোনা, আতা, আলমারি, বালতি, বোতাম, কামিজ, কেরাণী, চাবি, পেয়ারা, পিপা, পেঁপে, সাবান, সাবু, তোয়ালে, তামাক, বারান্দা, গুদাম, বরগা, গামলা, কপি, ফিতা, নীলাম, পেরেক, পাঁউরুটি, ক্রুশ ইত্যাদি।

ফারসী ও ওলন্দাজ শব্দ—

অষ্টাদশ শতকে কয়েকটি ফরাসী ও ওলন্দাজ শব্দ বাংলায় আসিয়াছিল।

ফারসী—কার্তুজ, কুপন।

ওলন্দাজ—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ।

অন্যান্য ভাষার ও কয়েকটি শব্দ বাংলায় আসিয়াছে।

ইতালীয়—কোম্পানী, গেজেট, ম্যাজেন্ট।

রাশিয়ান—বলশেভিক, সোভিয়েত।

ইংরেজী শব্দ—ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইবার পর বাংলা ভাষার উপর ইংরেজীর প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। ফলে বহু ইংরেজী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ

করিয়া বাংলার শব্দ-ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে ও প্রয়োজনমত ইংরেজী শব্দ আহৃত হইবে। বাংলায় প্রয়োগ রীতির উপর ইংরেজী ভাষার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়।

নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলি বাংলা উচ্চারণে বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। যেমন, টিকিট, ট্রেণ, সার্ট, সেমিজ, কোর্ট, ডেপুটি, টেবিল, চেয়ার, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, কলেজ, ফোন, ফটো, টেলিগ্রাফ, কমিটি, ইলেকসন, ম্যাটিনী প্রভৃতি।

কয়েকটি ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ প্রভাবে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যেমন, ডাক্তার, হাঁসপাতাল, গেলাস, পুলিশ, টেবিল, আপিস, বাক্স, লণ্ঠন, গারদ, কার, সান্ত্রী প্রভৃতি।

কয়েকটি ইংরেজী শব্দ বাংলার সমাস-যুক্ত পদে উপসর্গের মত ব্যবহৃত হয়। যেমন, "হাফ" (হাফ-হাতা); "হেড" (হেড-পণ্ডিত, হেড-মিস্ত্রী); 'ফুল' (ফুল-হাতা জামা)।

ইংরেজী হইতে অনুবাদের ফলে **(Trans'ation Loan)** বাংলায় কতকগুলি নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—বাতিঘর **(Light house)**; সুবর্ণ সুযোগ **(Golden opportunity)**; স্বর্ণযুগ **(Golden age)**; গলাবন্ধ **(Neck tie)**; বাধিত **(Obliged)**; হাতঘড়ি **(Wrist watch)**; রবীন্দ্রনাথ গবাক্ষ লণ্ঠন **(Bull's eye lantern)** প্রয়োগ করিয়াছেন। ইংরেজী শব্দের সাদৃশ্যে অন্তরীন, আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক, মাধ্যম, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে চালু হইল কনট্রোল, রেশন; সাপলাই, জিপ, ট্রেঞ্চ, কিউ, ব্ল্যাকআউট। দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে আসিল ক্যাম্প, রিফিউজি, ডোল, পাসপোর্ট, ভিসা, লক আউট, হটলাইন ইত্যাদি।

ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের অনেক শব্দ ইংরেজীতে গৃহীত হইবার পরে বাংলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।

যেমন, জেব্রা (দক্ষিণ-আফ্রিকার); কুইনাইন (দক্ষিণ আমেরিকার); হারাকিরি, রিক্সা (জাপানী); গুদাম (মালাই); লামা (তিব্বতী);

দুই একটি বর্মী ও চীনা ভাষার শব্দ ও বাংলায় গৃহীত হইয়াছে।

বর্মী—ঘুগনি, লুঙ্গি, ফুঙ্গি।

চীনীয়—চা, চিনি।

ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষারও কিছু কিছু শব্দ বাংলায় পাওয়া যায়। বাংলায় নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখন হিন্দী উর্দুর প্রভাব লক্ষণীয়। যথা, হরতাল (গুজরাতী); বরগী (মারহাটী); চেট্টি (তামিল)। হিন্দী 'বন্ধ্' শব্দ গুজরাতী 'হরতাল' শব্দকে হটাইয়া দিতেছে। অনুরূপভাবে 'একটানা', 'সেনাবাহিনী', 'পরিকল্পনা

কমিশন'-এর পরিবর্তে যথাক্রমে 'লাগাতার', 'জওয়ান' এবং 'যোজনা কমিশন' ব্যবহৃত হয়। এখন 'বিমান ছিনতাই' চলে।

পূর্বোক্ত একশ্রেণীর শব্দের সহিত অন্যশ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণের ফলে যে সমস্ত শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হয় **মিশ্র শব্দ (Hybrids, Hybrid words)**।

তৎসম শব্দ+বিদেশী প্রত্যয়—পণ্ডিতগিরি ; নস্যদান।

দেশী+বিদেশী—হাটবাজার, গোরাবাজার।

বিদেশী+দেশী—মাষ্টারমশায় ; ডাক্তারবাবু, হেডপণ্ডিত।

বিদেশী+বিদেশী—পুলিসসাহেব, হেড্‌মৌলবী, উকীল-ব্যারিষ্টার।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, কোন ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে এইরূপ নূতন নূতন শব্দ সংযোজন প্রাণের লক্ষণ। প্রত্যেকটি জীবন্ত ভাষাই এইভাবে অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দাবলী গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। ইংরেজী ভাষা ও পণ্ডিত, বাজার, লুট, হুঁকা প্রভৃতি ভারতীয় শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে।

বাংলা ভাষা যে নদীর স্রোতের মত দুইদিক হইতে শব্দসমূহ কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার দ্বারা সজীবতার লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বাংলা ছন্দ

সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ দৈবশক্তিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য ভাব অপেক্ষা ছন্দকেই গানে ও মন্ত্রে রূপ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। কথা বলিবার সময় যখন মাঝে মাঝে শ্বাসবেগের গতি শ্লথ হয়, তখন আবার নূতন করিয়া শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এইভাবে বাক্যের মধ্যে যে বিরাম ঘটে তাহাকে **যতি (Pause)** বলে। পদ্যে নির্দিষ্ট অক্ষরের পর যতি পড়ে; কিন্তু গদ্যে যতির কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। বাক্যের অর্থ অনুসারে শ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। পদ্যে প্রত্যেক ছত্রে এক বা একাধিক যতি থাকে এবং যতির সাহায্যে ছত্র পর্বে বিভক্তি হয়। শেষ যতিতে ছন্দের চরণ সম্পূর্ণ হয়। অর্থ এবং শ্বাস যেখানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। বৈদিক রচনাকে **ছান্দস্** বলা হইয়াছে।

সংস্কৃতে ছন্দ ছিল অক্ষর-মাত্রিক। অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করিত। প্রত্যেক চরণে মিল থাকার কোন বাধ্যবাধকতা বৈদিকে কিংবা সংস্কৃতে ছিল না। বৈদিক সংস্কৃতে ত্রিষ্টুভ্ গায়ত্রী, জগতী অনুষ্টুভ্ ও বিরাজ এই পাঁচটি ছন্দ ছন্দ পাওয়া যায়। বৈদিকের তুলনায় সংস্কৃতের ছন্দোবৈচিত্র্য বেশি। বৈদিক ছন্দ 'অনুষ্টুভ্' সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতে ব্যবহৃত অন্যান্য ছন্দগুলির মধ্যে মন্দাক্রান্তা মালিনী, তোটক, পজ্ঝটিকা উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় এই ছন্দগুলির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কালিদাসের রচিত কাব্যে মন্দাক্রান্তা ছন্দের চারিটি পর্ব রহিয়াছে—কশ্চিৎকান্তা | বিরহগুরুণা | স্বাধিকার | প্রমত্তঃ | সংস্কৃত ছন্দের বেশির ভাগ সমাক্ষর পাদ।

পালিতে ছন্দ-পদ্ধতি সংস্কৃতের মত অক্ষর-মূলক। প্রাকৃতে সংস্কৃত আর্যা ছন্দ 'গাহা' (=গাথা) নামে পরিচিত। প্রাকৃতের ইহাই নিজস্ব ছন্দ। প্রাকৃতের তুলনায় অপভ্রংশের ছন্দ-রীতি অনেক উন্নত। অপভ্রংশের এই ছন্দ-ঐশ্বর্য সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনীয়। গাথা ও দোহা ছাড়া অপভ্রংশের ছন্দের কাঠামো চতুষ্পদী। জয়দেবের গীত গোবিন্দ অপভ্রংশ ছন্দে রচিত। অপভ্রংশ ছন্দের ঐশ্বর্য জয়দেবের গীত গোবিন্দে লক্ষণীয়। গীত গোবিন্দের পদগুলি সেজন্য সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলায় ছন্দ পদ্ধতি

সংস্কৃত 'পজ্ঝটিকা' পাদাকুলক ছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। অর্বাচীন অপভ্রংশের প্রধান ছন্দ হইতেছে 'চউপঈ' (=চতুষ্পদী)। এই চতুষ্পদীর সঙ্গে পাদাকুলক ছন্দের বিশেষ মিল রহিয়াছে।

অবহট্‌ঠ ভাষায় পাদাকুলক ছন্দের দৃষ্টান্ত—

দেক্ষিল | বয়ণা | সবজণ | মিট্‌ঠা
তেঁ তৈ | সনজম্ | পওঁঅব | হট্‌ঠা।

অর্বাচীন অপভ্রংশের বেশী প্রভাব পড়িয়াছে প্রাচীন বাংলার তান প্রধান ও ধ্বনি প্রধান ছন্দে।

চর্যার অধিকাংশ পদ ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক ছন্দে রচিত। এই ছন্দ পরবর্তী কালে চতুর্দশ মাত্রিক পয়ার ছন্দে ও ত্রিপদীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। জয়দেবের রচিত গীত গোবিন্দে চর্যার প্রভাব দৃষ্ট হয়।

চর্যায় চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট পয়ারেরও নিদর্শন মিলে। যেমন,

সসুরা নিদ গেল | বহুড়ী জাগই।
কানেট চোরে নিল | কাগই মাগই॥

লুই ভণই বট | দুলক্‌খ বিণানা।
তিঅ-ধাএ বিলসই | উহ ন জানা॥

চর্যায় ২৭ মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দ ও পাওয়া যায়।

তিঅ-ধাউ খাট | পড়িলা সবরো | মহাসুখে | সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ | ণইরামণি দারী | পেক্ষ রাতি | পোহাইলী॥

এইরূপ মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দ ত্রিপদীতেও রূপান্তরিত হইতে পারে। প্রাচীন বাংলায় শক্করী জাতীয় চতুর্দশ মাত্রা বিশিষ্ট এক প্রকার ছন্দ ও দৃষ্ট হয়।

আদি-মধ্য বাংলার ছন্দ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাংলার নিজস্ব ছন্দ "পয়ার" আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্বরধ্বনির উচ্চারণ একমাত্রিক না হওয়ার দরুন অনেক স্থানে চৌদ্দ অক্ষরের কমও পাওয়া যায়। এই যুগের ছন্দ ছিল প্রধানত তান প্রধান, অর্থাৎ সুরের সহযোগে আবৃত্তি বা গান করা হইত। সেইজন্য পয়ার ও ত্রিপদী মুখ্য ছন্দ। যেমন,

আসাঢ় মাসে নব | মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর | নয়ন ঝুরএ॥

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি | কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি | এ গোঠ গোকুলে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ত্রিপদী ছন্দেরও সাক্ষাৎ মিলে।
লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ ঃ

যত আলঙ্কার | বহুমূল সার | সব রাধা মোর | নে |
সুবণ্ণে জড়িত | হিরাএ রচিত | বাঁশী গুটি মোর | দে॥

অন্ত্য-মধ্য বাংলার ছন্দ

অন্ত্য-মধ্য বাংলায় অক্ষরের মাত্রাসমতা হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরকে সমান পর্যায়ে আনিল। পদান্ত অ-কারের উচ্চারণ লুপ্ত হইল। শব্দ দ্বিমাত্রিকতা প্রবণ হইল। শ্বাসাঘাতের দরুণ অক্ষর বহনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ফলে পয়ার ছত্রে চৌদ্দ এর বেশি অক্ষর স্থান পাইত। ছন্দ সুর প্রধান ছিল বলিয়া অক্ষর বৃদ্ধিতে কোন অসুবিধা হইত না।

ব্রজবুলীতে অর্বাচীন অপভ্রংশের ছন্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

যেমন, ষোড়শ মাত্রিক চতুষ্পদী—

মন্দির বাহির | কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল | পঙ্কিল বাট ॥

আধুনিক বাংলায় তিন প্রকার ছন্দ দৃষ্ট হয়। মাত্রা বা উচ্চারণ কাল ছন্দের মুখ্য বিষয়। সংস্কৃতের ছন্দ quantitative। বাংলার মত দুই এক মাত্রায় তাহা শেষ হয় না। বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য নির্ভর করে হলন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বস্বরের মাত্রার উপর। ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির শ্রুতিদ্যোতকতা (accoustic quality) ও বহমান ক্ষমতা বেশি ॥ সেজন্যে বাংলা ছন্দের মাত্রানির্ণয়ে স্বরধ্বনিই মুখ্য অংশ গ্রহণ করে।

(১) তান-প্রধান ছন্দ বা অক্ষরমাত্রিক ছন্দ।

অক্ষরগুলি টানিয়া টানিয়া কতকটা সুর করিয়া পাঠ করিলে উহাকে **তান-প্রধান ছন্দ** বলা হয়। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহাতে অক্ষর ধ্বনি আসল বস্তু নয়। একটা তান বা সুরের প্রবাহ ইহার চরণগুলির মধ্যে লীলায়িত ভঙ্গীতে খেলা করে। পূর্বে অক্ষরের সংখ্যা অনুযায়ী মাত্রা সমাবেশ করা হইত বলিয়া ইহাকে **অক্ষরবৃত্ত ছন্দ** ও বলে। যেমন,

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল | ঈশ্বর পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ | কে বট আপনি ॥

কে যেন রচিতেছিল | ছায়া রৌদ্র করে।
অরণ্যের সুপ্তি আর | পাতার মর্মরে ॥

মিত্রাক্ষর ছন্দ; অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ইহার পর্যায়ভুক্ত ॥ বাংলায় অনেক শ্রেষ্ঠ পুস্তক এই ছন্দে রচিত হইয়াছে।

(২) ধ্বনি-প্রধান, ধ্বনি-মাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

স্বরধ্বনিকে যেখানে দীর্ঘ বা প্রসারিত করিয়া পাঠ করিবার রীতি আছে এবং ছত্রটি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রার পর্বে বিভক্ত হয়, এইরূপ ছন্দকে **ধ্বনিপ্রাধান** বা **মাত্রাবৃত্ত ছন্দ** বলা হয়। এই প্রকার ছন্দে শ্বাসাঘাত থাকে না। এই প্রকার ছন্দের মূল কথা হইল যে চরণের অন্তর্গত পদগুলিতে প্রতিটি অক্ষরধ্বনিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। সেইজন্য প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারিত ধ্বনি-পরিমাণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। মাত্রাবৃত্তে সমস্ত যুগ্ম ধ্বনিই দীর্ঘ, কিন্তু অক্ষয়বৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দে যুগ্মধ্বনির বেশির ভাগ

ক্ষেত্রেই হ্রস্ব এবং এইগুলিকে একমাত্রার ধরা হয়। যেমন, জন-গণ-মন-অধিনায়ক-জয় হে-ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

বাবু কহিলেন—বুঝেছ উপেন—ও জমি—লইব কিনে।

(৩) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ।

প্রবল শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক যেখানে ছন্দের বৈশিষ্ট্য, সেখানে ছন্দটিকে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বলা হয়। এই ছন্দে চরণের প্রতিপর্বে চারি মাত্রা ও দুইটি পর্বাঙ্গ থাকে। এই ছন্দে প্রতি ছত্র কয়েকটি শ্বাসাঘাত-পর্বে বিভক্ত হয় এবং সাধারণত প্রতি পর্বে প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। প্রত্যেক শ্বাসপর্বের প্রথম শব্দের অক্ষরটি পরবর্তী অক্ষরের তুলনায় একটু উচ্চ স্বরগ্রামে আরম্ভ হয়। বাংলা ছড়ায় ও লোক মুখে প্রচলিত কবিতায় এই ছন্দের বিশেষ ব্যবহার আছে। এই ছন্দের বৈচিত্র্য বিশেষ নাই, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শ্বাসাঘাতের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে স্বরান্ত অক্ষরের (closed syllable) দৈর্ঘ্যের দুই মাত্রা এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বরধ্বনিকে একমাত্রা ধরা হয়। কিন্তু ছড়ার ছন্দে বা স্বরবৃত্তে ধরা হয় একমাত্রা। যেমন,

ওই সিন্ধুর টিপ, | সিংহল দ্বীপ | কাঞ্চনময় | দেশ
ওই চন্দন যার | অঙ্গের বাস—তাম্বুল বন | দেশ॥

মেঘের উপর | মেঘ ক'রেছে | রঙের উপর | রঙ্।
মন্দিরেতে | কাঁসর-ঘন্টা | বাজল ঠঙ্ | ঠঙ্॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বাংলায় স্বরাঘাত, ঝোঁক, প্রস্বন (Accent in Bengali)

ঝোঁক দুই প্রকার—(১) **স্বরাঘাত (Pitch accent)**

(২) **বল বা শ্বাসাঘাত (Stress accent)**

স্বরগ্রামের (Tone) অবস্থানকে (Pitch) বলা হয়। কথাবার্তা বলিবার সময় কিংবা আবৃত্তি করিবার কালে স্বরগ্রামের কোন পর্দায় কোন শব্দ বা অক্ষর উচ্চারিত হইবে, তাহার উপর ঝোঁকের প্রকৃতি নির্ভর করে। স্বরধ্বনির ঘোষ যখন উচ্চতর বা নিম্নতর গ্রামে ধ্বনিত হয় তখন তাহাকে **সুর** বলে। যখন নিঃশ্বাস বায়ু অধিকতর জোরে বাহির হইয়া পদের মধ্যে একটা অক্ষরের উপর পতিত হয়, তখন তাহাকে শ্বাসাঘাত বলে। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় (বেদে) **সঙ্গীত স্বরাঘাতেরই (musical accent)** প্রাধান্য ছিল। শব্দের অক্ষরের উপর প্রদত্ত ঝোঁকের তারতম্য অনুসারে সুরের উত্থান পতন ঘটিত। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বৈদিক সুরের উত্থান পতন লক্ষ্য করিয়া নাম দিয়াছেন—(ক) **উদাত্ত** (acute)—অর্থাৎ যে স্বরধ্বনিতে প্রধান স্বর থাকে; (খ) **অনুদাত্ত** (unaccented)—যে অক্ষরে স্বরাঘাত পড়ে না; (গ) **স্বরিত** (circumflex)—প্রধান স্বরাঘাতের অব্যবহিত পরবর্তী স্বরধ্বনিতে উৎপন্ন নিম্নগামী স্বরের এবং যে অক্ষরে স্বর উঠিয়াই নামিয়া যায়, সেই স্বরকে বলা হয় স্বরিত। এই স্বরাঘাতের সঙ্গে শব্দের অর্থের ও সম্বন্ধ ছিল। স্বরের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় শব্দের অর্থ বা লিঙ্গের পরিবর্তন ঘটিত।

যেমন, রা́জপুত্র (বহুব্রীহি সমাস) ; রাজপুত্র́ (তৎপুরুষ)
ই́ন্দ্রশত্রু ("), ইন্দ্রশত্রু́ (").
সু́কৃত (বিশেষ্য) ; সুকৃ́ত (বিশেষণ)
য́শস্ (ক্লীবলিঙ্গ) ; যশ́স (পুংলিঙ্গ)

'Tone' (স্বর) ও **'Intonation'** (ধ্বনিতরঙ্গ) Pitch-এর পর্যায়ভুক্ত। স্বরাঘাত যখন শব্দকে অতিক্রম করিয়া বাক্যাংশে বা বাক্যে পরিব্যাপ্ত তখন এই প্রক্রিয়াকে ধ্বনিতরঙ্গ বা স্বরভঙ্গী বলা হয়। Tone-এর বেলায় শব্দের আভিধানিক অর্থের পরিবর্তন ঘটে, আর Intonation-এর বেলায় বাক্যের অর্থের পরিবর্তন হয়।

ভাষায় কালক্রমে ঝোঁকের পরিবর্তন ঘটে, যদিও এই পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন। ঝোঁকের এই পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে শব্দের কোন অংশকে বেশি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা হইত। অবশ্য প্রত্যেক ভাষাই নিজস্ব ধারা অনুযায়ী ঝোঁক বা সুরের নিয়ম অনুসরণ করে।

সব ভাষাতেই স্বরাঘাত ও শ্বাসাঘাত এই উভয়বিধ ঝোঁকই বর্তমান। তবে কোন ভাষায় প্রথমটির প্রাধান্য কোন ভাষায় বা দ্বিতীয়টির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সুর বিশিষ্ট ভাষাগুলির মধ্যে বৈদিক সংস্কৃত, হোমারীয় গ্রীক, লিথুয়ানীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর তাবৎ ভাষাগুলির বেশির ভাগই শ্বাসাঘাত প্রধান। যে সব ভাষায় শ্বাসাঘাত প্রধান, সেই সব ভাষায় গৌণভাবে সুর অবস্থান করে, আবার সুর বিশিষ্ট ভাষাগুলিতে পরোক্ষভাবে শ্বাসাঘাত থাকে। ইংরেজী, জার্মান, স্পেনীয়, বাংলা প্রভৃতি ভাষাগুলি শ্বাসাঘাত-প্রধান ভাষা (Stress Language)। একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের জন্য শব্দের অর্থও ভিন্ন হয়। যেমন, I´nsult (Noun) ; In´sult (Verb) ; de´file (Noun) ; Defi´le (Verb)।

এই দুই প্রকার ঝোঁকের ফলে শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তনও পৃথক হয়। শ্বাসাঘাতের ফলে যে অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহার পরবর্তী অক্ষর তেমন জোরে উচ্চারিত হয় না; ফলে পরবর্তী অক্ষরের ধ্বনি অনেক সময় সঙ্কুচিত হয় অথবা ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হয়। ইংরেজী literature শব্দটির প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার দরুণ দ্বিতীয় অক্ষরটি স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না। যেমন, li´terature>literature ; ho´usewife>huzif। আবেস্তায় পিতা শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর 'তা' তে শ্বাসাঘাত পড়ায় পরবর্তীকালে 'প্তা' হইয়া শুধু 'তা' হইয়াছে। পির্তা>প্তা>তা। কিন্তু স্বরাঘাতের ফলে সাধারণত স্বরধ্বনির প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। ইহা অনেক সময় সংবৃত স্বরকে বিবৃত স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত করে। সঙ্গীতে গায়কের কণ্ঠ উচ্চগ্রামে যাওয়ার ফলে মুখ গহ্বরের অধিক বিস্তৃতি ঘটে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সুর কখনো প্রাতিপাদিক কখনো বা ধাতু, কখনো বা প্রত্যয়ের উপর পড়িত। অন্ত্য বৈদিক যুগে সংস্কৃত কবিতাগুলি যখন সুর না করিয়া আবৃত্তি করা হইত, তখনই শ্বাসাঘাত বা বলের আবির্ভাব ঘটিল।

সংস্কৃতে অনাদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে আদিস্বর লোপের দৃষ্টান্ত মিলে। যেমন, পিধান<অপিধান ; পিহিত<অপিহিত ; বগাহ<অবগাহ।

উহা সাধারণত উপধা দীর্ঘস্বরে পড়িত। পালি ও প্রাকৃতে অনাদিস্বরে বলের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় আদিস্বর লোপ অথবা স্বরধ্বনির হ্রস্বতার দ্বারা। যেমন, পি, বি< অপি ; ব<এব ; রঞ্ঞং<অরণ্যং ; দক<উদক ; দানি<ইদানীং ; কহাবণ<কার্ষাপণ।

মধ্য ভারতীয়-আর্যে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের প্রমাণও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইহার ফলে পদমধ্যস্থিত দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইত।

যেমন, গৃহীত>গহিঅ (প্রা) ; অস্মো>অম্হ (প্রা)। শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থান ভেদে ধ্বনির ও বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন, কুর্ত্তা>কত্তুঅ (প্রা) ; কু́র্তা >কচ্চ ; দ্বি́পদ>দুপদ (পা) ; দ্বি́পদ>দিপদ (প্রা)।

নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় ঝোঁকের প্রশ্নটি জটিল। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অনাদ্য অক্ষরে স্থির শ্বাসাঘাত পাঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। চলিত বাংলায় ও হিন্দুস্থানীতে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার রীতি প্রায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাংলার যুগ হইতেই এই দ্বিবিধ শ্বাসাঘাতের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বিরাজ করিত। একই শব্দে উপভাষা ভেদে বলের অবস্থানের পার্থক্য ছিল। যেমন,

সং উ́দ্ধার>উধার (প্রথম অক্ষরে বল)

সং উদ্ধা́র>ধার (দ্বিতীয় অক্ষরে বল)

দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাতের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় আদিস্বর লোপে। যেমন, অভ্যন্তর>ভিতর ; অলাবু>লাউ ; উডুম্বর>ডুমর ; অতসী>তিসি।

দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে আদিস্বর দীর্ঘ হয় নাই। যেমন, অন্ধার (প্রা-বা) <অন্ধকার ; অবণাগমন (প্রা-বা)<আগমনগমন ; পগার (প্রা-বা)<প্রাকার।

যেখানে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে, সেখানে আদিস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। যেমন, আঅর<অপর ; আঁধার<অন্ধকার ; আশী<অশীতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অ>আ হইয়াছে।

যেমন, অম্বল>আম্বল ; অসুখ>আসুখ ; অনুপম>আনুপম ; অশুভ>আশুভ ; অনল>আনল ইত্যাদি।

আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের দরুণ মধ্যস্বর লুপ্ত হইয়াছে—র́াধনা>রাধ্‌না ; গা́মোছা> গামছা ; প্র́তিবেশী>পড়শী ; ন́খহরণিকা>নরুণ।

আদি-মধ্য বাংলায় শেষের দিকেই অন্ত্য অ-কারের লোপ প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। পয়ারে ও ছড়ার ছন্দে তাহা লক্ষণীয়। যেমন, নাটকিয়া>নাটুকে ; অপরাজিতা> অপ্‌রাজিতা। বাংলায় প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার নিয়ম ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল এবং অবশেষে আদ্যস্বর ছাড়া অন্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার রীতি লুপ্ত হইয়া গেল। চলিত বাংলায় আদিস্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত (strong intial accent) পড়ার রীতি একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত

পড়িলেও উহা চলিত ভাষার মত তত প্রবল নহে। আবার সময় সময় অনাদ্য শ্বাসাঘাত ও লক্ষণীয়। যেমন—তোর মাথা। অসমীয়া ও ওড়িয়াতেও অনাদ্য শ্বাসাঘাত দেখা যায়।

বাক্যের মধ্যে কোন শব্দে বেগ বা ঝোঁক পড়িলে সেই শব্দের উচ্চারণে স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়। প্রত্যেক স্বরধ্বনিই তাহার মূলধ্বনিগত (phonemic) স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অগণিত দীর্ঘত্বের পরিচয় দিতে পারে।

ভাবাবেগের আতিশয্যে স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করা যায়। এই স্বরধ্বনির হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের উপর অনেক সময় বাক্যের অর্থেরও তারতম্য ঘটে। যেমন,

তুমি কি খাইবে?—খাইবে কিনা তাহাই জিজ্ঞাস্য।

তুমি কী খাইবে?—কি জিনিষ খাইতে চায় তাহাই জ্ঞাতব্য বিষয়।

উপভাষাগুলিতে কখনো কখনো বাক্যে "Intonation" লক্ষ্য করা যায়। চলিত বাংলায় উচ্চারণের দ্রুততার (Tempo) জন্যও বাক্য সংক্ষিপ্ত বা সঙ্কুচিত হয় বাংলা উচ্চারণে দ্ব্যক্ষরতা (Bisyllabism) এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যেমন, কোথা থেকে এলে>কোত্থেকেলে; যা ইচ্ছে তাই>যাচ্ছেতাই।

বাংলা ছন্দে শ্বাসাঘাত (Prosodical Phoneme)—ভাষার বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত ও ধ্বনিতরঙ্গকে "Prosod'y"-র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এগুলি **অ-বিভাজিত ধ্বনিমূল** এর (Non-segmental Phoneme) অন্তর্ভুক্ত। শ্বাসাঘাত সম্পর্কীয় বাংলা ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে কথা বলিবার কিংবা আবৃত্তি করিবার সময় একটি বাক্য কয়েকটি **অর্থযুক্ত অংশে বা পর্বে (sense-group)** বিভক্ত হয়। বাক্যের এই অংশ বা Unit এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। সেইজন্য ইহাকে **শ্বাসাঘাত-পর্ব (breath-group)** ও বলা হয়। কথা বলার সময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য বাক্যের মধ্যে নিয়মিত ছেদ পড়ে; এক নিঃশ্বাসে যতখানি কথা বলা যায় তাহাকেই Breath-group বলা হয়। বাক্যের এই অর্থযুক্ত প্রত্যেক অংশের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। বাংলা ছন্দের মাত্রা পদ্ধতি এই শ্বাসাঘাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কবিতা আবৃত্তির সময় এই ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় সাধারণত তিন প্রকার ছন্দ প্রচলিত—ধ্বনি-প্রধান, তান-প্রধান ও শ্বাসাঘাত-প্রধান। ধ্বনি-প্রধান ও তান-প্রধান ছন্দের প্রত্যেক অংশের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। পয়ার ছন্দ তান-প্রধান।

যেমন, মহাভারতের কথা | অমৃত সমান ॥

কিন্তু শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ মূলত এই ঝোঁক বা accent এর উপর প্রতিষ্ঠিত; এই হেতু ইহার অন্য নাম **স্বরবৃত্ত ছন্দ**।

যেমন, — বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এলো | বান ॥

কোথায় পাব | কলসী কন্যা | কোথায় পাব | দড়ি

তুমি হও | গহীন গাঙ্গ | (আমি) | ডুইব্যা মরি |

[মহুয়া]

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের উঠানামা কিংবা ভাবাতিশয্যের জন্য ভাষায় স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এই স্পন্দন বাগ্‌ধারাকে সজীব করিয়া ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

শব্দার্থের বিশ্লেষণে ঝোঁক এবং ধ্বনিতরঙ্গের (Intonation) একটা মুখ্য ভূমিকা রহিয়াছে। ধ্বনিতরঙ্গের নানা প্রকার ছন্দ স্পন্দন হইতে পারে। মৌখিক ভাষার ধ্বনিতরঙ্গ ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যের মত দ্বৈতীয়িক বা অ-প্রধান ধ্বনিমূলের (Secondary) অন্তর্গত।

এই প্রদেশে দ্রাবিড়ীয়, অষ্ট্রিক বা তিব্বত-বর্মী ইত্যাদি যে প্রাগার্য ভাষা সমূহ ছিল এই আদি-বাক্য শ্বাসাঘাত ও আদি-পদ শ্বাসাঘাত তাহাদের বিশেষত্ব ছিল। দ্রাবিড়ীয় ও তিব্বত-বর্মী ভাষায় যে প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়িত তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু অষ্ট্রিক ভাষা সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শব্দ গঠন

প্রত্যয় বিচার

প্রকৃতির সঙ্গে (শব্দ ও ধাতু) যাহা যোগ করিয়া নূতন শব্দ গঠিত হয় তাহাকে প্রত্যয় (affix) বলে। প্রত্যয় দুই প্রকার—(ক) **কৃৎপ্রত্যয় (Primary affixes)**; (খ) **তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary affixes)**। ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় ও শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যে শব্দকে ভাঙ্গিয়া পৃথক করা যায় না তাহাকে **মৌলিক শব্দ** বলে।

যেমন, হাত, পা, কান, ভাই প্রভৃতি। শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগে যে শব্দ পাওয়া যায়, তাহাই **সাধিত শব্দ**।

(ক) কৃৎ প্রত্যয়

কৃৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে। বাংলার অনেক কৃদন্ত শব্দ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। ক্ত, ঘঞ্, অনট্ প্রভৃতি সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়। ধাতুর সহিত যুক্ত হইবার কালে এই সমস্ত প্রত্যয়ের অংশ বিশেষ লুপ্ত হয়। যেমন, 'ক্ত' এর 'ক্', 'ঘঞ' এর 'ঘ' ও 'ঞ' এবং 'অনট্' এর 'ট' লুপ্ত হইয়া যথাক্রমে '-ত', '-অ' এবং '-অন' থাকে। বাংলায় অনেক প্রত্যয় ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে লুপ্ত হইয়াছে। প্রত্যয় ও ধাতুর লোপ কিংবা পরিবর্তনের নিয়মগুলি কেবলমাত্র সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রয়োজ্য। বাংলা ধাতু ও প্রত্যয়ের ব্যবহার এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। বাংলায় দুই একটি শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, কহতব্য।

নিম্নে বাংলায় ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলি সম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে—

১। অ—সংস্কৃত ঘঞ্, অচ্, অপ্, ত (ক্ত), য় (যৎ, ণ্যৎ) প্রভৃতি প্রত্যয়ের 'অ' ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে আধুনিক বাংলায় প্রায়ই লুপ্ত। এই জন্য ইহাকে লুপ্ত প্রত্যয় বলা হয়। যেমন, সং কর্ত>কট্ট (প্রা)>কাট ; নৃত্য>ণচ্চ>নাচ ; পক্ব>পক্ক> পাক ; বর্ধ>বড্‌ঢ>বাড়।

অ-প্রত্যয়ান্ত বাংলা শব্দের তিনটি রূপ আছে।

(ক) 'অ' উচ্চারণে লুপ্ত—বল্ + অ = বল্ ; কর্ + অ = কর্।

(খ) 'অ' উচ্চারণে লুপ্ত কিন্তু স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে—দুল্ + অ>দোল্ ; খুঁজ + অ>খোঁজ্।

(গ) 'অ' উচ্চারিত এবং এই উচ্চারণ ও-কারের মত—ডুব্ + অ>ডুবো ; পড়্ + অ>পড়ো ; শিব্ + অ>শিবো ; নিব + অ>নিবো।

'অ' প্রত্যয়ের উৎপত্তি—উক>উঅ>উ>ও>অ
অক>অঅ>অ।

২। সংস্কৃত -ইত (-ক্ত)>-ইঅ (প্রা)> -ই (-ঈ) (প্রা-বা)>আধুনিক বাংলায় লুপ্ত। যেমন, সং—হারিত>হারিঅ>হারি>হা'র ; হাসিত>হাসিঅ> হাসি>হাস ; মারিত>মারিঅ>মারি>মার>মা'র।

৩। অন<সং-অন। যেমন, কাঁদন (ক্রন্দন), খাওন (খাদন), কুঁদন (কুর্দন), পড়ন (পতন), থাকন (√থাক্), ফোড়ন (<স্ফুট্), দেখ্ + অন = দেখন ; ধর্ + অন = ধরন ; এইরূপ নাচন, হওন, খাওন, কাঁপন ইত্যাদি। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। পূর্ববঙ্গের উপভাষায় এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে।

৪। সং অন+আক>অনা।

রন্ধন+আক>রন্ধনাঅ>রন্ধনা>রাঁধ্‌না>রান্না ;

ক্রন্দন+আক>*কন্দনাঅ>কাঁদনা>কাঁদ্‌না>কান্না ;

আয়ান+আক+গমন+আক>*আঅনাঅ গবঁনাঅ>আনাগোনা।

অন+ইক>অনি (উনি, স্বরসঙ্গতির ফলে)

সং চালনিক>চালণিঅ (প্রা)>চালনি>চালুনি ;

ছেদনিক>ছেঅণিঅ (প্রা)>ছেনি ; ছাদনিক>ছাঅণিঅ (প্রা)>ছাঅনি >ছাউনি।

উনি, উনী প্রত্যয়—কাঁদুনি, জলনি, চালুনি, ছাউনি।

৫। সংস্কৃত -অন্ত্‌ (শতৃ প্রত্যয়) বাংলায় অন্ত ও অত হইয়াছে।

অন্ত—জীবন্ত, জীয়ন্ত, বাড়ন্ত, ঘুমন্ত, উঠন্ত, পড়ন্ত<পতন্ত্‌ ; ভাসন্ত (√ভাস্‌);

অত (অং)—ফেরত<ফিরন্ত (প্রা)<*স্ফিরন্ত ; পারত<পারয়ন্ত্‌।

অন্ত+ইক>অতি, তি।

চলন্তিক>চলন্তিঅ (প্রা) >চল্‌তি ; বসন্তিক>বসন্তিঅ>বসতি>বস্‌তি ; উৎস্থন্তিক >উট্‌ঠন্তিঅ>উঠতি ; বর্ধন্তিক>বড্‌ঢন্তিঅ>বাড়তি ; এইরূপ ঘাট্‌তি, গুন্‌তি, ভর্‌তি।

৬। অট<পট্ট—লিঙ্গপট্ট>লেঙ্গট ; মল্লপট্ট>মলাট।

৭। আ—সং আপয় (ণিজন্ত)+অক=আপক>আঅঅ (প্রা)>আ> (ক্রিয়ার কর্তা বা করণ)।

চৌরোদ্ধরাপক>চৌরদ্ধরাঅঅ (প্রা)>চোর ধরা ;

ভক্তরন্ধনাপক>ভত্তরন্ধণাঅ (প্রা)>ভাত রাঁধা।

পক্ষি-মারাপক>পক্‌খিমারাঅঅ>পাখ মারা।

এই প্রত্যয় যুক্ত পদ সমাসবদ্ধ না হইলে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কিংবা নিষ্ঠান্তক বিশেষণ হয়। যেমন, পঠাপক>পঢাঅঅ (প্রা)>পঢ়া>পড়া ; *দৃক্ষাপক>দেক্‌খাঅঅ (প্রা)>দেখা ; চলাপক>চলাঅঅ (প্রা)>চলা।

সং আপয় (ণিজন্ত)+ -ইক (-ইকা)=আপিক, আপিকা>আইঅ>আই।

*বর্দ্ধাপিক>বদ্ধাইঅ>বড্‌ঢাইঅ (প্রা)>বাধাই।

*নৃত্যাপিক>ণচ্চাইঅ (প্রা)> নাচাই ; *ধরাপিক>ধরাইঅ (প্রা)> ধরাই ;

*যাচাপিত>জাচাইঅ (প্রা)>যাচাই ; এইরূপ বাছাই, খোদাই, ঝালাই, ঢালাই, ভালাই (ভাল<ভদ্র) ইত্যাদি।

৮। সং আপয় (ণিজন্ত)+অন+ক=আপনক>আঅণঅ> আন (আনো) (প্রযোজক ক্রিয়ামূল হইতে)

সং—*জানাপনক (=জ্ঞাপনক)>জানান, জানানো।

,, *উপবিশাপনক>উবইসাণঅ (প্রা)>বইসান>বসান, বসানো।

,, শ্রবণাপনক>শুণাঅণঅ>শুনান, শুনানো।

এইরূপ যোগান, যোগানো, মানান, মানানো।

-আন প্রত্যয়ের প্রসারের ফলে আনি, আনী, উনি (ওনি) হয়।

সং—আপয় (ণিজন্ত)+অন+ইক=আপনিক>আঅণিঅ>আনি।

*শ্রবণাপনিক>*সোণাঅনিঅ>শোনানি ;

পারায়ণিক>পারাঅণিঅ>পারানি।

৯। ই<ইঅ<ইক।

বুল<বুলি ; হাস<হাসি ; চুর<চুরি ; ডুব<ডুবি।

প্রেরণার্থক ধাতুর উত্তর 'ই' হয়। খোদাই, বাছাই, বাঁধাই।

ব্যতিহার বুঝাইতে 'ই' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

কাড়াকাড়ি, হানাহানি, মারামারি।

অনেক সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু অনেক স্থলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

যেমন—সং-বিদ্যমান ; কিন্তু বাংলায় সাধু অর্থে ব্যবহৃত।

শুশ্রূষা—শুনিবার ইচ্ছা ; বাংলায় সেবা অর্থে।

ম্রিয়মান—যে মরিতেছে ; বাংলায় মনমরা।

(খ) তদ্ধিত প্রত্যয়

কৃৎপ্রত্যয়ের তুলনায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের বৈচিত্র্য বেশি।

(১) -অ—উচ্চারণে সাধারণত 'অ' লুপ্ত হয়।

যেমন, কালসাপ, কালরাত্রি। আবার কোথাও অ>ও রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কালোজিরা।

(২) -আ<আক (স্বার্থে, নিন্দার্থে, সদৃশ অর্থে)

সং *কালাক>কালা ; * ভদ্রাক>ভল্লাঅ (প্রা)>ভালা ; পত্রক>পত্তঅ >পাতা ; বাচক>বাচঅ>বাঁচা ; রামক>রামঅ>রামা।

'আছে' অর্থে—জলবান্>জলবা>জলআ>জলা ; এইরূপ রোগ—রোগা।

সম্বন্ধ ও বৈশিষ্ট্য অর্থে—পশ্চিম—পশ্চিমা ; এক—একা ।

(৩) -অই> -অমী>অবী>অঞি>অই (তারিখ বুঝাইতে) সপ্তমিক>সপ্তবিঅ >সাতই ; পঞ্চমিক>পাঁচই ।

(৪) -অট,-অটা; টো, টে<বৃত্ত।

নেওটা<নেহটা<ণেহবট্ট<স্নেহবৃত্ত ; একটা<এক্কবট্ট<একবৃত্ত ; ঝাপটা, তামাটে, ভাড়াটে, ঘোলাটে (স্বার্থে, ভাবার্থে ও শীলার্থে প্রযুক্ত)

(৫) (ক) আই<আকিক (ব্যক্তি নামে)—জগাই, মাধাই, রামাই ; ছিরাই (<শ্রীপতি), কানাই, নিতাই।

(খ) -আই<অই<পতি (স্বামী অর্থে)

ভগিনীপতি>বহিনী-অই>*বহিনাই>বোনাই।

(গ) সম্বন্ধ অর্থে—চোরাই, বাদশাই, মোগলাই ; কামাই<কর্ম।

(৬) আট, আটি<কাষ্ঠ, কাষ্ঠিকা—যেমন, গাবরাট<গর্ভগারকাষ্ঠ ; চামাঠি<চর্মযষ্ঠি।

(৭) -আম,—আমি<কর্মক, কর্মিক (ভাবার্থক, সমাস-উত্তর পদে) সং ভণ্ডকর্মক> ভাঁড়াম ; ভণ্ডকর্মিক>ভাঁড়ামি ; পক্বকর্মক>পাকাম ; পক্বকর্মিক>পাকামি।

(৮) -আর, -অরা, -রা<কার, কারক, কারাক।

-আরি, -আরী<কারিক (বৃত্তি অর্থে) গ্রামকার>গোয়ার ; কুম্ভকারক>কুম্ভআরঅ >কুম্ভার>কুমার। চর্মকারক>চম্মআরঅ>চামার ; *সেক্যকারক>সেকরা ; পূজাকারিক >পূজারী ; ভিক্ষাকারিক>ভিখারি ; দ্যূতকারিক>জুঅআরিঅ (প্রা)>জুয়ারি (কিন্তু জুয়াড়ি<দ্যূতবাটক) ; শঙ্খকারিক>শাঁখারি ; উপকারিকা>উয়ারি ; প্রিয়কারিকা> পিয়ারী। কোন কোন শব্দে 'আরি, আরী' প্রত্যয় অন্য শব্দ হইতে আসিয়াছে। সং—কাণ্ডধারিক>কাণ্ডারী, কাঁড়ারী ; ভাণ্ডাগারিক>ভাঁড়ারি ; বোঝা+ভারিক >বোঝারি ; বর্ণাপন>বানান।

(৯) -আল, -আলিয়া, -এল<কারক, কারিক,। ভাবকালি (ম-বা) (<ভাবক) ; সিন্ধালিয়া (ম-বা)>সিঁধেল। -আল<পাল (সম্বন্ধ ও পেশা বুঝাইতে) সং—কোট্টপাল >কোট্টআল>কোটাল ; গোপাল (ক)>গোয়াল>গয়লা (দ্বিমাত্রিকতার জন্য) ; বঙ্গপাল >বঙ্গাল (প্রা-বা) >বাঙ্গাল ; ঘট্টপাল>ঘাটাল ; ঘটিকাপাল>ঘড়ীয়াল, মহিষপাল> মৈষাল (প্রাদেশিক) ; মত্তপালক>মাতোয়াল>মাতাল ; রক্ষাপাল (ক)>রক্‌খআল

(প্রা)>রাখোয়াল>রাখাল। দুগ্ধ+আল>দুধাল ; মস্তক+আল>মাথাল ; দন্ত+আল >দাঁতাল। হিন্দী 'ওয়াল্, ওয়ালা' প্রত্যয় ও পালক হইতে আসিয়াছে। যেমন, বাড়ীওয়ালা, বাসনওয়ালা, চুড়ীওয়ালী ইত্যাদি।

-আলি,-আলী—

মিতালি<মিত্রকারিক, ঘটকালি, নাগরালি, ঠাকুরালী (কার্য ও ভাবার্থে) ; রূপালি, সোনালি, মেয়েলি (সাদৃশ্যার্থে)।

(১০) -ঈয়, -ঈয়া<ইক, ইকা

-ই, -ঈ<ইক, ইকা (সম্বন্ধ, জীবিকা, বৃত্তি, ও ক্ষুদ্রার্থে)।

সং পুস্তিকা>পুত্থিআ (প্রা)>পোথী>পুথি, পুঁথি ; ঘোটিকা>ঘোড়িআ (প্রা)> ঘোড়ী ; বাতিঙ্গণিক, বাতিঙ্গণীয়>বাইঙ্গণিঅ>বাইগনি>বেগুনি ; সং দেশিক, দেশীয় >দেসিঅ (প্রা)>দেশী>দিশি।

ক্ষুরিআ>ছুরিআ (প্রা)>ছুরি ; *ভদ্রমানুষিক>*ভল্লমানুসিঅ<ভালমানুষি ; *ক্ষেত্রিক>খেত্তিঅ>খেতি।

জাতি বাচক—নেপালী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী।

এই প্রত্যয় বিদেশী শব্দেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

জমিদার>জমিদারি ; দাগ>দাগি ; মাষ্টার>মাষ্টারি ; গোলাপ>গোলাপি।

—ইয়া<ইঅঅ<ইক+ক (স্বার্থে) ; অভিশ্রুতির ফলে -"এ" ; অথবা ইক+আক>ইকাক>ইয়া>এ।

সম্বন্ধ অর্থে—পাহাড়িয়া, পাহাড়ে, উত্তুরে, শহুরে, পাড়াগেঁয়ে।

জীবিকা অর্থে—মোট>মুটিয়া>মুটে ; জালিয়া>জেলে ; বারমাসিয়া>বারমেসে ; তিরিশিয়া>তিরিশে ; সাত-মাসিয়া>সাতাসিয়া>সাতাইস্যা>সাতাসে। *হরিদ্রিক> *হলিদ্দিঅ>হলুদিয়া>হলুদে>হ'লদে। ওড্রিক>*ওড্ডিঅ>ওড়িয়া>ওড়ে ; *ক্রন্দনিক কাঁদনিয়া>কাঁদুনে ; কালিয়া>কেলে।

(১০) -আই<আপয়+ইক=আপিক ; অথবা <আয়+ইত=আয়িত (বৃত্তিবাচক বা ভাববাচক, ঈষৎ তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত)।

সং—ভদ্রাপিক, ভদ্রায়িত>ভালই ; ব্রাহ্মণাপিক, ব্রাহ্মণায়িত>বামনাই।

ইষ্ঠ—বলিষ্ঠ, ধর্মিষ্ঠ ইত্যাদির সাদৃশ্যে ধম্মিষ্টি, কম্মিষ্টি (স্ত্রীলোকের কথাবার্তায়)।

(১১) -ও<উক, এক (ব্যক্তিবাচক)। ভদ্রো>ভদ্রোক।

-উয়া> ও<উক+আক=উকাক (বৃত্তিবাচক, বিশেষণরূপে প্রযুক্ত) *হট্টোকাক> হাটুয়া>হেটো ; নর্তকাক>নট্‌্আঅ>নাটুয়া>নেটো। *কাষ্ঠোকাক>কাউঠুয়া> কেঠো। জলুয়া>জোলো ; মাছুয়া>মাউছুআ>মেছো।

(১২) -ইল (ব্যক্তিবাচক, তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত)

যেমন, কাহ্নিল (প্রা-বা)

-ল, -লা, -লি, -লী (বিশেষণ)<-ল, -ইল, অল্ল, অল্লক, -ইল্ল, -ইল্লক।

*পত্রলিকা>পাতলী>পাৎলা ; বিদ্যুল্লিকা>বিজ্জল্লিঅ>বিজুলি>বিজলী ; দীর্ঘল >দিগ্‌ঘল, দিগ্‌ঘল্ল (প্রা)>দীঘল।

*প্রথিল্লাক>পহিল্লাঅ>পহেলা>পয়লা। ছালিয়া, ছেলে<শাব+ল+ইয়া ; বিজুলী <বিজ্জুলিঅ (প্রা)<বিদ্যুত+ল+ইকা।

(১৩) -ড়ি, -ড়ী, -লি, -লী<টী, টিকা (স্ত্রীলিঙ্গ, স্বার্থে ও ক্ষুদ্রার্থে প্রযুক্ত)— বধূটী>বহুড়ী ; *নারটিকা>নারড়ি (প্রা-বা) ; ডগরুলি, ঘড়ুলী (প্রা-বা) ; মুদড়ী (ম-বা)<মুদ্রা ; বহুড়ী<বধূটিকা ; ঝিউড়ী<দুহিতৃ।

-আড়ে, -উড়ে<ট, টিক, বৃত্তিক (বৃত্তি অর্থে)—সর্পবৃত্তিক>সাপুড়ে ; *বাস-বৃত্তিক> বাসাড়ে ; চাষাড়ে<চাষবৃত্তিক ; অনুরূপভাবে খেলুড়ে, ভুতুড়ে, হাতুড়ে।

-টা, -টিয়া, -টে<-ট, -টিক—নেওটা<নেহ-বট্ট<স্নেহবৃত্ত ; ভাড়াটিয়া>ভাড়াটে (বৃত্ত+ইক+আক) ; লেংটা<নগ্‌গ-বট্ট<নগ্ন-বৃত্ত ; আঙটা<অঙ্গুষ্ঠ ; -টা, -টি, -টী <গোটা, গুটি। পাঁচগুটী, চান্দ গোটা, এক-গোটা।

(১৪) পন, পনা<প্পন (প্রা)<ত্বন (বৈদিক) (ভাববাচক, ঈষৎ নিন্দাসূচক) ; বর্ণাপঃ>বানান।

*গৃহিনীত্বন>গিন্নিপনা ; *বড্‌ত্বন>বড়প্পণ (অ)>বড়পণা ; সতীপনা ইত্যাদি।

(১৫) -স, -সা, -সে<সংস্কৃত 'শ' প্রত্যয় (সদৃশ অর্থে)—মুখস, ভেপসা (বাষ্প -শ) ; জলসা (স্বাদ) ; ফরসা, ঝাপসা, চামসে (গন্ধ) ফাঁকাসে, পান্‌সে (<পানিসা) ; ইত্যাদি।

হিন্দী অলগ্‌+সে>আলগোছে।

(১৬) পারা<পরাঅ<প্রায় (সদৃশ অর্থে)—পাগল পারা।

পানা—চাঁদপানা, কুলোপানা।

(১৭) সই—(ক) <সহিঅ<সহিত

(খ) <সহীহ্ (ফারসী)

যেমন, জুতসই, মাপসই, লাগসই ইত্যাদি।

(১৮) সর, সরা<সং সর

একসর (ম-বা), দোসর, দোসরা, তেসরা।

(১৯) হার, হারা—

একহারা, দোহারা, জোহার, ষাঠিহার (ম-বা)।

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

কতকগুলি ফারসী শব্দ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

যেমন, (১) -আন্, -আনা, -আনি (ভাব বা কার্য অর্থে)—গরীবানা, বাবুয়ানা, বিবিয়ানি।

(২) -ওয়ান (রক্ষক, চালক অর্থে)—দারোয়ান, গাড়োয়ান, কোচোয়ান।

(৩) -খানা (আগার অর্থে)—বৈঠকখানা; পিলখানা, জেলখানা।

(৪) -খোর (আসক্ত অর্থে)—ভাঙ্খোর, মদখোর, গাঁজাখোর, আপিঙ্খোর, গুলিখোর।

(৫) -গিরি (ভাব বা কার্য অর্থে)—কর্তাগিরি, বাবুগিরি, কেরাণীগিরি।

(৬) -দান, -দানি ; (আধার অর্থে)—পাদান, পাদানি, পিকদানি। আতরদানি, ফুলদানি।

(৭) -দার (কর্তা অর্থে)—চৌকিদার, বাজনদার, চড়নদার, ঠিকাদার, জমাদার, ফুলদার, চুড়িদার বুটিদার, রংদার।

(৮) -নবিশ (অভিজ্ঞ অর্থে)—নকল-নবিশ, শিক্ষা-নবিশ।

(৯) -বাজ্ (শীলার্থে, নিন্দাসূচক)—ধড়িবাজ, মতলববাজ, ফাঁকিবাজ, মামলাবাজ। -বাজি (ভাবার্থে)—গলাবাজি।

(১০) -সই (যোগ্যতা ও পরিমাণ অর্থে)—মাপসই, জুতসই, টেকসই, দশাসই, চলনসই।

সংস্কৃতের অনেক সমাস-উত্তরপদ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ক্ষেত্র-বিশেষে তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, সংস্কৃত "ময়" প্রত্যয় বাংলায় ব্যাপ্তি বোঝায়। দেশময়, জলময়।

উপসর্গীয় প্রত্যয় (Prefix)

সংস্কৃত উপসর্গ একটিমাত্র ছিল। নঞর্থক উপসর্গ "অ" ব্যঞ্জনের পূর্বে এবং 'অন্" স্বরধ্বনির পূর্বে বসিত। অশেষ, অন্-অবসর।

বাংলায় এই উপসর্গ প্রত্যয় দুইটি আসিয়াছে। অকাজ, অবুঝ, অন্‌হিত। "অ" কখনো কখনো "আ" হইয়াছে। আ-কাল, আ-গোছালো। "অ" স্বার্থিক প্রত্যয়রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, অ-মন্দ, (=মন্দ), অ-কুমারী (=কুমারী)।

উপসর্গ 'নি' বাংলায় নঞর্থক উপসর্গীয় প্রত্যয়রূপে পরিণত হইয়াছে। যেমন, নিখরচা, নিকড়িয়া (নির্ধন অর্থে), নিসকড়ি, নিসাড়ে।

আড়<অর্ধ উপসর্গীয় প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

আড়-পাগলা, আড়-ঘোমটা, আড়-চাহনি, আড়-খেমটা।

ফারসী ভাষা হইতে কয়েকটি উপসর্গ-প্রত্যয় বাংলায় চলিয়া আসিয়াছে। যেমন, গর, দর, না, ফি, বদ, বে, হর।

(১) গর (ফা -'গইর')—ব্যতীত।
যেমন, গর হাজির, গর মিল।

(২) দর—নীচে, মধ্যে।
যেমন, দর পত্তনী।

(৩) না—না হক, নাবালক, (ফারসী না-বালিগ) না-পাষিমানে।

(৪) ফি—ফি-জন, ফি-হাত, ফি-লোক।

(৫) বদ—বদ-গন্ধ, বদ-রাগী।

(৬) বে—বেহাত, বেরসিক, বেচাল।

(৭) হর—হর-দিন, হর-বোলা।

ইংরেজী হেড (head), ফুল (full), হাফ (half) প্রভৃতি উপসর্গীয় প্রত্যয়রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলবী; ফুলবাবু, ফুল-আখড়াই, হাপ-আখড়াই ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলি বাংলা গ্রামের নামের সঙ্গে পাওয়া যায়।

(১) 'অই'<বতী

যেমন, রূপই<রূপ্যবতী (হাওড়া); ফুলই<ফুল্লবতী (হুগলী); সাতই<সপ্তবতী (মেদিনীপুর); ভোগই<ভোগবতী (ত্রিপুরা); ভাবই<ভাববতী

(ময়মনসিংহ); পাঁচই<পঞ্চবতী (ত্রিপুরা); ভাদই<ভদ্রাবতী (বিহারের একটি গ্রামের নাম)

(২) 'অট'<বৃত্ত

ধুলট (বাঁকুড়া); তুলট (দিনাজপুর), মেছট (রংপুর); ঝিঝট (মালদহ)

(৩) 'অন'<বন

দাঁতন<দন্তবন (মেদিনীপুর); পলাসন<পলাশবন (বর্ধমান); মান্দারন< মান্দারবন (হুগলী); নাচন<নৃত্যবন (বর্ধমান); কাচন, মালন (দিনাজপুর)

(৪) 'অর' (স্বার্থিক)

জিনর (দিনাজপুর); গঙ্গর, ডোবর, চেঙ্গর (দিনাজপুর)

(৫) 'অল' (স্বার্থিক)

অন্তল, তুধল, বিসরল (দিনাজপুর), ভিঙ্গল<ভৃঙ্গল (বাঁকুড়া); সিধল (বীরভূম); উচল (রাজসাহী)

(৬) 'অঙ্গ, অঙ্গা, অঙ্গি'<গঙ্গা

করঙ্গ (খুলনা); উদঙ্গ (হাওড়া); ধুরঙ্গ, সাবরঙ্গ (চট্টগ্রাম); হারঙ্গ, মহরঙ্গ (ত্রিপুরা); সরঙ্গা, সরঙ্গা (বর্ধমান); গরঙ্গা, আটঙ্গা, সলঙ্গা (মেদিনীপুর); জলঙ্গা (বগুড়া); সোলঙ্গা (পাবনা); সাপলঙ্গা (চট্টগ্রাম); মতরঙ্গা (বাঁকুড়া); উচঙ্গা (ত্রিপুরা); বরঙ্গা<বড়গঙ্গা ? (ময়মনসিংহ); ঝলঙ্গি (জলপাইগুড়ি); বুরঙ্গি (রংপুর)

(৭) 'অঞ্জ, অঞ্জা'<গঞ্জ<ফারসী-গঞ্জ পৌলঞ্জ (বগুড়া, বীরভূম); তুরঞ্জ (বীরভূম); সরঞ্জা, নামঞ্জা (বগুড়া)

(৮) 'অণ্ড, অণ্ডা, অণ্ডি'<কাণ্ড ?

চাচণ্ড (মুর্শিদাবাদ); রোহণ্ড (২৪ পরগণা); বেরেণ্ডা (বর্ধমান); বাসণ্ডা, দোসণ্ডা, পোসণ্ডা, মেসণ্ডা (বরিশাল); বথণ্ডা (রাজসাহী); কাথণ্ডা, বুধণ্ডা (ত্রিপুরা) দৈসণ্ডা (মদিনীপুর); ['বণ্ড' পদবী]; লোহণ্ডা (ত্রিপুরা, মেদিনীপুর); বেরেণ্ডা, বৈরণ্ডা (বর্ধমান); ধরণ্ডা (ঢাকা); পুতণ্ডি (বীরভূম); [পূততুণ্ড-পদবী বিশেষ]; হিরণ্ডি (ময়মনসিংহ)।

(৯) 'আ'

নয়না<নয়ন (বাঁকুড়া); অর্জুনা<অর্জুন, আচড়া, গোষ্ঠা (ময়মনসিংহ); জুইতা<যোত্র ; করঙ্কা (বীরভূম); চাতরা<চত্বার (হুগলী, খুলনা); শালুকা<শালুক

(মালদহ, বগুড়া); আউসা<আবৃষ (বর্ধমান), সাওতা<সামন্ত (বর্ধমান, মেদিনীপুর); রাকসা<রাক্ষস (রাজসাহী); মহতা<মোহান্ত (মুর্শিদাবাদ); আহিরা<আভীর (বর্ধমান); পাসণ্ডা<পাষণ্ড (বর্ধমান); কল্লা<কল্ল (ময়মনসিংহ)

(১০) 'আই'<আবতী,

বৌলাই [বৌল<মুকুল] (ময়মনসিংহ) ; চান্দাই<চন্দ্রাবতী (বাঁকুড়া, পাবনা, বগুড়া); চাপাই<চম্পাবতী (মালদহ); দোধাই<দুগ্ধবতী (বগুড়া); ভাদাই<ভদ্রাবতী (ময়মনসিংহ); ধামাই<ধর্মাবতী (বগুড়া); ধানাই<ধান্যবতী (বীরভূম); চাকাই (বীরভূম)

(১১) 'আট, আটা, ট, টা'<বৃত্ত, বাটক, আবর্ত, হট্ট

ধবলাট, পিপুলাট, বাসুলাট (২৪ পরগণা); ইচলাট (নদীয়া); জিরাট (নদীয়া, হুগলী); গুজরাট<গুর্জর রাষ্ট্র (মেদিনীপুর, হুগলী); বৈরাট (মেদিনীপুর); পুরাট (হুগলী), কাউরাট (ময়মনসিংহ); খড়িআট (রাজসাহী); ইন্দাটা<ইন্দ্রবাটক, শিয়াটা<শিববাটক (মুর্শিদাবাদ)]

(১২) 'আটি, টি'<আবর্তিকা, বাটিকা, হট্টিকা, অষ্টি

আমাটি, খৈরাটি, মালিয়াটি, যাত্রাটি, পূবাটি, বরাটি, বেখুরআটি [বেখুর<বেখইর <বৃহতী]; কুন্দ্রাটি (ময়মনসিংহ); কইরাটি (ঢাকা); রূপাটি (যশোহর); বিরাটি (২৪ পরগণা হুগলী)

(১৩) 'আর, আড়'<আগার, বাটক

ধামার<ধর্মাগার (ময়মনসিংহ); আমার<আম্রাগার; জামার<জন্মাগার; সাপাড় <সর্পবাটক (বর্ধমান); ফান্দাড়, বেলাড়, সাঙ্গার, ধোন্দার (মেদিনীপুর)

১৪) 'আড়া'<বাটক [তুলনীয় কোল 'ওড়ক' (orak) বাড়ী অর্থে]

সিয়ারা<শিববাটক, সিংহবাটক (হুগলী, মূর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর); কুলড়া< কুলবাটক (মেদিনীপুক); দিয়াড়া<দ্বীপবাটক (ময়মনসিংহ); দেয়াড়া<দেববাটক (নদীয়া, ২৪ পরগণা); হাতীয়ারা<হস্তীবাটক (২৪ পরগণা ; গোয়াড়া<গোপবাটক (ফরিদপুর); বান্দাড়া (ঢাকা); পাসাড়া<পার্শ্ববাটক (ফরিদপুর); তিয়াড়া (ত্রিপুরা); বাউলড়া (বাউল<বাতুল) (বর্ধমান); মওড়া<মধুবাটক ; কৈতারা<কপিস্থবাটক (বর্ধমান); [মধুবাটক, কপিস্থবাটক নাম দুইটি মল্লসারুল তাম্রশাসন লিপিতে পাওয়া যায়]

(১৫) 'অতি'<পাত্রিকা

করাতি<করপাত্রিকা (ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম)

চূনাতি<চূনপাত্রিকা (ত্রিপুরা)

বৈরাতি (জলপাইগুড়ি); ভদ্রাতি (দিনাজপুর)

(১৬) আদি<দ্বীপ

বরাদি<বড়দ্বীপ (ময়মনসিংহ)

আঙ্গিয়াদি ,,

চামায়াদি<চর্মদ্বীপ ,,

ভৈরাদি<ভৈরব দ্বীপ ,,

কাউয়াদি<কাকদ্বীপ (ঢাকা)

(১৭) "আন, আনি" (বিশেষণ অর্থে)

তুল্যান (২৪-পরগণা, হুগলী) ; বৈরান, সাঙ্কিয়ান, কাচিয়ান (ময়মনসিংহ), কাকিয়ান, সাগুয়ান (রাজসাহী); হরিয়ান (বীরভূম); বেলান, মল্যান (বর্ধমান); পানান< প্রস্নান (ময়মনসিংহ); ধুলিয়ানি, সিন্দ্রানি (যশোহর); ছাতিয়ানি (ময়মনসিংহ, পাবনা, ত্রিপুরা, বগুড়া); খামানি (খাম<স্তম্ভ) (বাঁকুড়া)।

(১৮) "আল" (বিশেষণ অর্থে ; "সীমা" অর্থে)

নৈরাল, ভাণ্ডাল, খাদাল, কেশাল (রাজসাহী) : হাণ্ডিয়াল, দাড়িআল (পাবনা); বাহারাল, নিখরাল (মালদহ); এড়াল, অণ্ডাল (বর্ধমান); মাদরাল<মান্দার+আল (২৪-পরগণা), মেহেরাল (বীরভূম)। [তুলনীয়—পঞ্চাল, বঙ্গাল]।

(১৯) "আলি" (অধিকার অর্থে)।

বাড়ীআলি, মারিআলি (ঢাকা); পুটিয়ালি (ময়মনসিংহ) ; মৃগালি, সিরালি (বর্ধমান) ; জোহালী (বগুড়া); চৈতালি (বাঁকুড়া); ভেটোলি (মেদিনীপুর)।

(২০) "আস"<আবাস।

গোয়াস<গোপবাস (খুলনা); ধামাস<ধর্মাবাস (বর্ধমান); ইন্দাস<ইন্দ্রাবাস (বীরভূম); আলাস<আলোকাবাস (বর্ধমান); ভালাস<ভদ্রাবাস (বীরভূম); নান্দাস<নন্দাবাস (দিনাজপুর); চান্দাস<চন্দ্রাবাস (রাজসাহী); চাণ্ডীয়াস<চণ্ডী-য়াস<চণ্ডীবাস (মেদিনীপুর); ধরাস<ধরাবাস (মেদিনীপুর); সিঙ্গাস<শৃঙ্গাবাস (মেদিনীপুর)।

(২১) "আসি"<আবাসিকা।

নোয়াসি<নববাসিকা (ময়মনসিংহ); পঞ্চাসী<পঞ্চবাসিকা (ময়মনসিংহ); কুরাসী <কুটবাসিকা (ময়মনসিংহ); শিলাসী (ময়মনসিংহ)।

(২২) "ই, ঈ"<ইকা (অধিকার বা সম্বন্ধ অর্থে)।

মোলানী<মৃণালিকা (দিনাজপুর); সীমন্তি<সীমন্তিকা (বর্ধমান, হাওড়া); যৌতুকী<যৌতুক (ময়মনসিংহ); গাঙ্গনি<গঙ্গা (নদীয়া, খুলনা); ডাহুকী<ডাহুক (রাজসাহী); জগতী<জগৎ (নদীয়া); কালিনী<কালিন্দী (যশোহর); লবণি< লবণিকা (বর্ধমান); জাম্বুনি<জম্বু (বাঁকুড়া); ডুমনি<ডোম (ঢাকা); নারিকেলী< নারিকেল (খুলনা, ময়মনসিংহ); লাঙ্গুলী<লাঙ্গুল (ঢাকা, বরিশাল); শকুন্তলী< শকুন্তলা (বরিশাল); দীঘলী<দীর্ঘ+লিকা (নোয়াখালী); শিয়ালী<শৃগাল (খুলনা, বগুড়া); দুলালী<দুলাল (ফরিদপুর, হাওড়া), উজলী<উজ্জ্বল (ঢাকা); যুগলী< <যুগল (ঢাকা); চিতলী<চিত্রলিকা (খুলনা); বাতাসী<বাতাস (যশোহর); গুমুখী<গোমুখ (পাবনা); বাউলী<বাতুল (যশোহর); সোহাগী<সৌভাগ্য (ময়মনসিংহ); সমন্তী<সামন্ত (বর্ধমান); কুন্তলী<কুন্তল (ময়মনসিংহ); এলুনী (মেদিনীপুর); বাঙ্গালী<বাঙ্গাল (ময়মনসিংহ)।

(২৩) আইচ<আদিত্য।

বুড়াইচ (যশোহর); বানাইচ (বগুড়া) [তুলনীয় "বহরাইচ"—উত্তর প্রদেশ]

(২৪) "ইদ, ইন্দা<ইন্দ্র।

সেওলাইদ, ভূয়াইদ (ময়মনসিংহ); খুড়াইদ, পেলাইদ, ভিসাইদ (ঢাকা); ধিরিন্দা, খিলিন্দা (ঢাকা); ছিলিন্দা, আসিন্দা (বর্ধমান); থিরিন্দা, তাসিন্দা (মেদিনীপুর); [তুলনীয় ইঁদকুড়ি<ইন্দ্রকুটি; ইন্দাস<ইন্দ্রাবাস (বীরভূম)]।

(২৫) "ইন" (=নি) (বিশেষণ অর্থে)।

উতরাইন<উত্তরায়ণ (দিনাজপুর); লামকাইন (ময়মনসিংহ)
গিলাইন (পাবনা); কাত্তইন (রাজসাহী)
লাইখাইন (চট্টগ্রাম); কুন্দাইন (”)
বুলাইন (”); নিঙ্গাইন (”)
বাগরাইন (মুর্শিদাবাদ); মোলাইন<মৃণাল (”)

(২৬) "ইয়া, ইআ" (বিশেষণ বা সম্বন্ধ অর্থে)

বাঘাইয়া<ব্যাঘ্র (ময়মনসিংহ, নোয়াখালী); ধানাইয়া<ধান্য (ত্রিপুরা); সরাইয়া (চট্টগ্রাম); কোঠাইয়া (মালদহ); হাপানিয়া (যশোহর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ময়মনসিংহ,

ঢাকা) ; জোয়ানিয়া<ফারসী, জওআন (নদীয়া) ; কাউনিয়া<কাহন<কার্ষাপণ (ময়-মনসিংহ, বরিশাল) ; সাওনিয়া<শ্রাবণ (রাজসাহী, পাবনা) ; চতুরিয়া (যশোহর) ; কাপাসিয়া<কার্পাস (ময়মনসিংহ) ; সাওনিয়া<শ্রাবণ (রাজসাহী, পাবনা) ; দোহারিয়া<দোহার (২৪-পরগণা) ; আঙ্গারিয়া<অঙ্গার (হাওড়া, বর্ধমান, বরিশাল) ; কুমারিয়া<কুম্ভকার (হাওড়া) ; পাগারিয়া<প্রাকার (ময়মনসিংহ) ; জাঙ্গালিয়া< জঙ্গল (ময়মনসিংহ, বরিশাল, যশোহর) ; কাজলিয়া<কজ্জল (ত্রিপুরা) ; যোগানিয়া< যোগান (যশোহর) ; রাউলিয়া<রাবণ (ঢাকা)।

(২৭) "ইর"<-ইল্ল (বিশেষণ অর্থে)

চাচির, ধানাইর (যশোহর) ; গুইর (বর্ধমান) ; শাঁকাইর (হাওড়া) ; লঙ্গাইর; গাগির, মুরাকির (ময়মনসিংহ) ; চুপাইর; সামাইর, (ঢাকা) ; উখির, বোগির (ত্রিপুরা) ; বিজির, মানোইর (রাজসাহী)।

(২৮) "ইল"<আলি (সীমা অথবা বিশেষণ অর্থে)

কোমরাইল<কুষ্মাণ্ড (খুলনা) ; শ্যামরাইল, পিপড়াইল (খুলনা) ; মাকরাইল< মর্কটক (যশোহর) ; রাউতাইল<রাজপুত্র (যশোহর) ; ভাঙ্গরাইল (মুর্শিদাবাদ) ; বেরাইল (ময়মনসিংহ, হাওড়া) ; কোকাইল<তেলুগু কোকা, "বন্যকুকুর" (ময়মনসিংহ) ; জুনিয়াইল, ঝাওয়াইল, রোয়াইল, পুষ্পাইল, পিছাইল<পিচ্ছ; মাছাইল (তুলনীয়-সাঁওতালী মছট, বাঁশ), ইম্‌দাইল, টাঙ্গাইল, লাঙ্গাইল<নগ্ন (ময়মনসিংহ) ; সহস্রাইল (ফরিদপুর) ; চাকরাইল<চক্রবাটক+ইল (রাজশাহী) ; জোনাইল, পুনাইল (রাজসাহী) ; ডিমরাইল, হাঁকরাইল (মালদহ) ; শিষরাইল<শীর্ষ (দিনাজপুর) ; সুন্দ্রাইল (দিনাজপুর, ময়মনসিংহ)।

(২৯) "ইলা"

ধামিলা<ধর্ম (রাজসাহী) ; মাদিলা<মর্দল (রাজসাহী) ; মাজিলা<মধ্য (নদীয়া) ; গামিলা (যশোহর) ; পিজিলা (বর্ধমান)।

(৩০) "ইস"<আমিষ

উদাইস<উদ্র+আমিষ (উদ্র, ইং otter) ; নাগাইস, পোম্বাইস (ত্রিপুরা) ; কালিয়াইস, পাঁচলাইস (চট্টগ্রাম)

(৩১) "উ" (সম্বন্ধ অর্থে)

পিঙ্গলু<পিঙ্গল (বগুড়া) ; লাঙ্গলু<লাঙ্গল (বগুড়া) ; গোয়ালু<গোপাল (রঙ্গপুর) ; বাচালু<বাচাল (মেদিনীপুর)।

(৩২) উই<বতী

বেলুই<বিল্ববতী (বর্ধমান) ; চাপুই<চম্পাবতী (বর্ধমান) ;
জামুই<জাম্বুবতী, জাবুই<জম্বুবতী (বর্ধমান)
বাকুই, আরুই, সাহুই, কালুই (,,)
আলুই, আগুই, কোরুই (মেদিনীপুর) ; আকুই (বাঁকুড়া)

(৩৩) "উক" (স্বার্থিক, বিশেষণ অর্থে)

মন্দুক (ত্রিপুরা) ; ভাবুক (দিনাজপুর)

(৩৪) 'উট, উটা'<বৃত্ত ; বর্ত

বেলুট<বিল্ববর্ত (বর্ধমান, বাঁকুড়া) ; একুট<একবর্ত (বীরভূম, মালদহ) ; কুলুট<কুলবর্ত (বর্ধমান, হুগলী), কুচুট<কুচবর্ত ; বিলুট, সিলুট (বর্ধমান) [তুলনীয় "সিলেট"] ; নামুট (রাজসাহী)।

(৩৫) উটি, উটিয়া<বর্তিকা, বৃত্তিকা

বেলুটি<বিল্ববর্তিকা, ঝিঙ্গুটি (ময়মনসিংহ)
চামুটিয়া<চর্মবর্তিকা (,,)
সাতুটিয়া<সপ্তবর্তিকা (,,)
সিঙ্গুটিয়া<শৃঙ্গবর্তিকা (,,)
কামুটিয়া<কর্মবর্তিকা (,,)
বঙ্গুটিয়া<বঙ্গবর্তিকা (,,)
মাঝুটিয়া<মধ্য বর্তিকা (,,)
বাঘুটিয়া<ব্যাঘ্রবর্তিকা (পাবনা)
গাঙ্গুটিয়া<গঙ্গাবর্তিকা (যশোহর, ঢাকা, বর্ধমান, মেদিনীপুর)

(৩৬) "উর, উড়"<পুর, কুট

বেলুড়<বিল্বকুট (হাওড়া, বর্ধমান) ; আমুর<আম্রকুট (বর্ধমান)
চান্দুর<চন্দ্রকুট (মুর্শিদাবাদ, হুগলী) ;
সিউর<শিবপুর (বর্ধমান, বীরভূম) ; রাজুর<রাজপুর (বর্ধমান) ;
সিঙ্গুর<শৃঙ্গপুর, সিংহপুর (হুগলী, বীরভূম) ;
ধামুর<ধর্মপুর (বাঁকুড়া) ; নাচুর<নৃত্যপুর (বাঁকুড়া) ;
ফুলুর<ফুল্লকুট (হুগলী। ; ভিখুর<ভিক্ষাপুর (দিনাজপুর) ;

হাতুর<হস্তপুর (রাজসাহী) ; কেন্দুর<কেন্দ্রকূট (বর্ধমান)
নান্নুর<নন্দকূট (বীরভূম) ; পান্নুর<পর্ণকূট (ময়মনসিংহ) ;

(৩৭) "উড়া, উড়ি"<কূট, কুটিকা, পুর, পুরী

ভাদুড়া<ভদ্রকূট (২৪ পরগণা) ; চান্দুড়া<চন্দ্রকূট (ময়মনসিংহ) ; যশিউড়া (ময়মনসিংহ) [তুলনীয় যশিদি-বিহার] ; মানসউড়া (ময়মনসিংহ) ; আথাউড়া ; উরশিউড়া (ত্রিপুরা) ; গাবুড়া<গর্ভরূপ (খুলনা) ; ভাতুড়া<ভক্তপুর (বর্ধমান) ; সাপুড়া< সর্পপুর (বাঁকুড়া) ; বগুড়া<বককূট ? ভাঙ্গুড়া<ভগ্নকূট (পাবনা) ; খান্দূড়া (মালদহ) ; কেন্দুড়ি<কেন্দ্রকুটিকা (যশোহর, মুর্শিদাবাদ) ; ইটুড়ি<ইষ্টক কুটিকা (বাঁকুড়া) ; মাছুড়ি <মৎস্যকুটিকা (ময়মনসিংহ) ; বাগুড়ি (বগুড়া) ; বাস্থরি<বাসগৃহ+ইকা (ময়মনসিংহ) [তুলনীয় "বাস্থলী", ময়মনসিংহের একটি গ্রামের নাম]

বিজুড়ি (বীরভূম) ; ঘুঘুড়ি (খুলনা, ২৪ পরগণা); সিউড়ী<সিন্দুড়ী<সিংহকুটিকা (বীরভূম)।

(৩৮) "উণ্ড, উণ্ডা" <কুণ্ড

মস্তুণ্ডা (নদীয়া) ; শগুণ্ডা (ঢাকা) ; হুগুণ্ডা (ত্রিপুরা) ; বাস্থুণ্ডা (ঢাকা) ; পুতুণ্ডা (বর্ধমান) [পূততুণ্ড-পদবী বিশেষ]

(৩৯) "উতা" <পুত্র

কালীউতা (ত্রিপুরা) ; একুতা (ঢাকা) ; ঠেঙ্গাউতা (ত্রিপুরা)।

(৪০) "উন, উনা, উনি" <বন

বেলুন<বিল্ববন (হুগলী, মেদিনীপুর) ; কুলুন<কুলবন (বর্ধমান) ; সালুন< শালবন (বর্ধমান), পাতুন<পত্রবন (বর্ধমান) ; কুমারুন<কুমারবন (") ; জামুন< জম্বুবন (ঢাকা) ; জামবুনি (মেদিনীপুর) ; গাধুনি (পাবনা)।

(৪১) "উন্দ" <কুণ্ড

সিঙ্গরা উন্দ (ময়মনসিংহ) ; মাকরাউন্দ (ময়মনসিংহ) ;
পিপড়া উন্দ (,,) গারাউন্দ (,,) ;
গোরা উন্দ (,,) সেহরা উন্দ (,,) ;

(৪২) "উয়া, উআ" (স্বার্থিক অথবা বিশেষণ অর্থে)

কেন্দুয়া<কেন্দ্র (খুলনা, দিনাজপুর) ; আন্দুয়া (হুগলী, বরিশাল) ; সাধুয়া<সাধু (মুর্শিদাবাদ) ; ভাদুয়া<ভদ্র (মেদিনীপুর) ; গাবুয়া<গর্ভ (বরিশাল) ; আটুয়া<অষ্ট

(পাবনা) ; পদুআ<পদ্ম (বর্ধমান) ; সাধুয়া<সাধু (মুর্শিদাবাদ) ; লেমুয়া (নোয়াখালী ; হহুআ (বরিশাল) ; লেছুয়া, হাস্থয়া, ঢেপুয়া (মেদিনীপুর)।

(৪৩) "উল, উলা" <কুল অথবা কুল্যা, "খাল, নদী" অর্থে।

সিঙ্গুল<শৃঙ্গকুল (দিনাজপুর) ; চান্দুল<চন্দ্রকুল (ত্রিপুরা, বর্ধমান) ; কেন্দুল< কেন্দ্রকুল (মালদহ) ; পাটুল<পট্টকুল (রাজসাহী) ; খুরুল (বর্ধমান) ; বানাউল (ময়মনসিংহ) ; মহীপাউল (মালদহ) ; মেমুল (বর্ধমান, মেদিনীপুর) ; পুরুল< পুরকুল (মেদিনীপুর) ; খাটুল (হুগলী) ; আন্দুল (হাওড়া) ; কেন্দুল<কেন্দ্রকুল্যা (বর্ধমান, বীরভূম) ; জামুলা (ফরিদপুর) ; ভেঙ্গুলা (ময়মনসিংহ) ; সিঙ্গুলা (ত্রিপুরা)।

(৪৪) "উলি"<কুলিক

পাটুলি (নদীয়া, খুলনা, ২৪ পরগণা, ময়মনসিংহ) ; কাঠুলি<কাষ্ঠকুলিক (নদীয়া, (ময়মনসিংহ) ; ইন্দুলি<ইন্দ্রকুলিক (ত্রিপুরা) ; সিরুলি (বর্ধমান) ; মুস্থলি (ময়মনসিংহ) ; হিন্দুলী (ত্রিপুরা) ; জাগুলি (নদীয়া, বগুড়া) ; রাঢ়ুলী (খুলনা)।

"উল্লা, উল্যা"<উলিয়া<কুল্যা

থলউল্লা (ময়মনসিংহ) ; পাকুল্লা (ময়মনসিংহ, বগুড়া) ; পারুল্যা (মেদিনীপুর) ভাদুল্যা<ভদ্রকুলিক (মেদিনীপুর) ; বাস্থল্যা (মেদিনীপুর) ; দুল্লা<দুল্লহ<দুর্লভ (ময়মনসিংহ)।

(৪৬) "এআ" [বিশেষণ অর্থে]

করেআ (বীরভূম, কলিকাতা) ; বাটেআ<বর্ত্ম (নোয়াখালী)।

(৪৭) "এঙ্গা" [সম্ভবত অনার্যশব্দ ; তুলনীয়—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ]

তেলেঙ্গা<ত্রৈলঙ্গ (মেদিনীপুর) ; আসঙ্গা (মেদিনীপুর, বীরভূম) ; এলেঙ্গা (ময়মনসিংহ) ; কাটেঙ্গা (ফরিদপুর) ; মোরঙ্গা (ময়মনসিংহ) ; ফরেঙ্গা (চট্টগ্রাম) কালেঙ্গা (ময়মনসিংহ) ; খাটেঙ্গা (ঢাকা)।

(৪৮) "এণ্ডা, এণ্ডি"<এরণ্ড

এরেণ্ডা (খুলনা) ; বালেণ্ডা (২৪ পরগণা) পাতেণ্ডা ; (মুর্শিদাবাদ) ; সেলেণ্ডা বেলেণ্ডা (বর্ধমান) ; দেশেণ্ডা (মেদিনীপুর) ; ভেরেণ্ডী (বাঁকুড়া, রাজসাহী) ;

(৪৯) 'এল'<এল্ল, ইল্ল, অল্ল [বিশেষণ অর্থে]

বোদেলা (রাজসাহী); মহেলা (পাবনা) ; তাহেলা (বীরভূম) ; ভায়েলা (ঢাকা) ; পোপেল্লা (মেদিনীপুর)।

(৫০) 'ঐর'<আড়ি<বাটিকা।

বুধৈর (চট্টগ্রাম) ; ছাঐর (রাজসাহী ; হুটইর (ঢাকা)।

(৫১) 'ঐল'<আলি, কুল।

গাঙ্গৈল<গঙ্গাকুল (রাজসাহী) ; কুন্দৈল (পাবনা) ; কাস্তৈল<কায়স্থকুল (ময়মনসিংহ); সান্তৈল (মালদহ) ; নাকৈল, জিয়ৈল, কাকৈল, পারৈল (রাজসাহী)।

(৫২) 'ওট'<কোট<কোট্ট।

বরোট<বড় কোট (দিনাজপুর) [তুলনীয়, শিয়ালকোট, ফরিদকোট]।

(৫৩) 'ওর, ওড়'।

< { (১) ওড<বড<বৃত
(২) কুট }

চিতোর<চিত্রকুট (দিনাজপুর) ; ঘিওর (ঢাকা); বেতোড় (দিনাজপুর) [তুলনীয় 'বেতড্ড', অনুশাসন লিপিতে প্রাপ্ত] ; গাঙ্গোড় (মালদহ) ; তালোর, লালোর (রাজসাহী), সন্তোড়, গলোড় (বাঁকুড়া) ; তিনোড় (বীরভূম) ; নাটোর<নাট্যপুর (রাজসাহী)।

(৫৪) 'ওড়া'<বড<বট<বৃত।

ধান্দোড়া, কাটোড়া (বাঁকুড়া) ; বিনোড়া (বীরভূম) ; কলেড়া (হাওড়া) ; তালোড়া (বগুড়া) ; কাখোড়া (ঢাকা) ; বলোড়া (নোয়াখালী) ; ধালোড়া (রাজসাহী)।

(৫৫) 'ওল, ওলা'<আবলী ?

চান্দোল<চন্দ্রাবলী (দিনাজপুর) ; নাচোল (মালদহ) ; কাচোল (দিনাজপুর) ; ভাটোল (মালদহ) ; গোধোল (রাজসাহী) ; দারোল, ডিঙ্গোল্ (মালদহ) ; তারোল (বগুড়া) ; আরোলা (বগুড়া) ; কারোলা (যশোহর)।

(৫৬) 'কা' [বিশেষণ অর্থে ; ক্ষুদ্র অর্থে]

মিচকা, ডিহিকা, খুদকা (বর্ধমান) ; লারোকা (বাঁকুড়া) ; নেওকা, পাইসকা, বিসকা, আসকা, রাজুকা (ময়মনসিংহ) ; ঝিটকা, ধানুকা (ফরিদপুর) ; মারুকা (বরিশাল) ; ফুটিকা (চট্টগ্রাম) ; আটিকা (রাজসাহী) ; বাহুকা (পাবনা)।

(৫৭) 'কাই<ক্বাথ

ঝুইকাই (ময়মনসিংহ) ; ঝুজকাই (রাজসাহী) ; তৈলকাই (ঢাকা) ; সনকাই (মালদহ) ; ডাবকাই (মুর্শিদাবাদ)।

(৫৮) 'কি, কী'<কক<ইকা [ক্ষুদ্র অর্থে ; বিশেষণ অর্থে]

ভালকি (বর্ধমান, ময়মনসিংহ) ; কাঁকি, খড়কি (বরিশাল) ; গুড়কি (বগুড়া) ; গিলকী (মালদহ) ; ভাবকি, শুভকি, জামুকি, বারকি (ময়মনসিংহ) ; শালকি (ময়মনসিংহ) [তুলনীয় শালকিয়া (হাওড়া)]।

(৫৯) খি<খেই<ক্ষেপিকা।

গোরাখি, উপলখি (ময়মনসিংহ)।

(৬০) 'চা, চি' (সংযোজক অথবা ক্ষুদ্রত্ববাচক প্রত্যয়)।

লিমচা, পুরচা, ভারিচা (বর্ধমান) ; লারিচা, নাকচা, সানচা (হুগলী) ; করিচা (যশোহর) ; সানাইচা (ত্রিপুরা) ; ভাবিচা (রাজসাহী) ; আওচা (মুর্শিদাবাদ) ; তেসাচি (ময়মনসিংহ) ; ডহচি (মালদহ) ; কিরণচি (ঢাকা) ; ভেরচি (যশোহর) ; বৈঁচি<বহিনচি (হাওড়া, বর্ধমান)।

(৬১) 'চু, চো' [সম্ভবত ভোট-বর্মী শব্দ ; নদী, জল অর্থে]।

'চু, চো' প্রত্যয়ান্ত নামগুলি শুধু ত্রিপুরা জেলায় পাওয়া যায়। যথা, কালিয়া চু, তীর চু, রানী চু, সালিচু, পাপাচু, গাবচু, ঠসরি চু, লাড্ডুচু, কালাচো, দাড়াচো, সিহিরচো

(৬২) 'টা'<হট্ট, বর্ত

চামটা<চর্মহট্ট (খুলনা, যশোহর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, দার্জিলিং) ; কামটা<কর্মহট্ট (খুলনা) ; নাইটা (জ্ঞাতি>নাই) (হুগলী) ; চাকটা, হিলটা (বর্ধমান) ; ডলটা (নোয়াখালী) ; কুইটা (বীরভূম) ; মেকটা (বগুড়া)।

(৬৩) 'টি, টিয়া'<হট্টিকা, বর্তিকা।

ইন্দুটি, জুজুটি, কেলেটি (বর্ধমান) ; সুন্দুটি (মুর্শিদাবাদ) ; খানাটি, মূলাটি (হুগলী) ; অংখেরটি (রাজসাহী) ; বেলটিয়া (ময়মনসিংহ, যশোহর) ; সাউটিয়া (মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ) ; হমটিয়া (মেদিনীপুর) ; আলুটিয়া (বাঁকুড়া) ; গাঙ্গুটিয়া (ঢাকা, যশোহর, মেদিনীপুর) ; করটিয়া (বর্ধমান, ময়মনসিংহ) ; সারটিয়া (পাবনা) ; কেউটিয়া (চট্টগ্রাম) ; ভাউটিয়া<ভাব (ঢাকা)।

(৬৪) "ঠা"<ঠাঁও<স্থান

কাপাইসঠা<কার্পাসস্থান (রাজসাহী) ; মৈঠা, বালিঠা (বাঁকুড়া) ; মাইঠা (ঢাকা) ; গতিসঠা (বর্ধমান)।

(৬৫) "ডি"<ফারসী ডিহ্

কেশরডি, ধনুডি, যশাইডি, লাকুরডি, মাহাতাডি<মহান্ত ; জামালডি (বর্ধমান) ; রাজুডি, পেটারডি (বাঁকুড়া)।

(৬৬) "ড়া, রা"< (১) বাটক } বাড়ী অর্থে
(২) দ্রাবিড়ীয়—বড়া **(vaḍā)**
(৩) কোল—ওড়ক' **(orak')**

ইকড়া<ইক্ষুবাটক (খুলনা, ২৪ পরগণা)

উখড়া<*উক্ষুবাটক (খুলনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া)।

দিয়াড়া<দ্বীপবাটক (ময়মনসিংহ, খুলনা) ; জামড়া<জম্বুবাটক (বর্ধমান) ;

আগরা<অগ্রবাটক (যশোহর, মেদিনীপুর) ; আদ্রা<অর্ধবাটক (মেদিনীপুর, বর্ধমান)।

গাঙ্গরা<গঙ্গাবাটক (ত্রিপুরা, যশোহর) ; চান্দরা<চন্দ্রবাটক (যশোহর, বর্ধমান) ;

জামড়া<জাম্বুবাটক (বর্ধমান) ; রাজরা<রাজবাটক (ফরিদপুর, মেদিনীপুর) ;

গোয়াড়া<গোপবাটক (হুগলী) ; ওঝড়া<উপাধ্যায় বাটক (মুর্শিদাবাদ) ;

ইন্দরা<ইন্দ্রবাটক (ঢাকা) ; ভাটরা<ভট্টবাটক (যশোহর, ময়মনসিংহ) ;

নাওড়া<নাববাটক (যশোহর) ; বহুড়া<বধূবাটক (খুলনা) ;

দেয়াড়া<দেববাটক (বাঁকুড়া) ; নিমড়া<নিম্ববাটক (বীরভূম)।

নিম্নে প্রদত্ত গ্রামের নামগুলির "ড়া" প্রত্যয় সম্ভবত দ্রাবিড় 'বড়া' অথবা কোল 'ওড়ক' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

বাঁকুড়া, চুঁচুড়া, ঝাঝিড়া (ময়মনসিংহ) ; জাজিড়া (বগুড়া) ;

খোকড়া (পাবনা) ; ঘাগড়া (ময়মনসিংহ, বর্ধমান) ;

উলুড়া (বর্ধমান) ; হিলোড়া (মুর্শিদাবাদ) ; জিঞ্জড়া (বর্ধমান) ;

ফাওড়া (নোয়াখালী) ; জাওড়া (ত্রিপুরা) ইত্যাদি।

(৬৭) "ড়ী, রী"<বাটিকা, বড়া+ইকা, ওড়ক'+ইকা

বেলরী<বিল্ববাটিকা (বর্ধমান) ; লাউড়ী<অলাবুবাটিকা (ত্রিপুরা, নোয়াখালী) ; বাগড়ী (হুগলী) ; চাঁচড়ী (যশোহর, খুলনা) ; জুনড়ী (খুলনা) ; ঘুঙ্গড়ী (বরিশাল) ; পিঙ্গড়ী (বরিশাল) ; টিওড়ী (ঢাকা) ; মাগড়ী (খুলনা) ; মথুরী<মস্তকপুরী (মেদিনীপুর)।

(৬৮) তা<(১) তাপ ? -[পদবী বিশেষ]
(২) পত্র

বেলতা<বিল্বপত্র (যশোহর); আমতা<আম্রপত্র (হাওড়া, ঢাকা); কামতা< কর্মপত্র (ঢাকা); রাউতা<রাজপুত্র (রাজসাহী, মেদিনীপুর); খড়িতা (বীরভূম); বাহুতা (২৪ পরগণা); চাকতা (ময়মনসিংহ); বউতা (ঢাকা, ২৪ পরগণা); ভাবতা (মুর্শিদাবাদ); মউতা (যশোহর); কলতা (বরিশাল);

বাকতা (বর্ধমান, ময়মনসিংহ) [মল্লা-সারুল অনুশাসন লিপিতে বক্কতক>বাকতা নাম পাওয়া যায়]

(৬৯) "তি"<পাত্রিকা

রাওতি<রাজপাত্রিকা (পাবনা); ধূপতি<ধূপপাত্রিকা (বরিশাল); দেওয়াতি< দেবপাত্রিকা (ময়মনসিংহ); সাততি, সরাতি (ময়মনসিংহ); গুপতি (ত্রিপুরা); চূনতি<চূর্ণপাত্রিকা (চট্টগ্রাম)।

(৭০) "দা"<দহ, অথবা কোল দাক'—জল অর্থে।

নওদা (মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান); নেওদা (২৪ পরগণা); ওয়ারদা (মেদিনীপুর) [তুলনীয়, ওয়ার্ধা)

সাওরদা<সাগর (মেদিনীপুর); ফুলদা, ধুলদা, হালিদা (ময়মনসিংহ);
খড়িদা, পিপুরদা (,,); খড়দা (২৪ পরগণা);
কুঙ্গর দা (,,) ইত্যাদি।

(৭১) "দি, দিয়া"<দ্বীপ

শিয়ালদি (ফরিদপুর, যশোহর); গাঙ্গদি (নদীয়া);
সাগরদি (ময়মনসিংহ, নোয়াখালী); ধামদি (ময়মনসিংহ);
লেঙ্গরদি, দস্তরদি, বিলাসদি ,লাসারদি, তাতিরদি, টাওয়াদি (ঢাকা)। মামুন্দিয়া (খুলনা); লাভদিয়া<নাভি (নদীয়া); সোহাইদিয়া<সৌভাগ্য, জামালদিয়া (ঢাকা); নারিদিয়া (ত্রিপুরা); আবুদিয়া (পাবনা); বাহিরদিয়া<বহির্দ্বীপ (ফরিদপুর, খুলনা)

(৭২) "না"<(১) বর্ণা
(২) নাব
(৩) নাম

মেঘনা<মেঘবর্ণা (ময়মনসিংহ); পাটনা<পট্টবর্ণা (মেদিনীপুর, যশোহর); গান্ধীনা ; কালনা (বর্ধমান, রাজসাহী, খুলনা, যশোহর); দেওনা (ঢাকা); গাভীনা< গাভীন+আ<গর্ভিনী (ময়মনসিংহ); কাকিনা (হাওড়া) [তুলনীয়—কাকিনাড়া

(২৪ পরগণা); সাগুনা, বাঘনা (রাজসাহী); পাবনা<পত্থওঅন্না [রামচরিত, সন্ধ্যাকরনন্দী] (খুলনা, ২৪ পরগণা, বরিশাল); দারুনা (বগুড়া)।

(৭৩) নাই<(১) নাভি, "কেন্দ্র" অর্থে
(২) নাবিক
(৩) জ্ঞাতি
(৪) নাপিত

রূপনাই, আকনাই, সজনাই (পাবনা); ছাতনাই (পাবনা); [তুলনীয়, ছাতনা] বাকনাই (রাজসাহী); পোতানাই, কেলেনাই (বর্ধমান); দেওনাই (বগুড়া, ঢাকা); রুকনাই (ময়মনসিংহ); তেওনাই (ত্রিপুরা); [তুলনীয় হরিনাভি [২৪ পরগণা]

(৭৪) 'নি'<বনি ; নিয়া<বনিয়া

ইন্দ্রাণী<ইন্দ্রবনি (মুর্শিদাবাদ); তিলনি (দিনাজপুর) ; কাটনি, হাটুনি (খুলনা) ; গিধনি (মেদিনীপুর) ; সরনিয়া (দিনাজপুর) ; কাটানিয়া<কণ্টকবনিয়া (দিনাজপুর); কান্দাবনিয়া<স্কন্ধবনিয়া (ময়মনসিংহ) ; কোকানিয়া (চট্টগ্রাম) ; শশানিয়া, লুটুনিয়া (মেদিনীপুর) ; কেকানিয়া (ফরিদপুর) ; ।

(৭৫) 'পাই'<পাদিকা

সাতপাই, ষোলপাই, নপাই, কাচপাই (ময়মনসিংহ) ; সাঁইপাই<স্বামী (পাবনা) ; কোরপাই (ত্রিপুরা)।

(৭৬) 'ব, বো'<বহ 'বহনকারী'

'ব, বো' প্রত্যয়যুক্ত গ্রামের নামগুলি কেবলমাত্র ঢাকা জেলায় পাওয়া যায়।

আমলাব, আড়িয়াব, কামরাব, বরাব, বেলাব, মশাব, রূপাব, তিলাব, কেন্দুয়াব, বাজনাব ইত্যাদি।

(৭৭) 'ম'<মহু<মধু

আটাম (ময়মনসিংহ) ; জুড়াম (ময়মনসিংহ) ; গোরাম (ময়মনসিংহ) ; উড়িয়াম (ঢাকা) ; চিতাম (ঢাকা)

(৭৮) 'মা'<(১) মাতা (২) মাপ

কলিমা (যশোহর) ; সাতমা (মেদিনীপুর) ; এলোমা (হুগলী) ; রাতমা (বীরভূম) ; বরমা (হুগলী, ময়মনসিংহ) ; ছলমা, লালমা (ময়মনসিংহ) ; কুশমা (বাঁকুড়া) ; খড়মা (খুলনা) ; হোনিমা (ময়মনসিংহ)

(৭৯) 'মি' ?

পাচামি<পঞ্চমী ? (মেদিনীপুর); উরামি (মেদিনীপুর); পচমি (বীরভূম); হিচমি (বীরভূম, বগুড়া)।

(৮০) 'রু'<রূপ

মশারু<মশকরূপ (বর্ধমান); গাবরু<গর্ভরূপ (বর্ধমান); অঙ্গারু<অঙ্গরূপ (পাবনা); কোরারু (রঙ্গপুর)

(৮১) 'লা' [স্বার্থিক 'ল']

নখলা, ভাবলা, আটলা, ঝাউলা, দেওলা, (ময়মনসিংহ); বেওলা (রাজসাহী); আগলা (ঢাকা); মহুলা (মুর্শিদাবাদ); চাপলা; হিঙ্গলা (বীরভূম); সাতলা, তামলা (বর্ধমান); ধামলা (হুগলী); পাঁচলা (হাওড়া)

(৮২) 'লাই'<নাই<নাভি ?

আওলাই, মোরলাই, সেহালাই, জোকলাই (বীরভূম); হাসলাই, পিতলাই (ঢাকা); দেওলাই (রঙ্গপুর)

(৮৩) 'লী' (১) স্বার্থিক প্রত্যয় (২) পল্লী (?)

পাঁচলী (যশোহর); নোয়ালী<নবপল্লী (যশোহর), দেওলী<দেবপল্লী (ময়মনসিংহ); মহুলী<মধুপল্লী (মেদিনীপুর); ভাদলী<ভদ্রপল্লী (বাঁকুড়া); চামারলী<চর্মকারপল্লী (হাওড়া); পূজালী (২৪ পরগণা); ইন্দুলী (ত্রিপুরা); তারুলী (২৪ পরগণা);

(৮৪) 'লিয়া'<পল্লী+ইকা

রাঙ্গালিয়া (পাবনা); আটলিয়া, কুশলিয়া (খুলনা); আনলিয়া, শিরলিয়া (রাজসাহী); কুচলিয়া (যশোহর); মাসিলিয়া, পাঁচলিয়া (নদীয়া); পেঁচালিয়া (বীরভূম); চৌলিয়া (হাওড়া); কুন্দলিয়া (বাঁকুড়া)।

(৮৫) 'সন, সনা'<আসন

বাঘাসন (বর্ধমান); পিপুলসন, উত্রাসন, তুলাসন (রাজশাহী; আদাসন (ফরিদপুর); মাকরসন (পাবনা); তিলাসন (মালদহ); বাতাসন (দিনাজপুর, রঙ্গপুর); কুরসনা, ভদ্রসনা (রাজসাহী)।

(৮৬) 'সা, সাই<সাহী

বাকসা (হাওড়া, নদীয়া, যশোহর); রূপসা (ময়মনসিংহ, বর্ধমান, খুলনা); ধামসা (মুর্শিদাবাদ); ভুরসা,আলিকসা (মেদিনীপুর); গদসা, মুচিসা (২৪ পরগণা);

গোরসা (বীরভূম); নাকসা (হুগলী); ডাঙ্গরসাই (বাঁকুড়া); বেহারাশাই, উড়াইসাই, আমিলাসাই, দেরাঙ্গসাই (মেদিনীপুর); লধাসাই (বর্ধমান); দেপাসাই (ঢাকা)।

(৮৭) 'হা'<ঘাত ?

নরহা (ত্রিপুরা); মৌহা, বলুহা গণুহা, রৌহা, (ময়মনসিংহ); টিটিহা, দেরাহা, শতহা, রাজহা (দিনাজপুর); মশাহা (মালদহ); মালিহা, কলুহা, রণহা, দেলুহা (বীরভূম); পুরহা, বারুহা, বিরুহা (বর্ধমান); ।

(৮৬) 'হি, হির, হিরা'<ঘির ?

টিটিহি<টিট্টিভিকা (দিনাজপুর); সিরহি<সিঁড়ি? (দিনাজপুর) উপারহির', রূপারহির, জোরহিরা, মাইলিহিরা (বাঁকুড়া); ভাঙ্গাহিরা (বাঁকুড়া)।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

সমাস

বাংলা সমাস প্রকরণ মোটামুটি সংস্কৃতের অনুগামী। তবে সংস্কৃতের মত বহুপদময় সমাস বাংলায় চলে না। বৈদিক সংস্কৃতের মত দুইটি শব্দ সহযোগে বাংলার সমাস গঠিত হয়। বৈদিকের মতই বাংলায় বহুব্রীহি সমাসের বিশিষ্ট অর্থ তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপর অনেক সময় নির্ভর করে। সাধু ভাষায় দুই এর বেশি পদ দিয়া সমাস হয়।

যেমন—জনগণমন অধিনায়ক; শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী।

সংস্কৃতে সমাস সম্বন্ধে স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু বাংলায় সমাসের স্থান অনেকটা সীমিত।

সমাসবদ্ধ পদগুলির মধ্যে শেষের পদেই বিভক্তি যোগ করা হইত এবং অন্য পদগুলিকে বিভক্তিহীন করা হইত। এই সমষ্টিগত বিভক্তিযোগ (**Group-inflexion**) অপভ্রংশ স্তরে দেখা যায়।

যেমন, জামমরণ ভব কইসন হোই।

চর্যায়—বান্ধি সুআ (<বন্ধ্যায়াঃ সুতঃ)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—আগম বেঅ পুরাণে।

আধুনিক বাংলায়—যদু-মধু-শ্যামকে।

বাংলা তদ্ভব সমাসের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলেচিত হইল :—

(১) তৎপুরুষ

(ক) দ্বিতীয়া—ভয় পাওয়া ; মুখনাড়া ; বাসনমাজা ; মাথা গোঁজা ; নথ নাড়া ; কলা বেচা ; মাছধরা।

(খ) তৃতীয়া—নুন মাখা ; পাতা ছাওয়া ; ঢেঁকিছাটা ; হাতধরা ; বাদুর-চোষা ; ঝাঁটা-পেটা।

অলুক—ঘিয়ে ভাজা ; পায়ে চলা ; হাতে কাটা।

(গ) চতুর্থী—মরণ কাঠি ; জীয়ন কাঠি ; বিয়ে পাগল ; মড়াকান্না ; ধান-জমি ; ডাক-মাশুল।

(ঘ) পঞ্চমী—ঘর পালানো ; আগা গোড়া ; ঘড় ছাড়া ; আকাশ ভাঙ্গা ; বিলাত ফেরত ; থ'লে ঝাড়া।

অলুক—গ্রাম-থেকে-আনা।

(ঙ) ষষ্ঠী—শাল পাতা ; বাঁদর নাচ ; মৌচাক ; হাতটান ; বাজার দর ; বামুন পাড়া ; ঠাকুরঝী।

অলুক—মনের মানুষ ; হাতের পাঁচ।

(চ) সপ্তমী—গাছপাকা ; কোণ ঠাসা ; ঘর পাতা ; রাতকানা ; বাটাভরা ; গোলা-ভরা ধান ; গাল-ভরা কথা।

অলুক—গায়ে হলুদ ; গায়ে পড়া।

নঞ্‌ তৎপুরুষ—অজানা ; অকেজো ; অনাছিষ্টি ; না-বলা ; আলুনে ; আকাঁড়া ; আগাছা ; আঘাট ; আদেখা।

উপপদ তৎপুরুষ—সবহারা ; হাড়ভাঙ্গা ; বাস্তু হারা ; ইঁদুর মারা ; বাধাধরা ; মিছকউনে ; পাড়া-বেড়ানী ; হালুইকর।

কর্মধারয়—(ক) সাধারণ—মিঠেকড়া ; কাঁচামিঠে ; আধফোঁটা ; চালাক চতুর ; নীলশাড়ী ; সাদাসিধা ; টাটকা ভাজা।

(খ) মধ্যপদলোপী—দুধ সাগু ; বিয়ে পাগল ; ঘর-জামাই ; হাত পাখা ; রাহা খরচ ; মিশ্রিপানা।

(গ) উপমান—আগুন রাঙা ; মিশ্‌কালো ; শশব্যস্ত।

(ঘ) উপমিত—চাঁদ বদন ; সোনামুখ ; ফুলবাবু।

(ঙ) রূপক—পরাণ-পাখী ; মন-মাঝি ; আঁখি-পাখী।

বহুব্রীহি—(ক) সমানাধিকরণ—লাল পাগড়ী; কালোপেড়ে ; হতভাগা ; কানা চোখা ; একঠেঙ্গে।

(খ) ব্যধিকরণ—ঘরমুখো, দেখন হাসি ; পেঁচা-মুখা ; শুচি-বেয়ে ; উট-কপালী।

(গ) ব্যতিহার—(বাংলায় ভাববাচক বিশেষ্য)—চুলাচুলি ; হাতাহাতি ; নখানখি ; জানাজানি ; গলাগলি ; মারামারি।

(ঘ) অলুক—জুতা-পায়ে ; কোঁচা হাতে ; মুখে-ভাতে।

দ্বন্দ্ব—হাত পা, মাবাপ, ভাতকাপড়, শাকপাতা, হাসিকান্না, বিকিকিনি, দেখা শোনা, মুড়িমুড়কি।

সমার্থক দ্বন্দ্ব—কাজকর্ম, চালচলন, কাগজপত্র, রাজা বাদশা, লজ্জা সরম।

অলুক দ্বন্দ্ব—দুধে-ভাতে, বুকে-পিঠে, হাতে-কলমে, জলে-কাদায়, গোঠে-মাঠে।

অব্যয়ীভাব—জনপিছু, হররোজ, হা ভাত, গরমিল, আমরণ, দিনভর, আগাগোড়া, মাঠ-কে-মাঠ, ভরপেট।

দ্বিগু—দু-পন, তে-মোহনা, তে-মাথা, পাঁচভূত।

বাক্যমূলক—**(Syntactical)**

(ক) প্রথম পদ অনুজ্ঞা, দ্বিতীয় পদ সম্বোধন—থাকহরি, রাখহরি, ভজহরি।

(খ) প্রথম পদ নিষেধসূচক অব্যয়, দ্বিতীয় পদ সম্বোধন—আন্নাকালী।

(গ) উভয় পদই সম্বোধন—রাধেশ্যাম, হরে রাম।

(ঘ) বিবিধ—নাস্তানাবুদ, যাচ্ছে তাই।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সংস্কৃতে ও বাংলায় অন্‌-আর্য উপাদান

ইন্দো-ইরানীয় জাতির যে শাখা ইরান হইতে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইল সেই জাতিই ভারতীয়-আর্য **(Indo-Aryan)** বলিয়া কথিত। ইন্দো-ইরানীয় জাতি নিজেদের "অর্য্য" **(Airya)** বা "আর্য" বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন। সেই জন্য এই জাতির নাম হইল আর্য। "আর্য্য" শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীর বহুবচন যুক্ত হইয়া ইরান নামের উৎপত্তি হয়। প্রাচীন ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যগণ যে একই শাখা-ভুক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ মিলে তাঁহাদের ভাষা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে। আবেস্তার সঙ্গে সংস্কৃতের এইরূপ গভীর মিল রহিয়াছে যে সামান্য একটু ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমেই এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিচার করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে।

সংস্কৃত	আবেস্তীয়	সংস্কৃত	আবেস্তীয়
সূর্য—	হ্বরিয়স্	হোতর—	জওতর
		মিত্র—	মিথ্র
অগ্নি	অগ্নাস	যম্—	যিম
বরুণ—	বরুণাস্	সেনা—	হএনা
দেব—	দএব	আহুতি—	আজুতি
যজ্ঞ—	যস্ন্	শতম্—	সতম্
সোম—	হওম	অস্তি—	অস্তি ইত্যাদি।

অনুরূপ ভাবে প্রাচীন পারসীকের সঙ্গে সংস্কৃতের গভীর সংযোগ রহিয়াছে। যেমন—

সংস্কৃত	পারসীক	তসংস্ক	পারসীক
বসুমনা	বহ্মন্	জরদুষ্ট্র	জুরদুস্ত্
ঋতক্ষত্র	অর্দশীর	রোধস্তম	রুস্তম্
অশ্ব—	অস্প্	গৌ	গাব্
স্ব-ধা	খুদা	মিত্র	মিহ্র
ঘর্ম	গর্‌ম্	চক্র	চর্‌খ্

উপনয়ন প্রথা কিংবা অগ্নি সাক্ষ্য রাখিয়া বিবাহের রীতি উভয় জাতির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল।

ভারতে আর্যদের আগমন কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে বা উপদলে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রত্যেক দলের গোত্রপতি পৃথক থাকায় গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র পৃথক। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে ভারতীয়-আর্য শাখার প্রথম দল সর্ব প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন।

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতে প্রাগ্‌-আর্য **(Pre-Aryan)** জাতিগুলির মধ্যে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষগণ বাস করিত। সময়ের দিক হইতে সাধারণত মনে করা হয় যে অষ্ট্রিক শাখার অন্তর্গত অষ্ট্রো-এশিয়াটিক **(Austro-Asiatic)** জাতিই ভারতের আদিম অধিবাসী। উত্তর ও পূর্ব-ভারতে এক সময়ে ইহাদের প্রধান্য ছিল। এই জাতির কোন উন্নত ধরণের সভ্যতা ও রাজনৈতিক চেতনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষগণ ভারতে আসে এবং অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতিকে উত্তর ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করে। দ্রাবিড়দের পরে আর্যরা ভারতে আসেন।

আর্যরা ছিলেন যাযাবর। পশুপালন ও কৃষিই ছিল তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। সিন্ধু উপত্যকায় মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে উচ্চস্তরের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা সুপ্রাচীন কালের বলিয়া বিশেজ্ঞদের ধারণা। যদি এই সভ্যতা প্রাগ্‌-আর্য বা দ্রাবিড় সভ্যতা হইয়া থাকে তবে এই কথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে আর্য সভ্যতা অপেক্ষা প্রাগ্‌-আর্য সভ্যতা উন্নত ধরণের ছিল। বেলুচিস্থানে ব্রাহুই অঞ্চলে প্রচলিত "ব্রাহুই" **(Brahui)** ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়ীয় ভাষার সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং ইহা খুবই সম্ভব যে দ্রাবিড়গণ আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাস করিত এবং সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল।

অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতি ছাড়া আর কোন অন্‌-আর্য জাতি আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতে বাস করিত কিনা জানা যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে রাক্ষস, দানব, দৈত্য, অসুর, কিন্নর, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতি অনেকগুলি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব জাতি অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় শাখা ভুক্ত ছিল, না অন্য কোন গোষ্ঠী ভুক্ত ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এমনও হইতে পারে কালক্রমে ইহারা অন্য জাতির সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়া গিয়াছিল।

আর্যদের প্রধান সম্পদ ছিল তাহাদের দেবস্তুতিমূলক শক্তিশালী বৈদিক ভাষা। "বেদ" শব্দ বিদ্ ধাতু হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ হইল জ্ঞান। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে ঋক্ বেদের অধিকাংশ সূক্তগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। আর্যেরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। প্রাকৃতিক শক্তির (সূর্য, দ্যৌঃ, মরুৎ, বরুন প্রভৃতি) স্তুতি গানই বেদের বিষয় বস্তু। ধর্মের ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে আর্য জাতির মিল রহিয়াছে। গ্রীক সাহিত্যে এ্যাপোলো (Apollo) সূর্য দেবতা, জিউস (Zeus) আকাশ দেবতা। আর্য ঋষিগণ বংশ পরম্পরায় বেদ সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ রাখিয়া এক অদ্ভূত মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্যগণ ব্যতীত ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) গোষ্ঠীর অন্য কোন জাতিই এইরূপ মানসিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন নাই। সেই জন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। বৈদিক ভাষাই হইল ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সর্ব প্রাচীন নিদর্শন। ঋক্-বেদের ১০০৮ সূক্তের মধ্যে কিছু সংখ্যক স্তোত্র ভারতের বাহিরে লেখা হওয়া সম্ভব। হিট্টী (Hittite) ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মেসোপটেমিয়ায় অবস্থিত বোঘ্হাজকোই নামক স্থানে খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর এক প্রত্নলিপিতে ইন্দ্র, বরুন, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়।

হিট্টাইট ও মিটান্নি রাজবংশের মধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহের চুক্তিপত্রে পঞ্চ আর্য দেবতার নাম উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—ইন্দর=ইন্দ্র ; মি-ইৎ-র=মিত্র ; উরুবন=বরুণ। সেইজন্য তুর্কীস্থানকেই অনেকে আর্যদের আদি নিবাস বলিয়া মনে করেন।

আর্যগণ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক জাতি পর্যুদস্ত হয় এবং অনেকেই ক্রমে ক্রমে আর্যভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। অষ্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠীর কোন কোন শাখা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রটো-অষ্ট্রিক জাতির বংশধর হইতেছে সাঁওতালী, ওরাঁও, হো, শবর, কুরখ্ গর্দব প্রভৃতি জাতি। দ্রাবিড় গোষ্ঠীরও বহুসংখ্যক অধিবাসী আর্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তাহারা আর্য সভ্যতা ও ধর্ম গ্রহণ করিলেও আর্যভাষা গ্রহণ করেন নাই। তবে কালক্রমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বাহক ভাষা বলিয়া সংস্কৃত হইতে উচ্চকোটির শব্দসমূহ দ্রাবিড়ীয় ভাষাসমূহে প্রবেশ করে। প্রটো-দ্রাবিড় জাতির বংশধরগণ বর্তমানে তামিল, তেলুগু, কানাড়ীয়, মালয়ালাম্ প্রভৃতি ভাষা-ভাষী।

আর্যদের আগমনের বহু পরে ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chlnese) ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বর্মী (Tibeto-Burman) শাখার গারো, টিপুর, হাজঙ্গ মেইতেই, লুসাই, বোড়ো

(Bodo) প্রভৃতি জাতি ভারতের পূর্ব সীমান্তে (আসাম, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ) আসিয়া বসতি স্থাপন করে। ভোট-বর্মী শাখার ভারতে আগমনের পূর্বে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক শাখাভুক্ত খাসিয়া, মোন্-খেম্‌র (Mon-Khmer) প্রভৃতি জাতি বাস করিত। খাসিয়া ভাষা এখনও আসামে রক্ষিত আছে। সুতরাং ভোট-বর্মী শাখার আধিবাসিগণই হইল উত্তর-আর্য (Post-Aryan) জাতি। অনেকে মনে করেন, কিরাত, কিন্নর প্রভৃতি জাতি এই শাখাভুক্ত।

আর্য ও প্রাগার্য জাতিসমূহের মিশ্রণের ফলে ভারতে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। প্রাগ্-আর্য জাতি একদিকে যেমন আর্যভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করিল, অপর পক্ষে বিজেতা আর্যগণও সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাগার্য জাতি সমূহের সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, এবং তাহাদের ভাষাগুলি হইতে বহু শব্দ উচ্চারণ পদ্ধতি ও বাক্যগঠন রীতি গ্রহণ করিলেন।

বিভিন্ন জাতির ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যেমন একটি ভাষা শক্তিশালী হয়, তেমনি বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণের ফলে প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং বুদ্ধিবৃত্তিও প্রদীপ্ত হয়। আর্য ও প্রাগার্য জাতির সংমিশ্রণের ফলেই হিন্দু সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল। আর্যদের মধ্যে মাতৃ-পূজা, শিব পূজা ও মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃকাপূজা ও লিঙ্গপূজার বিধি ছিল বলিয়া মনে হয়। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয়ও সেমিটিক সভ্যতার কিছু কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন দ্রাবিড়গণ মাতৃপূজার ধারণা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান সুমেরীয় কিংবা সেমিটিক জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, আর্যগণ কালক্রমে অন্-আর্যদিগের দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি, ধর্মীয় আচার ব্যবহার অল্পবিস্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্-আর্য দেবদেবীকে নূতনভাবে রূপদান করিয়া আর্যায়িত করিয়াছিলেন।

আর্য ও প্রাগ্-আর্য সভ্যতার মিশ্রণের ফলে কোন পক্ষের কতটুকু দান ছিল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অথর্ববেদে উপদেবতা; অপদেবতার পূজার মন্ত্রাদি, মারণ ও বশীকরণের মন্ত্র রহিয়াছে। কোল জাতির মধ্যে অদ্যাবধি ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা প্রচলিত আছে। সুতরাং অথর্ববেদে এই সমস্ত মন্ত্রাদির পশ্চাতে প্রাগার্য প্রভাব আছে বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না। পূজা পার্বণে নৃত্য-গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা বিদ্যার প্রচলন, গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার, নারিকেল, সিন্দুর, পান ইত্যাদি ব্যবহারের রীতি প্রাগ্-আর্য জাতির নিকট আর্যেরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধক্রিয়া; মৃতদেহ দাহ করিয়া অস্থি নদীতে বিসর্জন এবং গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান ইত্যাদি প্রথার মূলে প্রাগার্য অবদান থাকিতে পারে। তর্পণের মন্ত্রে যক্ষ, নাগ, অসুর প্রভৃতি দানবের নাম

রহিয়াছে। দোল উৎসবের সময় যে মন্ত্র পাঠ করিয়া নারায়ণ এবং রাধাগোবিন্দকে আবীর দেওয়া হয়, সেই মন্ত্রের মধ্যে যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগের উল্লেখ আছে। যাহা হউক, উত্তর-ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার গঠনের মূলে আর্য, দ্রাবিড়, কোল, মোঙ্গল এবং অন্য কোন অবলুপ্ত জাতির সম্মিলিত প্রয়াস রহিয়াছে।

এখন আর্যভাষার উপর অন্-আর্য প্রভাব কতটুকু পড়িয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখা হউক। ভারতীয় আর্য ভাষাকে তিনটি সুস্পষ্ট স্তরে ভাগ করা হইয়া থাকে। (১) আদ্য ভারতীয়-আর্য (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ) (২) মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দ); (৩) নব্য ভারতীয়-আর্য (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে)। আদ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার নমুনা আমরা বৈদিক-সংস্কৃত, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও সংস্কৃতে পাই।

নানা কারণে ভাষার পরিবর্তন ঘটে। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, নূতন পরিবেশ ও জাতির সংমিশ্রণের ফলে ভাষার পরিবর্তন হয়। তবে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলে ভাষার পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। প্রাগার্যেরা যখন আর্যদের ভাষা গ্রহণ করিল তখন হইতেই বৈদিক ভাষার পরিবর্তন হইতে থাকে।

যদিও বৈদিক সংস্কৃতের মূল শব্দগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত, তথাপি ঋক্‌বেদের মধ্যে আমরা এমন কতকগুলি শব্দ পাই যাহাদের মূল আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন, কুণ্ড দণ্ড, পিণ্ড, বিল, ময়ূর, অণু, অরণি, কুট, কাল, রাত্রি, রূপ প্রভৃতি।

অথর্ববেদে পাই বিল্ব, শূর্প, তূণ প্রভৃতি শব্দ।

ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়—পণ্ডিত, অলস, শব, অর্ক, অটবী, খড়্গ, তণ্ডুল, মর্কট, বল্লী প্রভৃতি শব্দ।

বৈদিক যুগের পর হইতে পাণিনি-পতঞ্জলি এবং রামায়ণ-মহাভারতের যুগে সংস্কৃত ভাষায় বহু প্রাগ্-আর্য শব্দ প্রবেশ করিতে থাকে। প্রাগ্-আর্য শব্দগুলির বেশীর ভাগই দ্রাবিড় ভাষাগুলি হইতে আসে। এক সময়ে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী যে উত্তরাপথে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ কুরুল ও মাল্‌তো (মালদহ জিলায়) উপভাষাগুলি পাই। টি, বারো তাঁহার সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে সংস্কৃতে ব্যবহৃত অনেকগুলি শব্দ অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [The Sanskrit Language PP 378—386].

কিন্তু এই শব্দগুলির সবকয়টাই দ্রাবিড় ও কোল শাখার ভাষাগুলি হইতে গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না! নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোল ভাষার অন্তর্গত, যথা—অলাবু, নীর, কদলী, তাম্বুল, কার্পাস, লাঙ্গল, লিঙ্গ, মরিচ, ফল, সর্ষপ প্রভৃতি।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হইতেই বেশী পরিমাণে শব্দ সংস্কৃত ভাষায় আসিয়াছে। যথা—অনল; অলস, অগুরু, কানন, কটু, কাক, কুট, কুটিল, কুটি, চতুর, চন্দন, পল্লী, বিল্ব, মুকুট হেরম্ব প্রভৃতি।

আবার খিট্ট, খট্ট, গুণ্ড প্রভৃতি ধাতুর মধ্যেও অন্‌-আর্য উপাদান লুক্কায়িত আছে। প্রাণীবাচক শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে একটি সংস্কৃত এবং অন্যটি প্রাগ্‌-আর্য ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যেমন—

সংস্কৃত	প্রাগ-আর্য
ঋক্ষ	ভল্লুক
অশ্ব	ঘোটক
শ্বন্—	কুক্কুর
মার্জার—	বিড়াল
শার্দ্দুল	ব্যাঘ্র

হস্তী (হাত বিশিষ্ট প্রাণী), মাতঙ্গ [তুলনীয়—মোন্‌-খ্‌মের শব্দ "মোতেঙ্গ"—হাত বিশিষ্ট যে প্রাণী]। সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারে এইগুলি হইল প্রাগ্‌-আর্য ভাষার শব্দ।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে সংস্কৃত মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষা হইতে আসিয়াছে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ধন্য বর্ণগুলি ছিল না। এমন কি সংস্কৃতের ভগিনী-স্থানীয়া গাথা আবেস্তায়ও মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি পাওয়া যায় না। ভারতে আর্যদের আগমনের পর মৌলিকভাবেই তাহাদের ভাষার মধ্যে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির উদ্ভব হইয়াছিল এই ছিল গোড়াতে কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিকের ধারণা। যেমন, ঋ, র, স প্রভৃতি বর্ণগুলি পূর্বে থাকিলে সংস্কৃত শব্দে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য বর্ণে পরিণত হয়। যথা—পঠতি<বৈদিক পৃথতি, প্রথয়তি ; মুণ্ড<বৈদিক মৃদ ; কট<কৃত ; নট<নৃত্‌ ; পটুঃ (গ্রীক **Platus**)। কিন্তু অনেকগুলি শব্দে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণ হয় নাই। যথা—কর্তামি<(লিথুয়ানীয়—**Kertu**) ; মর্দামি<(লিথুয়ানীয়—**mardeo**)।

আসলে সংস্কৃত ঋ, র, ষ, প্রভৃতি বর্ণের পরে দন্ত্যবর্ণ যে মূর্ধন্যবর্ণে রূপান্তরিত হয় তাহা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবের ফল। প্রাকৃতেও অনুরূপ অবস্থায় দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য বর্ণ হয়। যথা : বিকট<বিকৃত ; অট্‌ঠ<অর্থ ; বুড্‌ঢ<বৃদ্ধ ; বড্ডিঅ<বর্দ্ধিত প্রভৃতি।

সংস্কৃতে 'ন' এর স্থানে 'ণ' হওয়ার রীতির মূলেও প্রাকৃত প্রভাব (**Prakritism in Sanskrit**) রহিয়াছে। যথা—পূর্ণ, বর্ণ, নিপুণ, কুণার, স্থাণু প্রভৃতি। তাহা হইলে মূর্ধন্য ধ্বমিগুলি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে সংস্কৃতে এই ধ্বনিগুলির স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই ; দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষা হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

ল্যবর্থ অসমাপিকার (Gerund or Conjunctive Participle) প্রয়োগ এক-মাত্র সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় পাওয়া যায় না। দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলিতে ল্যবর্থ অসমাপিকার প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে। সুতরাং এইরূপ অসমাপিকার প্রয়োগের মূলে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব আছে বলিয়া মনে করিলে অযৌক্তিক হইবে না।

সংস্কৃতে কৃ ধাতুর সহযোগে যৌগিক ক্রিয়ার (Compound verb) প্রচলন আছে। যথা—গমনং করোতি=গচ্ছতি; শয়নং করোতি=স্বপিতি। অনুরূপভাবে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও দৃষ্ট হয়। সুতরাং এইক্ষেত্রেও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

তারপরে স্বরাঘাত (Accent) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বৈদিক সংস্কৃত সুর বা স্বরাঘাত (Pitch accent) প্রধান ভাষা ছিল। স্বরের উত্থান পতনের উপর শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটিত। যেমন—র´াজপুত্র; এখানে প্রথম স্বরধ্বনি উদাত্ত হওয়ায় বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। আবার রাজপুত্র´ শব্দে অন্ত্য স্বরধ্বনি উদাত্ত হওয়ায় ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। কিন্তু অন্ত্য বৈদিক যুগ হইতেই স্বরাঘাতের স্থানে শ্বাসাঘাত বা বল (Stress-accent) দেখা দিল। শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরের লুপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে কিছু কিছু পাওয়া যায়— যেমন—সুবর্ণ>স্বর্ণ; অ´নু-বর্তিষ্যে>অন্-বর্তিষ্যে ইত্যাদি।

স্বরাঘাতের স্থানে কেমন করিয়া শ্বাসাঘাত আসিল তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। হোমারিক গ্রীকও স্বরাঘাত-প্রধান ভাষা ছিল। পরবর্তীকালে গ্রীক ভাষায়ও শ্বাসাঘাত আসে। অন্ত্য বৈদিক যুগে যে শ্বাসাঘাত দেখা দিল তাহা খুব সম্ভব দ্রাবিড় প্রভাবেই হইয়াছিল। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও প্রবল শ্বাসাঘাত লক্ষণীয়। মোটামুটি এইগুলি হইল সংস্কৃতের উপর প্রাগ্-আর্য ভাষাগুলির প্রভাব।

ভারতীয়-আর্য ভাষা যখন মধ্যযুগীয় স্তরে আসিয়া পৌছিল, তখন সেই যুগের ভাষার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলতা পরিত্যাগ করিয়া অনেক সহজ সরল রূপ প্রাপ্ত হইল। বহু অন্-আর্য শব্দ (প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা যে গুলিকে 'দেশী' আখ্যা দিয়াছেন) প্রাকৃত ভাষাগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্যগঠন রীতিতে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। পশ্চিম অঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব অঞ্চলের ভাষাগুলিতেই এই পরিবর্তন বেশী করিয়া হইয়াছিল। কেননা, আর্যগণ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী দৃষদ্বতী-বিধৌত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঐ অঞ্চলের নাম হয় আর্যাবর্ত। বাংলা ও মগধ বহুদিন অন্-আর্য অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধকে পক্ষী অর্থাৎ পক্ষীর ন্যায় দুর্বোধ্য ভাষাভাষী অঞ্চল

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলে আগত আর্যগণকে 'ব্রাত্য' অর্থাৎ পতিত বলিয়া অভিহিত করা হইত। সুতরাং জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় খুব কম সংখ্যক আর্যই পূর্ব দেশে গিয়াছিলেন।

প্রাকৃত যুগেই তালব্য বর্ণগুলি ঘৃষ্টবর্ণে (Affricate) পরিণত হয়; অর্থাৎ চ-কারের উচ্চারণের সময় যুগপৎ চ+শ এই দুই যুক্ত ধ্বনির উচ্চারণ হইত। চ-কারের এইরূপ উচ্চারণ দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে দেখা যায়। এই যুগেই মহাপ্রাণ বর্ণগুলি "হ"তে রূপান্তরিত হয়। যথা—মুখ>মুহ ; রুধির>রুহির ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তন সংস্কৃতেও দেখা গিয়াছিল। যেমন—বৈদিক গৃভনাতি>সংস্কৃত গৃহ্ণাতি। মহাপ্রাণ বর্ণগুলির এইরূপ পরিবর্তন উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলিতে দৃষ্ট হয়। যথা: এখন> এহন ; পানি>ফানি>হানি ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তনের মূলে নিঃসন্দেহে অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় প্রভাব আছে। যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়নের রীতি এই যুগেই দেখা যায়। যথা—রত্ন>রতন ; হর্ষ>হরিষ ; স্নেহ>সিনেহ ; অর্হ>অরিহ প্রভৃতি। অনুরূপ ভাবে দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে স্বরধ্বনির আগম হয়। যেমন ব্রাহ্মণ>বরামণ ; শ্রী>তিরু। এই যুগের ভাষাগুলিতে শ্বাসাঘাত পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পালিতে পাওয়া যায়: ধীতা<দুহিতা ; দক<উদক ; দানীম্<ইদানীম্। প্রাকৃতে পাই—লাউ<অলাবু ; কত্ত<কলত্র ইত্যাদি।

পূর্ব-মাগধীয় ভাষাগুলির অন্যতম হইল বাংলা। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে মাগধী প্রাকৃত তথা মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। বাংলা দেশে আর্য ভাষা ও ধর্ম অনেক পরে বিস্তৃত হয়। খুব মুষ্টিমেয় আর্য বাংলায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া যান। সুতরাং এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পূর্ব অঞ্চলের প্রায় সমগ্র অধিবাসীই পূর্বে অন্-আর্য ছিল। মাগধী প্রাকৃতে যে অন্-আর্য উপাদান পাওয়া যায়, শৌরসেনী প্রাকৃতে তাহা দৃষ্ট হয় না। মধ্যদেশই হইল লৌকিক সংস্কৃতের পীঠভূমি। সেইখানেই শৌরসেনী প্রাকৃতের উদ্ভব হয়। সেই জন্য শৌরসেনী প্রাকৃত অনেকটা সংস্কৃতঘেঁষা। সংস্কৃত নাটকেও দেখা যায় যে অতি নিম্নস্তরের অধিবাসীরা মাগধী প্রাকৃতে কথাবার্তা বলে।

বাংলায় আর্য ভাষা ও সভ্যতা বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে কি ধরণের ভাষা প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন আমাদের হাতে নাই। তবে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, উচ্চারণ রীতি ও গ্রামের নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে দ্রাবিড়, কোল, মোন্-খেমর প্রভৃতি জাতির অধিবাসীরা রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিত। পরবর্তী কালে ভোট-বর্মী শাখার লোকেরা কামরূপ এবং বাংলার পূর্ব ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে

আসিয়া বাস করিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় প্রাপ্ত অনুশাসন-গুলিতে এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যে গুলির মূল আর্য ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যথা—পিণ্ডারবীটিজোটিকা, বাল্লহিট্টা, মোডালন্দী, আউহাগড্ডী প্রভৃতি। গ্রামের নামের শেষে প্রাপ্ত জোল, জোলী, শোল, শুলি, ঝরা, ঝরি, ঝোর (নদী, জল, খাল অর্থে), গুড়া, গুড়ি (নদীর তীর অর্থে), ভিটা, ভিটি (বাড়ী অর্থে), পোল, ভোল (মাঠ-অর্থে) প্রভৃতি শব্দগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হইতে আসিয়াছে। আবার আম্রেড়িত বা দ্বিত্ব (Reduplicated), ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ-বোধক (Onomatopoetic and echo words) গ্রামের নামগুলি পরীক্ষা করিলে অষ্ট্রিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রাবিড় উপাদান লক্ষ্য করা যাইবে। যথা—দমদম, বজবজ, কোল-কোল, লটপটিয়া, ঘোড়দৌড়, ভুখেভুখে, হুআকুআ, হিলিমিলি প্রভৃতি।

গ্রামের নামের শেষে প্রাপ্ত দহ, দা, কোল, (নদী, জল অর্থে), বাড় (বাহির অর্থে), বির, বৃ (বন অর্থে) প্রভৃতি শব্দগুলি অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত। গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত চঙ্গ (বসতি অর্থে), চু, চো, প্রভৃতি শব্দগুলি ভোট-বর্মী ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে বাংলা দেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক ও ভোট-বর্মী জাতির অধিবাসীগণ বাস করিত। বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত প্রাগ্-আর্য ও উত্তর-আর্য উপাদান লক্ষ্য করা যায়।

(ক) বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ অর্ধ-বিবৃত (Half-open) ; কিন্তু সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দীর 'অ' সংবৃত (closed)।

সংস্কৃতের আ-কার অ-কারের দীর্ঘরূপ। কিন্তু বাংলার 'আ' অ-কারের দীর্ঘরূপ নহে। আমরা পড়ি, স্বরে-অ, স্বরে-আ। বাংলায় অ-কারের এইরূপ উচ্চারণ ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায়ও দেখা যায়। অ-কারের এইরূপ বিবৃত উচ্চারণের মূলে খুব সম্ভবত অষ্ট্রিক বা ভোট-বর্মী প্রভাব আছে।

(২) পূর্ববঙ্গে এ-কারের উচ্চারণ (এ') অর্ধ-বিকৃত। উহা নিঃসন্দেহে ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাবের ফল।

(৩) সংস্কৃতের তালব্য বর্ণগুলির উচ্চারণের ধারা প্রাকৃত যুগ হইতেই পরিবর্তিত হইতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের চলিত ভাষায় "চ" এর উচ্চারণ চ+শ এই দুই বর্ণের মিলিত উচ্চারণ (Palatal affricate)। "চ" এর এইরূপ উচ্চারণ দ্রাবিড় ভাষার

[* মৎলিখিত "বাঙ্গলার গ্রামের নামে অনার্য ও দেশী উপাদান" প্রবন্ধ—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৬৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

বৈশিষ্ট্য ; আবার পূর্ববঙ্গে 'চ' এর উচ্চারণ ত+শ এই দুই ধ্বনির মিলিত উচ্চারণ (Dental afiricate)। 'চ' এর এইরূপ উচ্চারণ ভোট-বর্মী ভাষায় লক্ষ্য করা যায়।

(৪) মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(৫) পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে (Glottal stops) উচ্চারিত হয়। মারাঠী ও গুজরাটী ভাষাগুলিতেও কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণের সন্ধান মিলে। আবার সিন্ধী ভাষায় অঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলি কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। মহাপ্রাণ বর্ণগুলির এইরূপ উচ্চারণ রীতি ভারতের অন্য কোন অঞ্চলের আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। "জার্মান" ও "আরবী" ভাষায় কণ্ঠনালীয় স্পর্শ বর্ণ আছে। আদি আর্যভাষার কোন স্তরে এইরূপ উচ্চারণ রীতি ছিল কিনা তাহা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। হোর্নল সাহেবের মত হইল এই যে—আর্য জাতির দুইটি প্রধান দল ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রথম দলে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা মধ্যদেশে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় দল আসিয়া পূর্ববর্তীদলকে তাহাদের স্বদেশ-ভূমি হইতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বিতাড়িত করেন এবং তাঁহারা সেই অঞ্চলে স্থিতি করেন। ইহারাই অন্তরঙ্গ আর্য (Inner Aryan) বলিয়া কথিত। প্রথম দলের আর্যেরা সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলসমূলে ছড়াইয়া পড়েন। পরে তাঁহারা মগধ, বাংলা প্রভৃতি দেশে গমন করেন। ইহাদের বহিরঙ্গ আর্য Outer Aryan) বলা যায়।

অন্তরঙ্গ আর্যেরাই ছিলেন বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অপর পক্ষে বহিরঙ্গ আর্যেরা অবৈদিক ছিলেন। গ্রিয়ার্সন (Grierson) সাহেব হোর্নলকে অনুসরণ করিয়া ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তিতে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুই ভাগে ভাগ করেন। বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, সিন্ধী, কাশ্মীরী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাগুলি হইল বহিরঙ্গ আর্য শাখাভুক্ত এবং পশ্চিমা হিন্দী ও পাঞ্জাবী হইল অন্তরঙ্গ আর্য শাখাভুক্ত। আর্যভাষাগুলির এই দুই প্রকার বিভাগ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করেন নাই। কারণ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বহিরঙ্গ আর্য ভাষাগুলির মধ্যে বিশেষ মিল নাই। আবার ঐ ভাষাগুচ্ছের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হিন্দীতেও পাওয়া যায়। তবে কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণের ব্যাপারে বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাতে বৈদিক যুগে কোন বিশেষ অঞ্চলের আর্যদের কথ্য ভাষার মধ্যে সম্ভবত এই বর্ণগুলির অস্তিত্ব ছিল। আবার অষ্ট্রিক ও ভোট-বর্মী ভাষার মধ্যেও কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণগুলি থাকা সম্ভব ; যেমন, কোল ভাষায় পাওয়া যায় দা'ক (জল অর্থে)।

সুতরাং পূর্ব বাংলায় মহাপ্রাণ বর্ণগুলির কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারণের মূলে অন্‌-আর্য প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

(৬) বাংলায় কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যেখানে নাসিক্য ধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতীত স্বরধ্বনিগুলি আপনা-আপনিই আনুনাসিক হয়। যেমন কাঁকড়া<কর্কট ; নিঁদ<নিদ্রা প্রভৃতি। প্রাকৃত ভাষায়ও যুক্তব্যঞ্জনসমূহে নাসিক্যধ্বনির আগমের দিকে ঝোঁক ছিল। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির মধ্যেও নাসিক্যধ্বনি দেখা যায়। যেমন চেঁচান, টেঁক-টেঁক। এইরূপ স্বতোনাসিক্যী-ভবনের পশ্চাতে অন্‌-আর্য প্রভাব আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

(৭) অনেক সময় ঋ, র, ষ প্রভৃতি বর্ণের সাহচর্য ব্যতীত দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে রূপান্তরিত হয়। যেমন ফড়িং<পতঙ্গ ; ডাহিন<দক্ষিণ। এইরূপ স্বতোমূর্ধন্যীভবনের মূলে রহিয়াছে দ্রাবিড় কিংবা অষ্ট্রিক প্রভাব।

(৮) বাংলার উপভাষাগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষা (নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) একটু স্বতন্ত্র। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মত চট্টগ্রামের উপভাষায় শব্দ মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি প্রায়ই লুপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য উপভাষায় যেখানে নাসিক্য ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় না, এই অঞ্চলের উপভাষায় নাসিক্যধ্বনির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার স্বতোনাসিক্যীভবন ও উষ্মধ্বনিরও আধিক্য দেখা যায়। যেমন আকাশ>আঁশ, কুকুর>কুঁর ; পূজা>ফুজা; পত>ফত ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্বনিগত বিশেষত্বের মূলে নিঃসন্দেহে ভোট-বর্মী প্রভাব রহিয়াছে।

(৯) পূর্ববঙ্গে ও অসমীয়া ভাষায় শ, ষ, স, অনেক স্থলেই "হ" হয়। প্রাকৃতেও কোন কোন সময় স>হ হয়। যেমন—দিবস>দিঅহ ; কি কারণে বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় এই শিস্‌ ধ্বনিগুলি হ-কারে পরিণত হয় তাহা নির্ধারণ করা একটা ধ্বনিতত্ত্বগত সমস্যা। তবে ইহার পশ্চাতে ভোটবর্মী বা অষ্ট্রিক প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব।

(১০) পূর্ববঙ্গের উপভাষায় হ-কার কণ্ঠনালীয় স্পর্শবর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা ঃ হয়>'অয়। এইরূপ উচ্চারণের মূলেও অন্‌-আর্য প্রভাব রহিয়াছে।

(১১) বাংলায় প্রতিধ্বনি বা অনুকার শব্দ **(Echo words)** ব্যবহারের রীতি আছে। যেমন, ঘোড়া-টোড়া, জলটল, দুধটুদ্‌, বইটই প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও অনুরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(১২) বাংলায় ধ্বন্যাত্মক বা জোড়া শব্দ ব্যবহারের রীতির মূলে অষ্ট্রিক উপাদান আছে। গ্রামের নামগুলিতে জোড়া শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আবার কুড়ি সংখ্যা (কুড়ি শব্দটি কোল ভাষার অন্তর্গত) বা গণ্ডা দ্বারা গণনার রীতি কোল ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(১৩) পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় শব্দের আদি অক্ষরে যে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে তাহার মূলে দ্রাবিড় প্রভাব আছে। অবশ্য ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্গত বোড়ো ভাষায়ও প্রবল শ্বাসাঘাত লক্ষণীয়। পূর্ববঙ্গের ভাষায় দ্রাবিড় উপাদান কম বলিয়া সেখানকার ভাষায় শ্বাসাঘাত এত প্রবল নহে। আবার কখনও কখনও অনাদ্য শ্বাসাঘাতও দেখা যায়। যেমন পূর্ববঙ্গে-মাথ'া, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ম'াতা (=মাথা)। উত্তর-পূর্ববঙ্গের ভাষায় সময় সময় বাক্যে ধ্বনিতরঙ্গ ও (Intonation) লক্ষ্য করা যায়।

(১৪) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে প্রত্যেক বাক্য বা চরণকে কয়েকটি শ্বাসাঘাত বা অর্থ-দ্যোতক পর্বে (Sense-group বা Breath-group) ভাগ করা হয় এবং এক একটি পর্বে এক বা ততোধিক শব্দ থাকে। প্রত্যেক পর্বের প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে যে শ্বাসাঘাত পড়ে তাহার মুলেও রহিয়াছে দ্রাবিড় প্রভাব।

(১৫) বাংলায় বহু বচনের পদ বুঝাইবার জন্য গণ, গুলা, সব প্রভৃতি বহুবাচক বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করা হয়। দিয়া, থাকিয়া, হইতে প্রভৃতি অনুসর্গের সাহায্যে কারকের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। এই ব্যাপারে দ্রাবিড় ভাষাগুলির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(১৬) প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয় পাওয়া গেলেও আধুনিক বাংলায় এইগুলি লুপ্ত হয়। ভোট-বর্মী বা অষ্ট্রিক ভাষায় লিঙ্গভেদ নাই। সুতরাং বাংলায় লিঙ্গভেদের পার্থক্য দূরীভূত হওয়ার মুলে ভোট-বর্মী বা অষ্ট্রিক প্রভাব থাকিতে পারে।

(১৭) বিশেষণের স্তর বুঝাইবার জন্য বাংলায় সংস্কৃতের তর, তম, ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। সবার চেয়ে ভাল, এর মধ্যে ভাল, এইরূপ প্রয়োগের মূলে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব আছে।

(১৮) বাংলায় কর্তৃকারকের বিভক্তি-"এ" এর সহিত করণের বিভক্তি-"এ" এর মিশ্রণকে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া মনে করেন। ভোট-বর্মী ভাষার এইরূপ বিভক্তির মিশ্রণ ঘটে।

(১৯) করণ, অপাদান ও অধিকরণের বিভক্তির মিশ্রণ কিংবা এক কারকের অর্থে অন্য কারকের বিভক্তির প্রয়োগের মূলে দ্রাবিড় প্রভাব আছে।

(২০) বাংলা এবং অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষায় ল্যবর্থ অসমাপিকার (Conjunctive or Gerund) ব্যবহার খুব বেশি। এই ব্যাপারেও দ্রাবিড় প্রভাব অনস্বীকার্য।

(২১) বাংলা এবং অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতেও যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন আছে। দ্রাবিড় ভাষা হইতেই এই রীতি আর্যভাষায় গৃহীত হইয়াছে।

(২২) বাংলায় বাক্যে অনেক সময় ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় না। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতেও এই রীতি দেখা যায়।

মোটামুটি এইগুলি হইল বাংলা ভাষার উপর প্রাগ-আর্য ও উত্তর-আর্য উপাদান। উপরের এই আলোচনা লইতে এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অধিবাসীরা রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গে বাস করিত। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে দ্রাবিড় উপাদান কম; অষ্ট্রিক ও ভোটবর্মী ভাষার উপাদান বেশী। আবার দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ ও কামরূপের ভাষায় ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাব বেশী। অষ্ট্রিক উপাদান অল্প স্বল্প আছে। দ্রাবিড় উপাদান খুবই কম।

বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়—যেগুলিকে "দেশী" বা "দেশজ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ঝাড়, ঝোঁপ, ঝিঙ্গা, আড্ডা, খড়, গোড়, ঢাক, ঢেঙ্গা, ঢেঁকুর, ঢেড়স, ঢোল, হুড়কা, হাঙ্গর প্রভৃতি শব্দ। গ্রামের নামগুলিতে বহুদেশী শব্দের সন্ধান মিলে। যথা—ঝিকর, টিটা, টেঁক, টিকর, টিকুরী, ডুঙ্গরী, ডাঙ্গা, হোগল ইত্যাদি। ইহাদের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। কিন্তু এই শব্দগুলি কোথা হইতে আসিল? এইগুলি নিশ্চয় ভারতের আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলি হইতে আসিয়াছে। দ্রাবিড়, কোল, ভোট-বর্মী কিংবা মোন্-খেমর ভাষাগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এই জাতীয় অনেকগুলি শব্দের মূল জানা যাইবে। আবার ভারতের আর্যদের আগমনের পর কোন কোন অন্-আর্য জাতি এবং সম্ভবত তাহাদের ভাষার অবলুপ্তি ঘটিয়া থাকিবে। সেই সমস্ত অবলুপ্ত ভাষা হইতে যদি কিছু সংখ্যক শব্দ প্রাকৃত কিংবা আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে সেই শব্দের মূল নির্ণয় করা কঠিন হইবে। ভারতে ফিন্নো-উগ্রীয় বা ককেশীয় গোষ্ঠীর কোন জাতি বাস করিত কিনা এবং তাহাদের ভাষা হইতে কিছু শব্দ ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে আসিয়াছে কিনা তাহাও বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বুরু-শস্কি (**Buru-Shaski**) ভাষা পাওয়া যায়। অনেকের মতে এই ভাষা ককেশীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

ভারতের ভাষাগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমায়িত। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচিত পুস্তকগুলিই আমাদের প্রধান উপজীব্য। আমাদের দেশে সংস্কৃতের অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে পরিচিত নহেন। তাঁহারা মনে করেন বেদ মানুষের রচনা নহে। উহা নিত্য ও অপৌরুষেয়। ভারতই আর্যদের আদি বাসভূমি। তাঁহারা অন্য কোন দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই।

গ্রিয়ার্সনের রচিত "Lingustic survey of India" নামক বিরাট গ্রন্থেরও সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কোল বা ভোট-বর্মী ভাষা-গোষ্ঠীর এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোন অনুশীলন সম্ভব হয় নাই। আবার মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় খনন কার্যের ফলে যদি কোন প্রাচীন ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর্য ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে পারে। যেমন "হিট্টী" ভাষা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের মূল ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় না বলিয়া ইন্দো-হিট্টী বলিলে(Indo-Hittite) অধিকতর যুক্তি সঙ্গত হয়। কেননা হিট্টী প্রত্নলেখে এমন কয়েকটি প্রাচীন শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি সংস্কৃতে বা ইরানীয় ভাষায় পাওয়া যায় না। ভারতের প্রাগ্-আর্য ও উত্তর-আর্য ভাষাগুলির সম্বন্ধে যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গবেষণা করা হয় এবং ইহাদের তুলনামূলক ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ভাষার সঙ্গে আর্য ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের পথ সহজ ও সুগম হইবে। অধিকন্তু প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করা সম্ভব হইবে।

ভারতের লিপি সমস্যা

কোনও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য যেমন একটা সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন, তেমনি সেই দেশের জন্য একটা সাধারণ লিপি গ্রহণও একান্তভাবে প্রয়োজন। ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত লিপিগুলির গুণাগুণ আলোচনা করিয়া সর্বসাধারণের পক্ষে কোন লিপি গ্রহণযোগ্য তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

ভারতে মোটামুটি তিন রকমের লিপিমালা প্রচলিত আছে। (১) ব্রাহ্মীলিপিজাত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত অক্ষরসমূহ (২) খারোষ্ঠী-লিপিজাত আরবী-ফারসী অক্ষর। (৩) রোমানলিপি।

(১) ব্রাহ্মীলিপিই হইল ভারতের প্রাচীনতম লিপি। কখন কোথা হইতে এই লিপির উদ্ভব হয় তাহা এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। ফিনিশীয় প্রদেশে ব্যবহৃত ফিনিশীয় অক্ষরের সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির নিবিড় সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ১০০০ অব্দে এই লিপি ভারতীয় বণিকগণ কর্তৃক বাহির হইতে এই দেশে আনীত হয়। আবার প্রাগ্-আর্য যুগের মোহন-জো-দড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রালিপি দেখিয়া অনেকে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে এই লিপিগুলিই ক্রমশ ক্রমশ ব্রাহ্মীলিপিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আবার কাহারও

কাহারও ধারণা যে ভারতের মাটিতেই সুসভ্য আর্যগণ কর্তৃক এই লিপি সৃষ্ট হয়। অন্য কোন দেশ হইতে এই লিপি ভারতে আসে নাই।

যাহা হউক, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে ভারতে ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে এই লিপির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের অধিকাংশ অনুশাসনগুলিই (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০ শতাব্দী) ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ ছিল। কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন-গুলি খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা। ব্রাহ্মীলিপির অন্তর্গত অক্ষরগুলি খুব সহজ ও সরল। এই অক্ষরগুলির আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা রোমান বা গ্রীক অক্ষরের মত। প্রাচীনকালে ভূর্জপত্রে বা তালপাতায় লেখা হইত বলিয়া ব্রাহ্মীলিপির অক্ষরগুলি কুণ্ডলাকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মীলিপির সহজ সরল রূপ এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আধুনিককালের দেবনাগরী, বাংলা, ওড়িয়া, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন লিপিতে পরিণত হয়।

ব্রাহ্মীলিপির দুই বিভাগ—

(১) কুষাণ লিপি

(২) দক্ষিণ-ভারতের লিপি।

কুষাণ লিপি হইতেই গুপ্তলিপির উদ্ভব হয়।

গুপ্তলিপির তিনটি শাখা (ক) উত্তর-পশ্চিম ভারতের শারদা (খ) মধ্যদেশ ও রাজস্থান-গুজরাটের নাগর (গ) পূর্ব-ভারতের কুটিল। ইহার মাত্রা ও বর্ণ কুটিল বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে।

(ক) শারদা লিপি হইতে তিব্বতী, কাশ্মীরী, গুরুমুখী প্রভৃতি হরফের উদ্ভব হয়।
(খ) নাগর ক্রমে ক্রমে দেবনাগরী, গুজরাটী প্রভৃতি লিপিতে রূপান্তরিত হয়।
(গ) কুটিল হইতে বাংলা, ওড়িয়া, নেপালী প্রভৃতি লিপির সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ-ভারতের লিপি হইতে তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালাম্ প্রভৃতি ভাষার লিপিমালার উদ্ভব হয়। ব্রহ্ম, কম্বোজ ও শ্যামদেশের লিপিসমূহ দক্ষিণ ভারতের লিপি-গুলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেরা ভারতের বাহিরে তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সুমিত্রা যবদ্বীপ ও মধ্য এশিয়ায় ধর্মপ্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। ফলে সেইসব অঞ্চলে ভারতীয় লিপিসমূহও নীত হয়।
সুতরাং যবদ্বীপের লিপিমালাও ব্রাহ্মীলিপিরই অন্তর্গত।

(২) খরোষ্ঠী হইল সেমীয় লিপি। আরবেরা সিরীয়দের নিকট হইতে এই লিপি গ্রহণ করে। আরবেরা পারস্য জয় করিলে সেখানেও এই লিপি প্রচলিত হয়। খরোষ্ঠী লিপি হইতেই পরবর্তীকালে আরবী-ফারসী **(Perso-Arabic)** হরফের উদ্ভব হয়। ভারতে এই লিপির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় অশোকের শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মানসেহ্‌রা অনুশাসনে। বর্তমানে আরবী-ফারসী লিপির মাধ্যমে উর্দ্, কাশ্মীরী ও সিন্ধী ভাষা লিখিত হয়।

(৩) আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০—৯০০ এর দিকে ফিনিশীয় লিপি হইতে গ্রীক অক্ষরের উদ্ভব হয়। রোমানগণ গ্রীকদের নিকট হইতে প্রথমে গ্রীকলিপি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে গ্রীক লিপিই অল্প বিস্তর পরিবর্তিত হইয়া রোমান অক্ষরে পরিণত হয়। পোর্তুগীসগণ যখন ভারতে আগমন করে তখনই এই দেশে রোমান অক্ষরের প্রচলন হইতে থাকে। ১৭৪৩ খ্রীঃ পোর্তুগীস মিশনারী মানুএল-দা-আস্‌সুম্প সাঁও রচিত বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পোর্তুগীস শব্দকোষ লিসবন শহরে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামে আর একখানি বাংলা গদ্য পুস্তক বাহির হয়। উভয় গ্রন্থই রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল।

এই হইল ভারতের বিভিন্ন লিপি সমূহের প্রচলনের ইতিহাস। এখন এই লিপিগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে যথাযথভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমেই আরবী-ফারসী হরফের কথা ধরা হউক। পূর্বেই বলা হইয়াছে উর্দ্, কাশ্মীরী, সিন্ধী প্রভৃতি কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় ভাষার জন্য আরবী-ফারসী লিপি ব্যবহৃত হয়। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার $\frac{১}{১৬}$ অংশ লোক (প্রায় তিন কোটি) এই লিপির সঙ্গে পরিচিত। আরবী অক্ষরসমূহ অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক। কতকগুলি বিন্দুর সাহায্যে অনেকগুলি ধ্বনি নির্দেশিত হয়। দীর্ঘস্বর, সন্ধ্যক্ষর **(Dipthong)** এবং য ও ব এর মধ্যে কোন তারতম্য দেখান হয় না। আরবী লিপির সাহায্যে ফারসী ভাষার সমস্ত ধ্বনি দ্যোতিত হয় না। ফলে ফারসীর জন্য আরও চারিটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। আবার ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ যখন উর্দ্‌র জন্য আরবী-ফারসী হরফ গ্রহণ করেন তখন উর্দ্‌র ধ্বনিগুলিকে নির্দেশ করিবার জন্য আরও চারিটি নূতন অক্ষর সংযোজিত হয়। উর্দ্‌র বর্ণমালার মধ্যে ২৮টি হইল আরবী অক্ষর। কিন্তু এই বর্ণগুলির সাহায্যে উর্দ্ বা হিন্দুস্থানীর সমস্ত ধ্বনিগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ কয়া যায় না। তদুপরি সংযুক্ত-বর্ণেরও জটিলতা আছে। নানাপ্রকার বিন্দু ও বিভিন্ন প্রকার সংযুক্তবর্ণের সংক্ষেপিত রূপগুলি অনেক সময় পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়। আরবী-ফারসী লিপির আর একটা প্রধান অসুবিধা হইল যে ইহা ডাহিন হইতে বামে লেখা হয়। আবার সংখ্যাবাচক

চিহ্নগুলি লেখা হয় বাম হইতে ডাইনে। পৃথিবীর আর কোনও লিপির ক্ষেত্রে এইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা দেখা যায় না। তাছাড়া, ভারতের বা ইউরোপের আর কোন লিপির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য নাই। সুতরাং এইরূপ একটা অবৈজ্ঞানিক লিপিকে সমগ্র ভারতের জন্য গ্রহণ করার প্রশ্ন আদৌ উঠে না। কোন একটা বিশেষ লিপির প্রতি অন্ধ অনুরাগ বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ না করিয়া আমাদের এমন একটি লিপি গ্রহণ করিতে হইবে যাহার বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক এবং যাহা ভারতীয় ভাষাগুলির ধ্বনিসমষ্টি যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে একথা স্মর্তব্য যে তুরস্কদেশে আরবী লিপির পরিবর্তে রোমান বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে। ইরানেও রোমান লিপি গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। সুতরাং ভারতে আরবী-ফারসী হরফের প্রবর্তনের কথা যাহারা চিন্তা করেন তাহাদিগকে সংস্কার মুক্ত হইয়া দেশের ও জাতির সার্বিক কল্যাণের কথা সর্বপ্রথমে চিন্তা করিতে হইবে।

আরবী-ফারসী লিপির পরেই ভারতের অন্য দুইটি প্রধান লিপি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা কয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই দেবনাগরী লিপি সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখা হউক যে এই লিপি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কিনা।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে দেবনাগরী লিপি প্রচলিত আছে। পাঞ্জাবের গুরুমুখী লিপিও দেবনাগরীরই রূপভেদ মাত্র। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষার বেশীর ভাগ পুস্তকই দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। সেইজন্য ভারতের শিক্ষিত হিন্দুদের সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য দেবনাগরী অক্ষর শিখিতে হয়। মোটের উপর ভারতের বেশীর ভাগ লোকই দেবনাগরী লিপির সঙ্গে পরিচিত। তাছাড়া, বাংলা, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষার লিপিসমূহও দেবনাগরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং ব্রাহ্মীলিপিজাত কোন লিপি যদি সর্বভারতের জন্য গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে দেবনাগরীর কথাই সর্বপ্রথমে বিবেচ্য।

দেবনাগরী লিপির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সুবিধা :—

(ক) এই লিপির বর্ণগুলি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সজ্জিত। প্রথমেই স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণের পরে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য পর পর স্পর্শবর্ণের পাঁচটি বর্গ সাজানো আছে। স্পর্শবর্ণের বর্গগুলিতে আবার অঘোষ ও ঘোষবৎ বর্ণ, অল্প

প্রাণ ও মহাপ্রাণবর্ণ ও নাসিক্য ধ্বনিগুলি রহিয়াছে। পৃথিবীর আর কোন দেশের ভাষাতেই অক্ষরের এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিভাগ বা ক্রম দেখা যায় না।

(খ) সংস্কৃত ভাষার মূল্যবান গ্রন্থাদি এই লিপিতেই লিখিত।

(গ) ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এই লিপির মধ্যেই বিধৃত।

(ঘ) ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশী লোক এই লিপির সঙ্গে পরিচিত।

অসুবিধা :—

(ক) স্বরবর্ণমালার দুইটি পৃথক রূপ আছে। স্বরবর্ণ যখন একক ভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তাহার একরূপ। আবার ব্যঞ্জনের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তখন নানাপ্রকার দ্যোতক-চিহ্নের সাহায্যে স্বরবর্ণগুলি রূপায়িত হয়। দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলিত হইয়া সংযুক্তবর্ণ গঠন করে; ফলে মূল বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। আবার এইরূপ মিলনের ফলে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বর্ণের সৃষ্টি হয়। এই নূতন গঠিত বর্ণগুলি আয়ত্ত করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি সময়সাপেক্ষ।

(খ) স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথক অক্ষরের সৃষ্টি করে। যেমন স্বাতন্ত্র্য শব্দে তিনটি অক্ষর। ব্রহ্ম শব্দে দুইটি অক্ষর।

দেবনাগরীর নানারকম বর্ণের জন্য পাঁচশতের উপর টাইপ প্রয়োজন। আর রোমান লিপির মত দেবনাগরীর টাইপ ছোট করা সম্ভব নয়।

এইবার রোমান লিপির সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই যথা—ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও তুরস্কে রোমান লিপি প্রচলিত আছে। ইংরাজী ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের ফলে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশেও এই লিপির প্রচলন আছে। আবার চীন, জাপান, পারস্য প্রভৃতি দেশে রোমান লিপিকে গ্রহণ করিবার জন্য একটা চেষ্টা চলিতেছে। ভারতেও অনুরূপভাবে ভারতীয় ভাষাগুলির উপযোগী করিয়া রোমান লিপিকে গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

রোমান লিপির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিয়ে আলোচিত হইল :—

(ক) রোমান লিপির অন্তর্গত বর্ণগুলি অনেক সহজ। সেইজন্য অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে এই লিপি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়।

(খ) স্বল্প রেখার সাহায্যে রোমান অক্ষরগুলি প্রকাশ করা যায় বলিয়া ইহার টাইপ বা ছাঁদ ছোট করা সম্ভব।

(গ) ভারতীয় লিপিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরবর্ণ যুক্ত হয়। কিন্তু রোমান লিপির সাহায্যে প্রত্যেকটি বর্ণ পৃথক ভাবে লেখা যায়।

(ঘ) টাইপ করার ব্যাপারে রোমান অক্ষর ব্যবহৃত হইলে সুন্দর ও দ্রুত হয়।

(ঙ) রোমান লিপিতে ৪০টি বর্ণ গৃহীত হইলেই ভারতীয় ভাষাগুলির ধ্বনিগুলি প্রকাশ করা সম্ভব।

অসুবিধা—

(ক) রোমান লিপির বর্ণগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সজ্জিত নহে।

(খ) বড় ও ছোট এই দুই প্রকার ছাঁদের বর্ণমালা প্রচলিত আছে।

(গ) ভারতীয় ভাষায় সমস্ত ধ্বনিগুলি বর্তমানে প্রচলিত রোমান লিপির মাধ্যমে নির্দেশিত হইতে পারে না।

(ঘ) ভারতীয় ভাষার ধ্বনিগুলিকে যথাযথভাবে দ্যোতিত করিবার জন্য আরও কয়েকটি নূতন বর্ণ এবং ৮।১০টি সূচক চিহ্নের প্রয়োজন হইবে।

দেবনাগরী ও রোমান লিপির গুণাগুণ বর্ণিত হইল। এখন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোন লিপি গ্রহণ করিলে জনসাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতের শিক্ষার্থীদের একাধিক লিপি শিখিতে হয়। বিভিন্ন লিপি আরত্ত করিতে গিয়া সময় ও শক্তির নিদারুণ অপচয় ঘটে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী রোমান বর্ণগুলি সাজাইয়া গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং তিনি এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন যে শীঘ্রই হউক কিম্বা বিলম্বেই হউক ভারত নিজের স্বার্থের জন্য রোমান লিপি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। ভারতীয় ভাষাগুলির ধ্বনি-সমষ্টিকে যথাযথ ভাবে দ্যোতিত করিতে হইলে প্রচলিত রোমান বর্ণগুলির অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে হইবে। ফলে রোমান লিপির যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাহার সঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালার জন্য গৃহীত রোমান টাইপ অনেকটা নূতন ধরণের হইবে। সুতরাং রোমান লিপির পরিবর্তে আমরা যদি দেবনাগরী অক্ষরগুলির সংস্কার-সাধনে ব্রতী হই, তাহা হইলে এই লিপি সর্ব-সাধারণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্য আছে। আমাদের দেশীয় লিপি দেব-নাগরীর দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য রহিয়াছে। দেবনাগরীর বর্ণমালাগুলি এলোমেলো নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই বর্ণগুলি উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসজ্জিত।

ভারতীয় লিপির সবচেয়ে বড় অস্থবিধা হইল ইহার বিভিন্ন রকমের সংযুক্তবর্ণ। কিন্তু সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলি ভাঙ্গিয়া পৃথক ভাবে লেখা সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণের স্থবিধার জন্য উপরে বা নীচে বিশেষ ধরণের মাত্রা চিহ্ন ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে দেবনাগরী বর্ণমালার যে আকৃতি আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারও খানিকটা পরিরর্তন সাধন করিয়া একটু সহজ রূপ দেওয়া যাইতে পারে। মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে যদি সংশ্লিষ্ট অল্পপ্রাণ বর্ণ অবলম্বনে কোন চিহ্ন সহযোগে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে প্রচলিত বর্ণমালার বর্ণের সংখ্যা অনেকটা কমিয়া যাইবে এবং ভারতের সর্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা শিক্ষা কর সহজসাধ্য হইবে। কয়েকটি ধ্বনির প্রয়োজন নাও হইতে পারে। এই ব্যাপারে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হইলে তাহারা সর্বপ্রকার স্থবিধা ও অস্থবিধার কথা বিবেচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে আসিতে সক্ষম হইবেন। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সমস্যা দূরীভূত হইলে আর কয়েকশত টাইপের প্রয়োজন হইবে না এবং দেবনাগরী লিপির মাধ্যমে ভারতের সমগ্র ভাষাগুলি রূপ পাইতে পারিবে।

ভারতের ভাষা সমস্যা যতটা জটিল—লিপি সমস্যা তদ্রূপ জটিল নহে। ইহার একটা সহজ সমাধান সম্ভব। ভারতের মত একটা উপ-মহাদেশে লিপিসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইলে বিভিন্ন লিপির টাইপের জন্য যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় তাহা বাঁচিয়া যাইবে। বড় স্থবিধা হইল এই যে সমগ্র ভারতে একটিমাত্র লিপি প্রচলিত থাকিলে প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপন করা সহজ হইবে। ফলে পরস্পরের ভাষা বুঝিবার বা শিখিবার পথ অনেকটা সুগম হইবে। ইহা যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই একান্তভাবে কাম্য।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাষাতত্ত্বের বিবর্তনের ইতিহাস

বৈদিক যুগে ভাষার আলোচনা

ধর্মের প্রেরণা হইতেই ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বৈদিক সূক্তগুলি ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ। কেবল ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বে আর্যভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। 'The Rigveda is the most ancient book of The Aryan World' (Maxmüller)। বেদের রচনাকাল আনুমানিক ১২০০-১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষেই যথার্থ ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হয়। বৈদিক মন্ত্রগুলি যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে স্বরের উচ্চারণ রীতি এবং স্বরাঘাত সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান আবশ্যক। বেদের বিভিন্ন পাঠের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া গিয়া **'প্রাতিশাখ্য'** নামক গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল। প্রাতি-শাখ্যগুলিতে সংস্কৃতের ধ্বনি সমূহ, ধাতুরগণ, শব্দ সম্পদ ইত্যাদি বিষয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচিত হইয়াছে।

নিরুক্ত (Etymology)—বহু বৈদিক শব্দ অবলুপ্তির ফলে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিরূপণের জন্য শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। বৈদিক শব্দকোষের প্রাচীনতমগ্রন্থ হইতেছে **'নিঘুণ্টু**। বেদের কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দ 'নিঘুণ্টু' গ্রন্থগুলিতে সংগৃহীত হইয়াছে। **যাস্ক** (খ্রী-পূঃ ৮০০) এই নিঘুণ্টুর উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। ইহার নাম **'নিরুক্ত'**। নিরুক্তকে বৈদিক মন্ত্রভাষ্য বলা যাইতে পারে। বৈদিক সূক্তে কোন্ শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, নিরুক্ত-গ্রন্থে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাস্ক নিরুক্তিতে বৈদিক শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছন। তাঁহার মতে সমস্ত ধাতুগুলির মূল কতকগুলি নির্দিষ্ট ধাতুর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। যাস্কের সময় হইতেই বিশেষ্য, সর্বনাম, আখ্যাত, নিপাত ও বিভিন্ন প্রত্যয়ের আলোচনার সূত্রপাত হয়।

ব্যাকরণ—প্রাতিশাখ্যগুলিতে ধ্বনি-বিজ্ঞান, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ভেদে স্বরের উচ্চারণ রীতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিভাবে একটি পদ গঠিত হয়, তাহার জন্য প্রয়োজন ব্যাকরণ। বেদের মন্ত্রগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একদিকে যেমন

স্বরের গুরুত্ব রহিয়াছে, তেমনি শব্দেরই ও গুরুত্ব রহিয়াছে। ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে **পাণিনি** ব্যাকরণের বিষয়বস্তুকে সুবিন্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **'অষ্টাধ্যায়ী সূত্র'** রচনা করেন। ইহা আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাঁহার ব্যাকরণে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা রহিয়াছে। ইহা চৌদ্দটি শিব-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। **'বাক্যই ভাষার মূল একক'** (Sentence is the unit of language) —এই তথ্যটি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রথম উদ্ঘাটিত হয়। পাণিনি পদকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সুবন্ত, তিঙন্ত ও নিপাত। সুবন্ত পদে কারকের বিভক্তি যুক্ত হয়, তিঙন্ত পদে ক্রিয়ার কাল-ভাব-বাচ্য সূচক বিভক্তি যুক্ত হয়। নিপাত পদের কোন পরিবর্তন হয় না। এইগুলি অব্যয়। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধিতা ও ধর্মীয় ভাব রক্ষার জন্য পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে শিষ্ট সাহিত্যিক ভাষা (Classical Sanskrit) তাঁহারই সৃষ্টি। পাণিনি উত্তর-পশ্চিমা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সর্বকালের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক। তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী 'Unique achievement of a great analysing mind'। পাণিনির ব্যাকরণ সম্বন্ধে ভাষা বিজ্ঞানী Bloomfield এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। —'The Indian grammar presented to European eyes, for the first time, a complete and accurate description of a language, based not upon theory but upon observation'। আর্য সংস্কৃতি জ্ঞান গর্ভের অন্যতম সরণী পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী।

পাণিনির পূর্বে আরও কয়েকজন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ্য—আপিশলি, শাকল্য, শাকটায়ন ও গার্গ্য। পাণিনির পরে অষ্টাধ্যায়ীর উপর অনেকগুলি টীকা বা ভাষ্য রচিত হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে **কাত্যায়ন** পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রের উপর একখানি **'বার্তিক'** রচনা করেন। বার্তিকগুলির কিছু অংশ পাণিনির সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রচিত। কতকগুলি বার্তিক পাণিনি সূত্রের অনুপূরক হিসাবে রচিত। আবার কতকগুলি সমালোচনামূলক। সংস্কৃত বৈয়াকরণদের মধ্যে পাণিনির পরেই **পতঞ্জলির** নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহরে রচিত **"মহাভাষ্যে'** পাণিনির মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কাত্যায়নের বার্তিকগুলি নিয়াও তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যটি তাঁহার অসাধারণ বৈদগ্ধের পরিচায়ক। পরবর্তীকালে আরও অনেক ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলাপি, সংক্ষিপ্তসার, সারস্বত, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ এবং ভট্টোজি দীক্ষিত রচিত সিদ্ধান্ত কৌমুদী উল্লেখযোগ্য।

বোপদেব পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে সহজ ও বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার **'মুগ্ধবোধ'** ব্যাকরণখানি রচনা করিয়াছিলেন। লৌকিক সংস্কৃত অনুশীলন করিবার জন্য বাংলাদেশে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে আদৃত। কাশ্মীরে **জয়াদিত্য** ও **বামন** এই দুইজন পণ্ডিতের যৌথ সম্পাদনায় **'বৃত্তিসূত্র'** রচিত হয়। পণ্ডিত সমাজে গ্রন্থখানি **'কাশিকা'** বলিয়া পরিচিত।

হেমচন্দ্র (১০৮৮–১১৭২) জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি তাঁহার রচিত **'শব্দানুশাসনে'** ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে জৈন প্রাকৃত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। তাঁহার রচিত **'দেশীনামমালা'** গ্রন্থে প্রায় চারি হাজার শব্দের টীকা সঙ্কলিত হইয়াছে।

যাস্ক, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, বোপদেব, হেমচন্দ্র প্রমুখ প্রতিভাবান বৈয়াকরণদের সাধনায় সংস্কৃত ভাষা বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

গ্রীসে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা

ভাষাসম্বন্ধীয় আলোচনার প্রথম পর্যায়ের ইতিহাসে গ্রীক পণ্ডিতগণের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা ছিল যে ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত। প্রকৃতির নিয়মেই উহার বিকাশ ঘটে। কিন্তু সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতদের মতে ভাষা নিয়মিত নয়। উহা কতকগুলি প্রতীকের সমষ্টি। ডায়নিয়াস থ্রাক্স, হিরোডিয়ান প্রমুখ পণ্ডিতগণের ব্যাকরণে দার্শনিক তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। লাতিন পণ্ডিতগণ ও গ্রীক ব্যাকরণের আদর্শে লাতিন ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজী ব্যাকরণে ও লাতিন ব্যাকরণের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছিল।

গ্রীস দেশকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বলিয়া অভিহিত করা হয়। **আরিস্টটল** (Aristotle) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাষার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার শব্দ বিন্যাস-রীতি কর্তা (subject), ক্রিয়া (predicate) এবং অব্যয় (copula) পরবর্তীকালে বৈয়াকরণগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। **প্লেটো** (Plato) তাঁহার দার্শনিক আলোচনায় ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত হইতেছে— "Thought (dianonia) is the conversion of the soul with herself which takes place without voices, while the stream which, accompanied by sound, flows from thought through the lips, is called language (lo'gos)"। প্লেটো স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(ক) অঘোষ (Psila') ; (খ) সঘোষ (me'sa) ; (গ) মহাপ্রাণ (dase'a)। ধ্বনিবিভাগের এই

রীতি পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও গৃহীত হইয়াছিল। প্লেটোর ভাবতত্ত্বকে (Thery of Ideas) 'ডায়ালেক্‌টিক' বলা যায়। শব্দটি 'dialogue' হইতে উদ্ভূত। বস্তু অপরিবর্তনীয়। তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের উপায়কেই বলা হয় 'ডায়ালেক্‌টিক'।

ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চা

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং তাহারই ফলশ্রুতি স্বরূপ **তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparativc Philology)** প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষই আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু ইউরোপের মনীষীরা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে ভারতীয়-আর্য ভাষা, অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষা, পারসীক-আবেস্তীয় ভাষাসমূহ একটা সাধারণ উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যাহাকে প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী নাম দেওয়া হইয়াছে।

ভারত বিদ্যাবিদ্ **স্যার চার্লস উইলকিন্স** (Sir charles wilkins)।

ইংরেজদের মধ্যে প্রাচ্য ভাষাসমূহের চর্চার সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য হ্যালহেড সাহেব বাংলা-ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিলেন। কিন্তু তখন বাংলা লিপির সমস্যা দেখা দিল। চার্লস উইলকিন্স ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামান্য চাকরি নিয়া ভারতে আসেন। এই সুদক্ষ পরিশ্রমী যুবক অক্লান্ত পরিশ্রমে একপ্রস্ত বাংলা হরফ প্রস্তুত করিলেন। এই টাইপের সাহায্যেই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হইল। পরবর্তী-কালে উইলকিন্সেরই চেষ্টায় দেবনাগরী, ফারসী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার ও বর্ণমালা তৈয়ারী হয়। ভারতীয় ভাষার মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। পরবর্তীকালে উইল্‌কিন্স ভাগবদ্‌গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। তিনি কয়েকটি প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিতোপদেশের ইংরেজী অনুবাদ বাহির করেন। মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত শকুন্তলা আখ্যান অংশটি তাঁহার দ্বারা অনূদিত হয়।

স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir william Jones) [১৭৪৬—১৭৯৪]।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারী প্রাচ্য-বিদ্যা গবেষণাকেন্দ্রের পীঠস্থান 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' কলিকাতায় স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ স্যার উইলিয়াম জোনস্ এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন—"The sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful

structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either ; yet bearing to both a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could have been produced by accident—so strong that no philologer could examine all three without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists. There is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both Gothic and Celtic, though blended with a different idiom had the same origin with the sanskrit, and the old Persian might be added to the same family".

পরবর্তীকালে বপ, রাস্ক, গ্রীম, ব্রুগমান প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকদের সাধনার ফলে উইলিয়াম জোন্সের এই সুচিন্তিত অভিমতটি স্বীকৃতিলাভ করে। উইলিয়াম জোন্স ভারত বিদ্যাবিদ্ স্যার চার্লস উইলকিন্সের নিকট সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাঁহার শকুন্তলার অনুবাদ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি গীতগোবিন্দ ও মানব-ধর্মশাস্ত্রের ও অনুবাদ করিয়াছিলেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নামক বিজ্ঞানশাখার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জোন্সের নাম যে-কোন ভাষাবিজ্ঞানী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবেন।

হেনরি টমাস কলিব্রুক (Henry Thomas Colebrooke)

(১৭৬৫-১৮৩৭)

সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে যে সমস্ত ইংরেজ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কলিব্রুকের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় সমস্ত প্রাচ্য ভাষাবিদ্ই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ছাড়াও তিনি প্রাকৃত, ফারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন গাছপালা ও প্রাণীজগৎ সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল।

ফ্রেডারিক্ বন সিগেল্ (Friederich Von Schlegel)

(১৭৭২-১৮২৯)

ফ্রেডারিক সিগেল জার্মান দেশের অধিবাসী ছিলেন। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন নামক একজন ইংরেজ সৈনিকের নিকট তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "On the language and the wisdom of the Indians" ১৮০৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম "তুলনামূলক ব্যাকরণ"—এই শব্দটি প্রয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে সিগেলই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে জার্মান পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জার্মাণীতেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সর্বাধিক কাজ হয়।

সিগেল পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলিতে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে—সংস্কৃত এবং সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাসমূহ। অন্যান্য ভাষাগুলি হইল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ভাষায় ধাতুর আভ্যন্তরীন পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার পরিবর্তন বহিরাঙ্গিক। ইহাই ভাষাবর্গের ব্যাকরণগত শ্রেণীবিন্যাস—Organic ও Affix।

উইল্‌হেল্‌ম বন হামবল্‌ট (Wilhelm Von Humboldt)

(১৭৬৭-১৮৩৫)

হামবল্‌ট তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রধান প্রধান সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার মতে সমস্ত বস্তুর আদি ও অন্ত্য অজ্ঞাত। কেবলমাত্র মধ্যবর্তী স্তর সম্বন্ধেই ধারণা করা যায়। তিনি মনে করেন সমস্ত শব্দের মূলে রহিয়াছে ধাতু (roots)। প্রত্যয় বিভক্তিগুলি শব্দের অংশ বিশেষ।

ফ্রেন্‌জ্‌ বপ (Franz Bopp) (১৭৯১-১৮৬৭)

বপ্ কর্তৃক লিখিত সংস্কৃত, আবেস্তা, গ্রীক, লাতিন, লিথুয়ানীয়, গথিক ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ১৮৩৩ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ ভাষাগুলির পূর্বরূপ পুনর্গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার স্বরাঘাত সম্বন্ধে আলোচনার অংশটি বাহির হয়। ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত বপ মনে করিতেন যে প্রত্যয়গুলি শব্দের অংশ বিশেষ।

জেকব গ্রিম (Jacob-Grimm) (১৭৮৫-১৮৬৩)

জার্মান ভাষায় গ্রিমের ঐতিহাসিক ব্যাকরণ ১৮১৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। তাঁহার মতে মানবজাতির উন্নতির সঙ্গে ভাষারও উন্নতি হয়। ভাষার পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে। জার্মানিক ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের দুইটি সূত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। এইগুলি গ্রিমের সূত্র (Grimm's law) বলিয়া পরিচিত।

রাস্ক (Rask)
(১৭৮৭-১৮৩২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রাস্ক অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম জার্মানিক শাখায় ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে গ্রিমের পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে রাস্কের নাম উল্লিখিত হয়। আইসল্যাণ্ডের ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ১৮১৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। "Anglo-Saxon"-এর ব্যাকরণ লিখিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। জেন্দ্ আবেস্তা সম্বন্ধেও তাঁহার গবেষণা বিশেষ মূল্যবান। রাস্ক সর্বপ্রথম পথিবীর ভাষা-সমূহের বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস করেন।

ম্যাক্স মূলার (Max-müller)
(১৮২৩-১৯০০)

ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের বক্তৃতাগুলি পণ্ডিতমহলে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শায়নের টীকাসহ ঋগ্বেদের সংস্করণ তাঁহার প্রশংসনীয় কাজ। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নামক বিজ্ঞান শাখায়ও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় মিলে। পূর্বাঞ্চলের ধর্মীয় গ্রন্থগুলির ৫০খণ্ডে সম্পাদনা করিবার গুরু দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ভারতের ভাষাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে মুণ্ডাগোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির পার্থক্য নির্ণয় করেন।

রুডল্ফ রোথ (Rudolf Roth)
(১৮২১—১৮৯৫)

বৈদিক সংস্কৃতে রোথ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে আবেস্তা ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য। রোথের সম্পাদিত সংস্কৃত ভাষার অভিধান খানি যে কোন ভাষা বিজ্ঞানীর নিকট অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

কার্ল ব্রুগমান (Karl Brugmann)

আধুনিক যুগের নব্য ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে ব্রুগমান হইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। "ভাষার ইতিহাস" বিষয়ক মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত "Prinizipien der sprachges-chichte" নামক গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত।

হুইট্‌নি (W. D. Whitney)
(১৮২৭-১৮৯৪)

আমেরিকার ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে হুইট্‌নির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, কোন ভাষার মধ্যেই সেই জাতির চিন্তাধারার প্রতিফলন হয়। তিনি বপ ও রোথের ছাত্র ছিলেন। রোথের সঙ্গে তিনি যুক্তভাবে ১৮৫৬ খ্রীঃ অথর্ব বেদের সম্পাদনা করেন। লৌকিক ও বৈদিক সংস্কৃতের জন্য লিখিত ব্যাকরণ খানি (A Sanskrit Grammar) তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই এই ব্যাকরণ খানি লিখিত হয়। ভাষাতত্ত্বের মূলতত্ত্ব ও সাধারণ সূত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত দুইটি গ্রন্থ "The life and growth of language" এবং "Language and its study" ভাষাবিজ্ঞানীর নিকট সমাদার লাভ করিয়াছে।

বি, ডেলব্রুক (B. Delbrück)

ডেলব্রুক সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের তুলনামূলক ব্যাকরণ খানি (Outline of the Comparative Grammar of the Indo-European Languages) ভাষার ইতিহাস একটি মূল্যবান সংযোজন।

জুলিয়াস জোলি (Julius Jolly)

জোলী সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু আইন এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন বিষয়ে "টেগোর বক্তৃতামালা" দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষার উপর একখানি তুলনামূলক ব্যাকরণ ও রচনা করিয়াছিলেন।

জর্জ ব্যূলার (Georg Bühler)
(১৮৩৭-১৮৯৮)

বূলার একজন ভারতবিদ্যাবিদ্ ছিলেন। তিনি বোম্বাই এ প্রাচ্য ভাষা বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পুণায় তিনি ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার রচিত 'ভারতের প্রাচীন লিপিবিজ্ঞান' (Indian Palaeography) গ্রন্থের প্রথমখণ্ড ১৮৯৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। লিপিবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহা নিঃসন্দেহে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

সিল্‌বাঁ লেভি (Sylvain Le'vi)
(১৮৪৩-১৯৩৬)

সিল্‌বা লেভি বিশ্বভারতীতে পরিদর্শক-অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতের অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। সংস্কৃত, ইরানীয়, নেপালী, চীনীয়, তিব্বতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর পিশেল (R. Pischel)
(১৮৫৬-১৯০৬)

পিশেল সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় পিশেলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তিনি জিপ্‌সীদের ভাষাগুলির উপরেও মূল্যবান কাজ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম 'Materialen zur Kenntnis der Apabhraṃs'a'

হারমেন ওল্ডেনবার্গ (Hermann Oldenberg)

ওল্ডেনবার্গ পালি এবং বৌদ্ধসাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত। তাঁহার লিখিত বুদ্ধের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থখানিও পণ্ডিত মহলে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির উপরে তিনি একটা প্রামাণ্য টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের ও ইতিহাস লিখিয়াছেন।

হারমেন য়াকোবি (Hermann Jacobi)

য়াকোবি প্রাকৃত ভাষাগুলির সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ও প্রাচীন মারাঠী ভাষার উপরই তাঁহার কাজ সমধিক প্রশংসনীয়।

য়াকোব ওয়াকারনগেল (Jacob Wackernagel)
(১৮৫৩-১৯৪০)

ইউরোপে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ ভারত বিদ্যাবিদ্ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ওয়াকারনগেল্ অন্যতম। ইরানীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কাজ হইতেছে সংস্কৃত ভাষার একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা। ইহার প্রথমখণ্ড ১৮৯৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়।

বিশপ কলড্‌ওয়েল (Bishop Coldwell)
(১৮১৪-১৮৯১)

কলড্‌ওয়েল দক্ষিণ ভারতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত দ্রাবিড়ীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar of the Dravidian Languages) ১৮৫৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়।

জন্ বিমস্ (John Beames)

বিমস্ ভারতের ভাষাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের রূপরেখা (Outlines of Indian Philology) নামক পুস্তিকাখানি ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত ভারতের আর্য-ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণের (A Comparative Grammar of the modern Aryan Languages of India) প্রথমখণ্ড ১৮৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি তিনখণ্ডে সমাপ্ত। ইহা মৌখিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থখানির উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি সম্বন্ধে আর ও ব্যাপকভাবে অনুশীলন হয়।

ডঃ হোর্নল (Dr. Hoernle)

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে হোর্ণল-এর প্রথম প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৮৭২ খ্রীঃ বাহির হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ তাঁহার রচিত পূর্বী-হিন্দীর ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।

জুলস্ ব্লক (Jules Bloch)

আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ জুলস্-ব্লকের লিখিত প্রবন্ধগুলি অতিশয় মূল্যবান। মারাঠী ভাষা এবং দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধেও তিনি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন।

গ্রিয়ার্সন (Sir George Abraham Grierson)

গ্রিয়ার্সনের কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিহারে অতিবাহিত হয়। বিহারের বিভিন্ন ভাষাগুলি নিয়া তিনি গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'Behar Peasant Life' একখাদি উপাদেয় গ্রন্থ। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতেছে 'Linguistic Survey of India'। এই গ্রন্থে তিনি ভারতের ভাষা সমীক্ষার দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি কতকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত। ইহাতে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা ও উপ-ভাষার নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের গবেষকের নিকট এই গ্রন্থটি অপরিহার্য। বস্তুত গ্রিয়ার্সনের পূর্বে ভারতের ভাষাগুলি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এইরূপ বিরাট গবেষণামূলক কাজ হয় নাই। Sten Konow এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রিয়ার্সনের সঙ্গে কাজ করিয়াছেন।

বারথোলোমে (Bartholomae)

বারথোলোমে আবেস্তা, প্রাচীন পারসীক এবং পহ্লবী ভাষাগুলি নিয়া কাজ করিয়াছেন। আবেস্তা ভাষার উপর রচিত তাঁহার অভিধানখানি গবেষকদের নিকট স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

মরিস ব্লুমফিল্ড (Morris Bloomfield)

তিনি সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ মরিস ব্লুম ফিল্ড জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বহু নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ খ্রীঃ তিনি 'লিঙ্গুইষ্টিক সোসাইটি অব আমেরিকা'র সভাপতি নিযুক্ত হন।

বর্ণনামূলক ব্যাকরণ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভাষাসমূহের গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইউরোপের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ফার্ডিনাণ্ড দ্ সস্যর গ্রন্থে (Course de Linguistique Generale) তাহার পরিচয় মিলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বর্তমানে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলিতেছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত ভাষা বিজ্ঞানী সুনাম অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড, এসওয়ার্ড স্যাপির, গ্লিসন, ফ্রাঞ্জ বোয়াস প্রমুখ পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ্য। ব্লুমফিল্ড সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মতে বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাহায্যেই ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সার্থক হইতে পারে। তিনি তাঁহার 'Language' নামক গ্রন্থে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে দুইজন রুশ পণ্ডিতের (বাউডুইন দ্ কুরতিনে এবং ক্রুজেস্কি) অবদানও উল্লেখযোগ্য। গ্লিসনের 'An Introduc-

tion to Descriptive Linguistics', জন কেরলের 'The study of Language,' স্টুরটাভেন্টের 'An Introduction to Linguistic Science' এবং চার্লস হকেটের রচিত 'A manual of Phonolggy' ও 'A course in modern Linguistics' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ রীতি অনুসৃত হইয়াছে। আমেরিকায় গঠন বিন্যাসমূলক ভাষাতত্ত্ব (Structural Linguistics) নামক ভাষা-বিজ্ঞানের আর একটা নূতন শাখায় বর্তমানে নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। এ বিষয়ে এস. হারিসের (S. Harris) 'Methods in Structural Linguistics' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

ভারতে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা

পাশ্চাত্য দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুপ্রেরণায় ভারতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাষা-তত্ত্বের চর্চা আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। এই দেশে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামোহন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। **স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডার কর** পাশ্চাত্য আদর্শে সর্ব প্রথম '**ভাষাতত্ত্ব**' নামক নূতন বিজ্ঞান শাখার প্রতি শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রদত্ত ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতাগুলি 'উইলসন ফিলোলজিক্যাল লেকচারস্' (Wilson Philological Lectures) নামে খ্যাত। ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও তিনি সংস্কৃত, দর্শন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ডঃ বুলার-এর 'ভারত বিদ্যা সম্বন্ধীয় কোষ-গ্রন্থে'ও তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারই নামানুসারে ১৯১৭ খ্রীঃ পুণাতে প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহা '**ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট**' নামে পরিচিত। সর্ব ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যার প্রথম অধিবেশন পুণাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনের প্রথম সভাপতিরূপে ভাণ্ডার কর মনোনীত হন। ভারতের বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ভাণ্ডারকরের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তখন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের জন্য "তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব" (Comparative Philology) নামক নূতন বিভাগের সৃষ্টি হয়। এই বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন আই. জে. এস. তারাপোরওয়ালা (I.J.S. Taraporewalla)। তাঁহার ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থখানি "Elements of the Science of Language" কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার পরে ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ (The origin and development of the Bengali Language) ১৯২৬ খ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। গত বৎসর (১৯৭২ খ্রী:) এই গ্রন্থখানি ৩ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড অবশ্য নূতন সংযোজন। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির বর্ণনামূলক, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য এই গ্রন্থখানির সম্যক অনুশীলন প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু গবেষকের পক্ষে অপরিহার্য। আধুনিক ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তিনি 'A brief sketch of Bengali Phonetics' ও 'Bengal Phonetic Reader' গ্রন্থ দুইখানিতে বাংলার ধ্বনিমূলগুলির (Phonemes) বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণে' ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সুষ্ঠু রীতি অনুসৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার লিখিত 'Indo-Aryan and Hindi', 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'Bengal Self-Taught' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় বহন করে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের পরবর্তী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন (ভাষার ইতিবৃত্ত)। তাঁহার রচিত 'A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan' ডেকান কলেজ, পুণা হইতে ১৯৬০ খ্রী: প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত 'Old Persian Inscriptions of the Achaemenian Emperors' পুস্তকখানি ১৯৩৯ খ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। গত বৎসর (১৯৭২) তাঁহার 'Etymological Dictionary of Bengali' নামক গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বিভাগের অন্যতম খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'Calcutta Oriental Journal' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয় 'শব্দকথা' ও 'Technical terms and technique of Sanskrit Grammar' ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' এই গ্রন্থ দুইখানিতে বর্ণনা-মূলক ভিত্তিতে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ডঃ মনোমোহন ঘোষ, অধ্যাপক গোপাল হালদার, অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার, ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীশশধর রায় প্রমুখ শিক্ষাব্রতীগণ এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া

ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে প্রশংসনীয় গবেষণা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সুশীলকুমার দে, বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু ছাত্র-ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি সম্বন্ধে মূল্যবান কাজ করিয়াছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাসে ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে পুণায় ডেকান কলেজে এই বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা চলিতেছে। ভারতে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। শ্রীগোপাল হালদার—'A brief Phonetic sketch of the Noakhali Dialect of South-Eastern Bengali'—[Journali of the Deptt of Letters—1929, Calcutta University.]

'A skeleton Grammar of the Noakhali Dialect of Bengali.'

[Do]

২। শ্রীসিদ্ধেশ্বর বর্মা—'Critical studies in the Phonetic observations of Indian Grammarians'—London, 1929.

"The Phonetics of Lahnda" [Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal—1936]

৩। শ্রীবাণারসী দাস জৈন— "A phonology of Panjabi" [Lahore, 1934]

৪। ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ— "Linguistic Introduction to Sanskrit" [Calcutta—1937]

৫। এ. এম. ঘাটগে— (A. M. Ghatage)—"Introduction to Ardha magadhi" [Kolapur, 1938]

৬। এস. এম. কাটরে—(S. M. Katre) "The Formation of Konkani" [Bombay, 1942]

" " "Some problems of Historical Linguistics in Indo-Aryan" [Bombay 1944]

এস. এম, কাটরে— Prakrit Languages and their contributions to Indian Culture" [Bombay, 1945]

৭। ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী— "Linguistic notes on Maimansingh dialect [Indian Linguisties, 1939]

" "Linguistic notes on Chittagong Bengali" [Indian Linguistics, 1940-41]

৮। ডঃ সুভদ্রা ঝা— "Maithili Phonetics" [Indian Linguistics—1940-41]

" "The formation of the Maithili Language" [London—1958]

৯। শ্রীবাণীকান্ত ককটি— "Assamese, its formation and development" [Gauhati, 1941]

১০। শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণ বালে— "Verbal composition in Indo-Aryan" [Poona, 1948]

১১। ডঃ পি. ডি. গুণে— An Introduction to comparative Philology [Poona, 1958]

১২। শ্রীউদয়নারায়ণ তেওয়ারী— "The origin and development of the Bhojpuri Language" [Asiatic Society, Calcutta, 1960]

১৩। ডঃ সত্যস্বরূপ মিশ্র— "A comparative grammar of Sanskrit, Greek and Hittite" [World Press, 1968]

১৪। মুহম্মদ আবদুল হাই— "ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব" [Dacca, 1964]

" "A Phonetic and Phonological study of Nasals and Nasalization in Bengali".

১৫। রফিকুল ইসলাম— "ভাষাতত্ত্ব" [Dacca, 1970]

১৬। ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক— "অপরাধ-জগতের ভাষা" [Calcutta, 1971]

" "অপরাধ-জগতের শব্দকোষ" [" "]

১৭। শ্রীকামিনী কুমার রায়— "লৌকিক শব্দকোষ" [Calcutta, 1968]

১৮। আর. এল. টার্ণার— (R. L. Turner) "A comparative dictionary of the Indo-Aryan

Languages : Indexes Compiled" [Oxford, 1969]

১৯। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামী— "A study of Kamrupi, A dialect of Assam" [Gauhati, 1970]

২০। Georges Leclerc— An introduction to Bengali Phonemes (Oriental Institute, Barisal)

২১। টি. বারো ও শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য—"The Pengo Language" [Oxford, 1970]

২২। টি বারো— "A Dravidian etymological dictionary : Supplement." [Oxford, 1971]

২৩। শ্রী পি. সি. ভট্টাচার্য— "An introduction to the the Boro Language" [Gauhati. 1971]

২৪। ডঃ নীলমাধব সেন— Some Dialects of Bangala Desh" [1972]

২৫। শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার— "সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রম বিকাশ" (1972)

এতদ্ব্যতীত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ কালীপ্রসাদ সিংহ "বিষ্ণুপ্রিয়া বাংলা ও মেই থেই ভাষা", ডঃ নির্মলেন্দু দাস 'সুন্দরবন অঞ্চলের ভাষা" এবং ডঃ কনক সেন "পূর্ববঙ্গের উপভাষা" সম্বন্ধে প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষা নিয়া কিছু কিছু গবেষণা হইয়াছে। গ্রীয়ার্সনের "Linguistic Survey of India" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক ধ্বনিতাত্ত্বিক রীতিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষাগুলির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে। তরুণ ভাষাবিজ্ঞানীরা যদি আধুনিক বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা ও বিভাষাগুলির যথাযথ অনুশীলনের গুরু দায়িত্ব বহন করেন, তাহা হইলে ভারতের ভাষা সমীক্ষার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে।

বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাকরণ

পোর্তুগীজ পাদরী মানোএল-দা-আস্‌-সুম্প্‌সাম ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। পোর্তুগীজ ভাষায় লেখা এই গ্রন্থখানি ১৭৪৩ খ্রীঃ রোমান অক্ষরে

লিসবন শহরে ছাপা হয়। ইহার পরে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড নামক একজন ইংরেজ একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁহার বইখানি" "A Grammar of the Bengali Language" ১৭৭৮ খ্রীঃ হুগলী হইতে প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ ব্যবহৃত হয়। উইলিয়ম কেরীর ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণ ১৮০১ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ ১৮২৬ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৩৩ খ্রীঃ তাঁহার বাংলায় লেখা "গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ" কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৮২০ খ্রীঃ জে· কীথ বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। বইখানি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত হইয়াছিল। এই হেতু, ইহা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। রেভারেণ্ড ডব্লু, ইয়েট্সের 'Introduction to the Bengali Language in 2 volumes." ১৮৪৬-১৮৪৭ খ্রীঃ লিখিত হয়।

ডানকান ফরবেসের "Grammar of the Benga'i Language' ১৮৬১ খ্রীঃ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। জন বীমস্ ১৮৯৪ খ্রীঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। (Grammar of the Bengali.. Language literary and colloquial) এই বইখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯২০ খ্রীঃ জে· ডি· অ্যাণ্ডারসনের বাংলা ব্যাকরণ (A Manual of the Bengali Language) এবং এলেক্স ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বাংলা ব্যাকরণ (An Easy Introduction to Colloquial Bengali) ১৯৩৩ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ১৮৯৮ খ্রীঃ রচনা করেন। আচার্য যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধির "বাঙ্গালা ভাষা" ১৯১২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত স্নীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৯ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রকাশ করেন। ইহা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর রচিত। ইংরেজীতে লিখিত তাঁহার 'Bengali Self-Taught' গ্রন্থখানিও বিদেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

উনত্রিংশৎ অধ্যায়

ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বাংলা

বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত ভারতের ভাষাগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) আর্যশাখা, (২) দ্রাবিড় শাখা, (৩) অষ্ট্রিক বা কোল শাখা, (৪) ভোট-চীনীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বর্মী শাখা। অষ্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি হইতেছে সাঁওতালী, হো, মুণ্ডারী, শবর, ভূমিজ, কোরকু, গর্দা প্রভৃতি। মধ্যভারত ও ছোট নাগপুরের আদিম অধিবাসীরা এই ভাষাগুলি ব্যবহার করে। আসামের খাসিয়া ভাষাও এই গোষ্ঠীভুক্ত। সুপ্রাচীন কাল হইতে এই ভাষাগুলি উত্তর ভারতে প্রচলিত থাকিলেও ইহাদের বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই।

ভোট-বর্মী শাখার প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে মণিপুরী, মেইতেই, কোণ্ডা, টিপুর, গারো, লুশে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৭৫ লক্ষ লোক এই শাখার শতাধিক ভাষা ও উপভাষা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে। কিন্তু এই ভাষাগুলিরও কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। সুতরাং ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ইহাদের প্রভাব একেবারেই নগণ্য। তবে সম্প্রতি অরুণাচল, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে। আশা করা যায়, এই সব পার্বত্য রাজ্যের অন্-আর্য ভাষাগুলি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অন্যান্য উন্নত ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে।

দ্রাবিড় শাখার মুখ্য ভাষাগুলি তামিল, তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালাম্ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। ভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক মাতৃভাষা হিসাবে দ্রাবিড় শাখার ভাষাগুলি ব্যবহার করে। ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের প্রভাব দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির উপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়িয়াছে। সেইজন্য মৌল পার্থক্য সত্ত্বেও আর্য ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। দ্রাবিড় শাখার ভাষাগুলি সাহিত্য গৌরবে সমৃদ্ধ।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর যে শাখা ভারতে আর্য ভাষারূপে কথিত, সেই শাখার উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলি হইতেছে—পূর্ব অঞ্চলের বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ও মৈথিলী; মধ্যদেশের হিন্দী (ও উর্দু); উত্তর অঞ্চলের কাশ্মীরী; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাবী; দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গুজরাটী ও মারাঠী।

ভারতীয় সংবিধানে আর্যগোষ্ঠীর প্রধান নয়টি ভাষা—বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, উর্দু, কাশ্মীরী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী; দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান চারিটি ভাষা—তামিল, তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালাম এই তেরটি আঞ্চলিক ভাষা, তৎসহ সংস্কৃত ও ইংরেজী মোট এই পনেরটি ভাষাকে প্রশাসনিক কাজের জন্য ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য একটা সাধারণ ভাষার প্রয়োজন। সেই জন্য সংবিধানে সংযোগকারী ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে **(Lingua franca)** হিন্দীর দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। ভাষা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন যে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংরেজী ভাষার স্থানে হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে উত্তর ও মধ্যভারত ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এক অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। অ-হিন্দী অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। অনেকে সাত তাড়াতাড়ি করিয়া ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে ভারতের সমাজ-জীবনের সর্বত্র প্রবর্তনের চেষ্টাকে কেন্দ্রীয় সরকারের একদেশদর্শী মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে এইরূপ প্রচেষ্টা আত্মঘাতী নীতিরই সামিল। প্রবীণ রাজনীতিবিদ্ চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। ভাষা কমিশনের দুইজন বিশিষ্ট সদস্য অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সুব্বারায়ন স্বতন্ত্র রিপোর্টে বর্তমান অবস্থায় হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অবশ্য হিন্দীর উৎকট সমর্থকরা ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছেন। কেননা, কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইন প্রণয়ন হিন্দীতে হইবে। অ-হিন্দী অঞ্চলের সরকারী কর্মচারীদের হিন্দী শিখিতে হইবে। রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উক্ত প্রদেশের নাগরিকগণ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন। কিন্তু ইহা কোন গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাম্য নহে।

এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হইবে, তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া আমাদের একটা সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের আর্য ও প্রাগ্-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর যতগুলি উন্নত প্রাদেশিক ভাষা আছে, তন্মধ্যে বাংলা ভাষীর সংখ্যাই সর্বাধিক। আসাম,

বিহার বাংলাদেশ এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালীকে ধরিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এগার কোটি। পৃথিবীর এগারটি সমৃদ্ধশালী ভাষাগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে সংখ্যার দিক হইতে ইহার স্থান হইল ষষ্ঠ :—(১) উত্তর-চীন, (২) ইংরেজী; (৩) হিন্দুস্থানী; (৪) রুশ; (৫) স্পেনীয় ভাষা; (৬) বাংলা; (৭) জার্মান; (৮) জাপানী; (৯) ইন্দোনেশীয় ভাষা; (১০) আরবী; (১১) ফরাসী।

(১) উত্তর-চীনীয় ভাষা প্রায় ৩০ কোটি লোকের মাতৃভাষা। সমগ্র চীন দেশে ৭৫ কোটি লোকের ইহা রাষ্ট্রীয় ভাষা।

(২) ইংরেজী—গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় ২৫ কোটি লোক ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করে। বর্তমানে ইংরেজী আন্ত-র্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

(৩) হিন্দুস্থানী—উত্তর ভারতে ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রায় ১৬ কোটি লোক সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

(৪) স্পেনীয় ভাষা—স্পেন ও লাতিন আমেরিকায় ১২ কোটির বেশী লোকের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত।

(৫) রুশীয় ভাষা—১১ কোটির বেশী লোকের মাতৃভাষা। তবে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সমগ্র রাশিয়ায় প্রায় ২৫ কোটি লোক এই ভাষা ব্যবহার করে।

(৬) বাংলা—পশ্চিম বাংলা, পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রায় ১১ কোটি লোকের মাতৃভাষা।

(৭) জার্মান—জার্মানী, সুইট্জারল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়াতে ১০ কোটির বেশী সংখ্যক অধিবাসী এই ভাষা ব্যবহার করে।

(৮) জাপানী—প্রায় ১০ কোটি লোকের মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়।

(৯) ইন্দোনেশীয়—প্রায় ৮ কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত।

(১০) আরবী—আরব, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, মিশর, সুদান, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের ৬½—কোটির বেশী লোক এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

(১১) ফরাসী—ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য কিছু অঞ্চলে প্রায় ৬ কোটির মত অধিবাসীর ইহা জাতীয় ভাষা।

আবার ভাষার সম্পদ এবং প্রাণশক্তির দিক হইতে চিন্তা করিলে সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান সর্বপ্রথম। ভারতে মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষা হিসাবে

ইংরেজীর পরেই বাংলার স্থান। এমন কি, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাকে শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বাংলা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য রূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

অপরদিকে হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের সংখ্যা আট কোটির মত। সুতরাং এখানে প্রশ্ন উঠিবে যে সম্পদ ও সংখ্যার দিক হইতে বাংলা ভাষার স্থান যখন প্রথম, তখন সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করিয়া হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইল কেন? এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশ বিভক্ত হওয়ার বহু পূর্বেই ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকেই রাষ্ট্রভাষা করিবার অনুকূলে মত দিয়াছিলেন। তাহাদের যুক্তি হইল এই, উত্তর প্রদেশ ছাড়াও ভারতের কোন কোন অঞ্চলের (যথা—বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব) অধিবাসীগণ তাহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র মাতৃভাষা থাকা সত্ত্বেও শহরে, গঞ্জে বা ব্যবসায়িক কেন্দ্রে, এক কথায় বৃহত্তর জীবনে সংস্কৃতি-বাহক ভাষা হিসাবে (**cultural language**) হিন্দী ব্যবহার করেন। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকদিগকে ধরা হইলে অবশ্য হিন্দী (উর্দু সমেত) ভাষা-জানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫।১৬ কোটি। ভারতের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা প্রায় চল্লিশ জন লোক হিন্দী জানে বলিয়াই ভাষা কমিশনের অধিকাংশ সদস্য হিন্দীকে আন্তঃপ্রাদেশিক সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য মত দিয়াছেন। তাঁহাদের আর একটা যুক্তি হইল হইল এই যে, মৌলিক সাদৃশ্যের জন্য ভারতের জনসাধারণের পক্ষে ইংরেজী অপেক্ষা হিন্দী শিক্ষা করা সহজ হইবে।

কিন্তু কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে সেই ভাষার সম্পদ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি (**Inherent strength**) দ্বারাই একটা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। কোন ভাষায় যদি শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য থাকে, তাহার যদি সঞ্জীবনী শক্তি থাকে; তাহা হইলে সেই ভাষা লোকে আগ্রহ সহকারে শিখিবে। জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন আসিবে না। তাছাড়া, জোর করিয়া চালাইতে গেলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, তামিল ও মারাঠী সাহিত্য-গৌরবে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের তুলনায় হিন্দী ভাষার দৈন্য সুস্পষ্ট। হিন্দী ভাষার চর্চা দ্বারা এই সমস্ত ভাষাগুলি ভাবের দিক হইতে লাভবান হইবে না। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির কথা বাদ দিলেও বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষাগুলির সঙ্গে হিন্দীর শব্দগত ও ব্যাকরণগত যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। লিঙ্গভেদের জন্যও সহজে হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। তদুপরি হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলে অ-হিন্দী অঞ্চলে অধিবাসীদের ইংরেজী নিয়া তিনটি ভাষা

ও তিনটি লিপি শিখিতে হইবে। ইহাতে সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপচয় ঘটিবে। সুতরাং বর্তমান অবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সিদ্ধান্ত বজায় রাখিলে ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সুকঠিন হইবে।

তাহা হইলে এখন আমাদের করণীয় কি? অনেকে যতদিন না হিন্দী ইংরেজীর সমকক্ষ হইয়া উঠে ততদিন পর্যন্ত ইংরেজীকেই ভারতের সরকারী ভাষারূপে রাখার পক্ষপাতী। আবার কেহ কেহ সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক। তাহাদের বক্তব্য হইল এই যে, সুপ্রাচীন কালে সংস্কৃত ছিল ভারতের সরকারী ভাষা। আর্য-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মূল উৎস হইল বৈদিক সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই ভারতের আর্য ও প্রাগ্-আর্য ভাষাগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাষা-গুলিতে উচ্চকোটির শব্দ সমূহ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই ভাষাই হইল ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ একটু সহজ করিয়া নিলেই এই ভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজ-কর্ম চালানো যাইতে পারে এবং ভারতের রাষ্ট্রভাষা নিয়া যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও একটা সহজ সমাধান হয়। কিন্তু প্রাকৃত যুগের সময় হইতেই সংস্কৃত সুপ্ত ভাষায় পরিণত হয়। এই ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া রাষ্ট্রভাষা করার অনেক বাস্তব অসুবিধা রহিয়াছে। তা ছাড়া, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে অ-হিন্দু অধিবাসীদেরও ইহাতে আপত্তি থাকিবে। অতএব সংস্কৃতের প্রসঙ্গ উত্থাপনও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের পক্ষে সমীচীন হইবে না। মানবজাতির ঐক্যের সেতু হইতেছে ভাষা ও ধর্ম। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশেই এই দুয়ের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইউরোপের যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতে ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধন অনেক সুদৃঢ়।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে ভারতের মত একটা উপ-মহাদেশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিন্দী, বাংলা, মারাঠী ও তামিল—এই চারিটি প্রধান ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে আমাদিগকে কোন বিশেষ ভাষার প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের ভাব পোষণ না করিয়া সংস্কার মুক্ত হইতে হইবে এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই সম্বন্ধে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্তব্যও বিশেষভাবে অবধানযোগ্য। তিনি উপরিউক্ত চারিটি ভাষাকে চারি-প্রান্তের প্রতিনিধি-স্থানীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী।

খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দে ভারতে চারিটি প্রধান উপভাষা-গোষ্ঠী ছিল। (১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা; (২) মধ্যদেশীয় উপভাষা; (৩) প্রাচ্য বা পূর্বী অঞ্চলের উপভাষা; (৪) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা হইতে সিন্ধী ও পাঞ্জাবী ভাষা হইয়াছে। মধ্য দেশের উপভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতে

রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক হিন্দী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। পূর্বী অঞ্চলের উপভাষা মাগধী প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, মগহী প্রভৃতি ভাষায় পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা হইতে মারাঠী ভাষা হইয়াছে। স্থতরাং আঞ্চলিক ভিত্তিতে পূর্ব-ভারতের জন্য বাংলা, উত্তর ও মধ্যভারতের জন্য হিন্দী, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের জন্য মারাঠী এবং দক্ষিণ-ভারতের জন্য দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত সমৃদ্ধশালী ভাষা তামিল—এই চারিটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইলে সমস্যার সহজ সমাধান হইতে পারে।

পূর্ব অঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে অসমীয়া ও ওড়িয়াকে বাংলার উপভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বরং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের (নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) বাংলা অপেক্ষা ওড়িয়া ও অসমীয়া সহজবোধ্য। মৈথিলী ভাষার সঙ্গেও বাংলার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। একসময়ে মৈথিলী ভাষার হরফ বাংলার মত ছিল। স্থতরাং বাংলা, ওড়িশা, আসাম ও বিহারের দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজকর্ম চালাইলে একদিকে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইবে, তেমনি পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের ক্ষেত্রেও প্রশস্ততর হইবে। ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া যেমন ভারতীয় ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছে, শক্তিশালী বাংলা ভাষার সাহচর্যে ওড়িয়া অসমীয়া প্রভৃতি ভাষাগুলিও শক্তি অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। এতদ্ব্যতীত মৌল সাদৃশ্যের জন্য পূর্ব-অঞ্চলের অধিবাসীদের হিন্দী অপেক্ষা বাংলা শিক্ষা করা অনেক সহজ ও স্থবিধাজনক হইবে।

সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতের জন্য হিন্দী হইবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ভারতের দক্ষিণ-অঞ্চলের জন্য মারাঠীই হইবে সরকারী ভাষা। দক্ষিণ ভারতের তামিল হইল একমাত্র ভাষা, যাহা গৌরবের উচ্চাসনে স্থপ্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষা দ্বারা পুষ্ট মালয়ালাম্ প্রাচীন তামিল হইতে উদ্ভূত। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীগণের হিন্দী অপেক্ষা তামিল শিক্ষা করা যে স্থবিধাজনক হইরে, সেই বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। স্থতরাং সমগ্র ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিটি অঞ্চলের প্রধান চারিটি ভাষাকে স্বীকৃতি দান করিলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্যার একটা বাস্তববুদ্ধি সম্মত সমাধান হইতে পারে। বৈচিত্র্য রক্ষা করিলেই ভারতের ঐক্য স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। প্রস্তাবিত এই চারিটি অঞ্চলের যোগসূত্র রক্ষা করিতে হইবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। ইংরেজী ভাষার কল্যাণেই ভারতের বিভিন্ন অংশে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষারক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ইংরেজী ভাষাই হইল পৃথিবীতে

সর্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষা। অধিকাংশ দেশেই ইংরেজী প্রধান বৈদেশিক ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। এই ভাষার মাধ্যমেই জগতের চিন্তাধারা মূর্ত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যে বলিষ্ঠতা আছে, তাহা অন্য কোন দেশের ভাষায় নাই। সুতরাং জ্ঞানের সম্যক অনুশীলন করিতে হইলে এবং বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইংরেজী ভাষাকে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজ-জীবনে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান দিতে হইবে। সহসা যদি ইংরেজীর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ছেদ করি, তাহা হইলে একদিকে যেমন আমরা অন্য দেশের তুলনায় পিছাইয়া পড়িব, অন্যদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমাদের অপমৃত্যু ঘটিবে। দেড়শ বছরেরও অধিককাল ভারতীয় নাড়ীর সঙ্গে ইংরেজী ভাষার সংযোগ ঘটিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত ভারতের কোন আঞ্চলিক ভাষা সর্বভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা অর্জন না করিবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে ইংরেজীকে সংযোগকারী ভাষা হিসাবে রাখিলে ভারতের বেশীর ভাগ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুইটি ভাষা ও দুইটি লিপি শিখিলেই কাজ চলিবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগুলি নিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক দেশেই একাধিক ভাষা রাষ্ট্রের শাসন কার্যে ব্যবহৃত হয়। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে চারিটি ভাষা—জারমান্, ফরাসী, ইতালীয় ও রেতো-রোমান রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ব্যবহৃত লয়। কানাডায় দুইটি ভাষা—ইংরেজী ও ফরাসী, আফগানিস্থানে দুইটি ভাষা—ফারসী ও পশ্‌তো রাষ্ট্রকার্যে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ভারতের মত প্রকাণ্ড দেশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে চরিটি ভাষাকে রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করিলে দেশের অখণ্ডতা বা ঐক্য বিনষ্ট হইবে না কিংবা একরাষ্ট্রীয়তার অন্তরায় হইবে না। ভারতে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা কখনও ব্যাহত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার কথা একটু স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে হইবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে দেশ বিভক্ত হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। সাড়ে সাত কোটি লোকের অধ্যুষিত একটা বিরাট অঞ্চল বর্তমানে স্বাধীন বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তির ফলে আসাম ও বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলির প্রতি সুবিচার হইতেছে না। সেইসব স্থানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করা হয় না। সম্প্রতি বিহারের বাঙ্গালী অধিবাসীরা এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। বিহার সরকারের আদেশ অনুযায়ী বাংলার পরিবর্তে তাহাদের লেখাপড়া এবং অন্যান্য যাবতীয় সরকারী কাজ হিন্দীতে করিতে হইবে। সমস্যাবহুল পশ্চিমবঙ্গ আজ অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিপর্যস্ত। দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে বাঙ্গালীর সমাজ জীবনও পর্যুদস্ত হইয়াছে। সুতরাং আঞ্চলিক ভিত্তিতে পূর্ব-ভারতের

জন্য রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার দাবী স্বীকৃত হইলে ইহার প্রসারের ক্ষেত্র বর্ধিত হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতেই উহা সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

আজ পূর্ব দিগন্তে নব সূর্য উদ্ভাসিত। পাকিস্তানের কবলমুক্ত হইয়া বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের দেশবিভাগজনিত অদূরদর্শিতার ফলে উভয় বঙ্গের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারও পরিসমাপ্তি ঘটিল। পাক শাসকবর্গ বাংলাদেশের জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার হীন ষড়যন্ত্র জনগণ-মন-অধিনায়ক শেখ মুজিবের তীব্র আন্দোলনের ফলে ব্যর্থ হইয়া যায়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা আত্মাহুতিও দিয়াছেন। অতঃপর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ বাংলাভাষার সার্বিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা ও ভারসাধনা কাব্যে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে এককথায় সাহিত্যের সর্বস্তরে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বাংলা পরিভাষা রচনার কাজেও তাঁহাদের গভীর নিষ্ঠার পরিচয় মিলে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দের পরিভাষা কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। পরিভাষা রচনার কাজ এখনও পুরাদমে চলিতেছে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের কাজে বাংলা আকাদামির ভূমিকাও বিশেভাবে উল্লেখ্য। প্রাচীন লোকসঙ্গীত, জারিগান, বাউলগান, কবিগান, ভাদুগান, গাথা, রূপকথা, বারমাস্যা ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর নহে। অল্পস্বল্প শিশুসাহিত্য ও নাটক প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গঠিত নূতন সরকার প্রথমেই বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাবার মর্যাদা দিয়াছেন। বাংলার আকাশ বাতাস আজ রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ দাশের সঙ্গীতে মুখর। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হইল—রবীন্দ্রনাথের, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি' গানটি। এই গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। বাংলাদেশে গণ-আন্দোলনের সময় হইতেই এই গানটি জাতীয়তাবোধের প্রতীকরূপে নির্বাচিত হর। বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করিয়াছে—'বাংলা ভাষার একটি অক্ষর বাঙ্গালীর জীবন।' বাংলাদেশের আবির্ভাব আমাদের সামনে এক নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। দুই বাংলার মধ্যেকার প্রাচীর অপসারিত হইয়াছে। ওপার বাংলার আদর্শে এপার বাংলার বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক ও ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। জাতি, ভাসা ও সংস্কৃতির দিক হইতে উভয় বঙ্গের বাঙ্গালীই এক। বিগত ২৫ বৎসরে

বাংলা দেশের সাহিত্য ও শিল্পে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পশ্চিম-বঙ্গবাসীর অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আবার পশ্চিমবাংলার সাহিত্য ও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যাহাতে বাংলাদেশের অধিবাসিগণের ঔৎসুক্য জন্মে, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ফলে দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কাজে বাংলাভাষা এখনও অপাংক্তেয়। আমলাতন্ত্রের অনেকেরই সরকারী স্তরে বাংলা প্রবর্তনের সম্বন্ধে তীব্র অনীহা। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভাষাতত্ত্বগত প্রশ্নগুলি এখন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে করা হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। বাংলাদেশে 'বাংলা' সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করায় ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। ওপারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া যদি এপারেও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সুষ্ঠু অনুশীলন ও গবেষণা হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে উহা সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, একমাত্র হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার না করিয়া ভারত সরকার যদি আঞ্চলিক ভিত্তিতে উপরিউক্ত চারিটি প্রধান ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দানের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রহিসাবে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হইবে।

হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দু ও চলতি হিন্দী)

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য বা সংস্কৃত ভারতের হিন্দু জনসাধারণের ধর্ম ও সংস্কৃতিবাহক ভাষা। ভারতে উপনিবিষ্ট আর্যগণ যে সমস্ত উপভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, তাহাদের সংস্কৃত বা মার্জিত রূপটি বিধৃত হইয়াছে চতুর্বেদে। সেজন্য বৈদিক সংস্কৃতই আর্য ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্বে মধ্যদেশে প্রচলিত আর্য ভাষার ও বৈদিক ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া 'লৌকিক সংস্কৃত'-এর সৃষ্টি হয়। পাণিনি লৌকিক সংস্কৃতের (Classical Sanskrit) বিশুদ্ধ রূপটি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ রচনা করেন। সুতরাং আদি ভারতীয়-আর্য ভাষার নিদর্শন হইতেছে বৈদিক ও সংস্কৃত।

কালক্রমে লোক-মুখে ভাষা পরিবর্তিত হইয়া যে নূতন রূপ প্রাপ্ত হইল তাহাকে বলা হয় মধ্য ভারতীয়-আর্য বা প্রাকৃত। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ হইতে খ্রীষ্ট-পর ৬০০ পর্যন্ত পালি এবং মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধ-মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইল।

খ্রীষ্টীয় ৬০০-এর নিকটবর্তী সময়ে প্রাকৃত ভাষাগুলি আরো পরিবর্তিত হইয়া "অপভ্রংশ" নাম প্রাপ্ত হয়।

মধ্যদেশ হইতেছে লৌকিক সংস্কৃত ও শৌরসেনী-অপভ্রংশের জন্মভূমি। দেবভাষা সংস্কৃতের পরেই স্থান হইল শৌরসেনী-অপভ্রংশের। বাংলা ভাষার মতই খ্রীষ্টীয় ১০০০ হইতে ১২০০-র মধ্যে শৌরসেনী-অপভ্রংশ হইতে হিন্দী ভাষার উৎপত্তি হয়। পরবর্তী-কালে মুসলমান সম্রাটদের রাজত্বকালে পাঞ্জাব ও দিল্লীঅঞ্চলের ভাষার (খড়িবোলী) আধারের উপর হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে পাঞ্জাবী, ব্রজভাষা (মথুরা-উজ্জয়িনী অঞ্চলের ভাষা), অবধী (অযোধ্যায় প্রচলিত ভাষা) প্রভৃতি ভাষাগুলির প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠান ও মোগল আমলে যে সকল হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ বা অন্যান্য কার্যোপলক্ষে দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিলেন তাহারা সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রতিষ্ঠা করেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে ভারতীয় মুসলমানগণ ফারসী সাহিত্যের আদর্শে হিন্দুস্থানী ভাষার নবরূপ দান করেন। ফলে বহু ফারসী শব্দ (এবং তৎসহ কিছু পরিমাণে আরবী শব্দ) এই ভাষায় প্রবিষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান লেখকগণ এই নূতন সৃষ্ট ভাষা আরবী-ফারসী হরফে লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন এই ভাষার নাম দাঁড়ায় **উর্দু**। এই উর্দু ভাষাই সমগ্র উত্তর-ভারতের মুসলমানগণের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে উত্তর-ভারতের হিন্দুগণ দেবনাগরী লিপিতে হিন্দুস্থানী ভাষা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং সংস্কৃত হইতে উচ্চ-ভাব-দ্যোতক শব্দাবলীও এই ভাষায় গৃহীত হয়। সুতরাং হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটি সাহিত্যিকরূপ হিন্দী ও উর্দু। ইহাদের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠন রীতি অভিন্ন। শুধু বর্ণমালা এবং উচ্চকোটির শব্দ সমূহ পৃথক। আবার সমগ্র উত্তর-ভারতে (এবং দক্ষিণ ভারতেও) সাধারণ জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে, তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। ইহাই "চলতি হিন্দুস্থানী" বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এই চলতি হিন্দীর কোন নিয়ম সম্মত ব্যাকরণ নাই বলিয়া এই ভাষায় কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। বর্তমানে এই সরল হিন্দীই কার্যত ভারতের সত্যিকার জাতীয়ভাষা (National language)। ইংরেজীর মত প্রসার শক্তির জন্যই এই ভাষা ভারতের জন-জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হইয়াছে।

সংস্কৃত ও ইংরেজী

ইংরেজী আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত টিউটনিক (Teutonic) শাখার অন্যতম ভাষা। সুতরাং ইহা মূলত সংস্কৃত, আবেস্তীয় ও পারসীকের সহিত

সম্পৃক্ত। এইভাবে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাই একই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তবে আধুনিক ইংরেজী ও বাংলার মধ্য ব্যবধান থাকিলে ও বাংলার মূলস্থানীয় বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাচীন ইংরেজীর মধ্যে শব্দ, ধাতু ও প্রত্যয়-বিভক্তিতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

যেমন,	সংস্কৃত	ইংরেজী	সংস্কৃত	ইংরেজী
	পদ	foot	পিতর্	father
			মাতর্	mother
	মুষ্	mouse	ভ্রাতর্	brother
	ভ্রূ	brow	দুহিতর্	daughter
	অক্ষি	eye	স্বসর্	sister
	বিধবা	widow	দন্ত	*tanth>tooth
	তৃষ	thirst	গৌ	cow
	নাসা	nose	উদর	udder
	উদ্র	otter	উক্ষ	oxs>ox
	ত্বম্	thou	ভরা-মি	bear
	জনঃ	kin	কঃ	who
	রুধির	red	বৃকঃ	wolf
	বন্ধ্	bind		
	পত্রম্	feather	জীবন্	quick
			ভর্	bear
	√অদ্	eat	√মন্	man
	√স্মি	smile	নখ	naeg-el>nail
	√ভর্	beareth	শ্রুতন্	loud
	অস্তি	est>is	দ্বৌ	twai>two
	ত্রয়ঃ	threis>three	পঞ্চ	finf>five
	ষষ্	six	সপ্ত	sibun>seven
			অষ্টা	eight
	নব	niun>nine	দশ	tehun>ten
	শত	hundred	বেদ	wit

ইত্যাদি।

সংস্কৃত বিশেষ্যের বহুবচনে—'অস' এবং ইংরেজীতে '-s,-es' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে ষষ্ঠীর একবচনে '-স্য' এবং ইংরেজীতে '-s' বিভক্তি যুক্ত হয়।

সংস্কৃতে বিশেষণের তারতম্য বুঝাইতে শব্দের সঙ্গে '-ইয়স্, -ইষ্ঠ' আর ইংরেজীতে '-er, 'est' প্রত্যয় যুক্ত হয়। সংস্কৃতে নঞর্থক উপসর্গ হইতেছে '-অ,-অন', ইংরেজীতে '-un'। এ ছাড়া, আরো বহু বিষয়ে সংস্কৃত ও প্রাচীন ইংরেজীর মধ্যে মিল রহিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর কতকগুলি লেখায় প্রাচীন ইংরেজী ভাষার নিদর্শন মিলে। ঐ সময়ের ইংরেজীকে **Old English** (**Anglo-Saxon**) বলা হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে নরমান-জাতি কর্তৃক ইংলাণ্ড অধিকৃত হয়। তখন হইতে ইংরেজির উপর ফরাসী ভাষার প্রভাব পড়িতে থাকে। ভারতীয় ভাষাগুলি যেমন সংস্কৃত হইতে নানা উপকরণ গ্রহণ করিয়া শক্তিশালী হইয়াছে তদ্রূপ ইংরেজী ভাষা ও গ্রীক হইতে আবশ্যকমত শব্দ ও অন্যান্য উপাদান আহরণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং রাজকার্যের ভাষারূপে ইংরেজী পৃথিবীর নানা অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়া আরো শক্তিশালী হইতে থাকে। ভারতীয় ভাষার ও কতকগুলি শব্দ ইংরেজী শব্দ ভাণ্ডারে আসিয়াছে।

যেমন, রাজা, রাণী, গুরু, পণ্ডিত, সন্ধি, গুণ, বুদ্ধি, অহিংসা, ধর্ম, কর্ম, লুট, জঙ্গল, পাকা, লস্কর, সেপাই, খাকি প্রভৃতি।

বর্তমানে ইংলণ্ড ছাড়াও আমেরিকা, নিউ-জিলাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় মাতৃভাষারূপে ইংরেজী ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত চীন, জাপান ও আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে ও ইংরেজী ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। ইংরেজীর সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। ইংরেজী বাক্‌ভঙ্গী, ইডিয়ম ও শব্দসমূহ ভারতীয় ভাষাসমূহে ক্রমশই গৃহীত হইতেছে। ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে ইংরেজী বলবৎ রহিয়াছে। একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন স্থাপিত হয়। 'Language is admittedly one of the fundamental factors of unity in human society'। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের জন সাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কৃত্রিম ভাষার (Artificial Language) সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে এস্‌পারেণ্টো-ই (Esperanto) প্রধান। কিন্তু কতকগুলি কারণে এই ভাষাগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। বর্তমানে ইংরেজী ভাষাই আন্তর্জাতিক ভাষা (International Language) হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

সমগ্র মানব জাতির সম্মিলিত চেষ্টার ফলে একমাত্র ইংরেজী ভাষাই পৃথিবীর আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাহন। ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেও সমাজ-জীবনে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য বর্তমানের মতই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ত্রিংশৎ অধ্যায়

ভাষায় বিবর্তনের ধারায়, বৈদিকসংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় যে সমস্ত শব্দ আসিয়াছে তাহাদের কতকগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রা-বা	আ-বা
অঙ্গুষ্ঠিকা	অঙ্গুট্‌ঠিআ	অঙ্গুট্‌ঠিঅ	আঙ্গুঠি	আংটি
*অচ্ছতি (*এস্‌কোতি)	অচ্ছই	অচ্ছই	আছই	আছে
অতসী	অতসী, তসী	তসি	—	তিসি
অদ্য	অজ্জ, অজ্জিং	অজ্জিঁ	আজি	আইজ, আজ
অধস্থাৎ	অহেট্‌ঠা, হেট্‌ঠা	হেণ্ট	হেণ্ট	হেঁট
অর্দ্ধ-চতুর্থ	অড্‌ঢুট্‌ঠ, অড্‌ঢউট্‌ঠ		আহুঠ	আউট
অর্দ্ধ-তৃতীয়	*অড্‌ঢ-তিতীয়, অড্‌ঢঅইঅ	অড্‌ঢতইঅ	—	আড়াই
অন্তঃকুট	অন্তউড	অন্তউড়	—	আঁতুড়
অপর	অবর	অবর	আঅর	আর
অপুত্র	অবুত্ত	*অবুণ্ট	আউঁট	আঁট
	[আঁট+কুড়া<কূট=আঁট কুড়ো]			
অপস্মরতি	অপস্‌সরতি, পস্‌সরই	পস্‌সরই	—	পাসরে
অবিধবা	অবিহবা, অইহআ	অইহঅ	আইহ	এয়ো
অরিষ্ট	অরিট্‌ঠ, রিট্‌ঠ	রিট্‌ঠ	—	রিঠা, রীঠা
অলক্ত	অলত্ত	অলত্ত	আলতা	আল্‌তা
অলাবু	লাউ	লাউ		লাউ
অশীতি	অসীদি, অসীই	অসীই	আসী	আশী
অষ্ট	অট্‌ঠ	অট্‌ঠ	আঠ	আট
অষ্টাদশ	অট্‌ঠাদস, অট্‌ঠারহ	অট্‌ঠারঅ	—	আঠার
অস্থিক	অট্‌ঠিঅ	*অন্ঠিঅ	—	আঁঠি
অস্মে	অম্‌হে	অম্‌হি	আম্‌হি	আমি
অক্ষবাট	অক্‌খবাট, অক্‌খবাড	অক্‌খআড়	—	আখড়া

সং	প্রা	অপ	প্রা-বা	আ-বা
অক্ষি	অক্‌খি	*অংখি	—	আঁখি
অত্যদ্ভুত	অচ্চব্‌ভুঅ	—	—	আচাভুআ
আকুলায়িত	আউলাইঅ	আউলাইঅ	আউলা	এলো
আদর্শিকা	আঅরসিআ	আঅরসিঅ	—	আরসী
আদিত্য	আদিচ্চ, আইচ্চ	আইচ্চ	—	আইচ (পদবী)
আবিশতি	আবিসদি, আইসই	আইসই	—	আসে
আমিষ-বৃত্তিকা	আঁইস-বট্টিআ	আঁইস-বট্টিঅ	—	আঁষটে
আম্রাতক	অম্বাডঅ	অম্বাডঅ	অম্বাডা	আমড়া
আর্যিকা	আয্‌যিআ	আয্‌যিঅ	—	আয়ি
ইন্দ্রাগার	ইন্দাআর	ইন্দার	ইন্দারা	ইঁদারা
ইষ্টক	ইস্‌টঅ	*ইণ্টঅ	—	ইঁট
উৎপদ্যতে	উপ্পজ্জদি	উপ্পজ্জই	—	উপজে
উৎস্থল	উত্থল	উত্থল	—	উথল
উৎশ্বাস	উচ্‌ছাস	—	উছাস	—
উৎস্থাপয়তি	উট্‌ঠাবেই	উট্‌ঠবেই	—	উঠায়
উপকারিকা	উআরিআ	উআরিঅ	উআরী	উয়ারী
উপবিশতি	উবইসই	বইসই	বইসে	বৈসে, বসে
উপবীত	পঈত	পইত	—	পৈতা
উপাধ্যায়	উপজ্‌ঝাঅ, উঅজ্‌ঝাঅ	উঅজ্‌ঝাঅ	উঅজ্‌ঝঅ	ওঝা
উষ্ণাপন	উন্‌হাবণ	উন্‌হাঅণ	—	উনুন
উষ্ট্র	উট্‌ঠ	—	উঠ	উট
ঊর্ধ্ব	উদ্ধ	উভ	উভ	উবু
*ঋজুবুধ্য	*অজ্জবুব্‌অ	—	—	আজবুঝ
এক	এক্ক	এক্ক	—	এক, এ্যাক্‌
কথয়তি	কথেতি, কহেই	কহেই	কহে	কহে, কয়
কণ্ঠপাল	কণ্ঠপাল, কণ্ঠআল	কণ্ঠঅল	—	কাঁঠাল (পদবী)
কোষ্ঠপাল	কোট্টপাল,কোট্টআল	কোট্টঅল	কোট্টয়াল	কোটাল
কপিত্থ	কবিত্থ, কইত্থ	কয়েথ,	কত্থ	কয়েদ, কদ

সং	প্রা	অপ	প্রা-বা	আ-বা
কফনিকা	কহণিআ, কহণি	কণই	—	কনুই
কর্কটক	কক্কডঅ	*কঙ্কডঅ	—	কাঁকড়া
কর্মকারক	কম্মআরঅ	—	—	কামার
কর্ষপট্টিকা	কস্‌সপট্টিআ, কস্‌সবট্টিআ	কস্‌সবট্টিঅ	—	কষ্‌ঠী
*কীদৃশন	কইসন	কইহন, কেহেন	কেহ্ন	কেন
কুষ্মাণ্ডক	কুম্‌হাণ্ডঅ	কুম্‌হণ্ডঅ	—	কুমড়া
কৃত্য-গৃহ	কচ্ছহরিঅ	—	—	কাছারী
ক্রন্দতি	কন্দতি, কন্দই	কন্দই	কান্দে	কাঁদে
ক্রীণাতি	কীণতি, কীণই	কিনই	—	কিনে
কেতক-ট	কেদগড, কেঅঅড	কেবড়া	—	কেওড়া
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কন্‌হ	কান্‌হ	কান, কানু, কানাই
খণ্ড	খণ্ড, খড্‌ড	খড্‌ড	—	খড়্গ, খাঁড়া, খান
খদিকা	খইআ	খইঅ	—	খই
খাদতি	খাঅই	খাই	খাঁই	খায়
খাদ্য	খজ্জ	খজ্জ	—	খাজা
ক্ষরতি	খরই	—	—	ঝরে
ক্ষাম	ঝাম	—	—	ঝামা
ক্ষুব্ধ	খুব্ধ; ছুব্ধ	—	ছুধ	ছুঁত, খুঁত
ক্ষুরিকা	খুরিআ, ছুরিআ	খুরিঅ, ছুরিঅ	—	খুরি, ছুরি
গণ্ড	গল্ল	গল্ল	—	গাল
গর্জন	গজ্জন	—	—	গাজন
গর্দভ	গদ্দহ	গদ্দহ	গাদহ	গাধা
গাথয়তি	গাহেই	—	গাহে	গায়
গর্ভরূপ	গব্‌ভরুঅ	—	—	গাভুর
গৃহ	*গরহ	—	—	ঘর
গৃহিণী	ঘরিণী, ঘরিণি	—	—	ঘরণি
গোপবাটিকা	গোববাডিঅ	গোঅবাডিঅ	—	গোয়াড়ী

সং	প্রা	অপ	প্রা-বা	আ-বা
গোমিক	গোমিঅ	গোবিঁঅ	—	গুঁই (পদবী)
গোবিষ্ঠা	গোইট্‌ঠা	গোইট্‌ঠ	—	ঘুঁটে
গ্রথতে>গঠতে	গঠই	গঠই	গঢ়ে	গড়ে
গ্রন্থয়তি	গ্রন্থেই	—	—	গাঁথে
ঘুণ্টিক	ঘুণ্টিঅ	ঘুণ্টিঅ	—	ঘুঁটে
গ্রথক>ঘটক	ঘটঅ	ঘডঅ	—	ঘড়া
গ্রন্থি	গণ্ঠি	—	গাঁঠি	গাঁট
চর্ততি>চটতি	চডই	—	—	চড়ে
চলতি	চলই	—	—	চলে
চন্দ্র	চন্দ	—	চান্দ	চাঁদ
চক্ষতি	চক্‌খই	—	—	চাখে
চিহ্ন	চিণ্‌হ	—	—	চিন, চিনা
চিরাতিতিক্ত	চিরাইইত্ত	চিরাঅইত্ত	চিরাইত	চিরতা, চিরাতা
কিরাত+তিক্ত	চিলাইত্ত, চিরাইত	—	—	চিরতা, চিরাতা
ছর্দিন্	ছই	—	—	ছই
ছন্দস্	ছন্দ	—	ছান্দ	ছাঁদ
ছন্ন	ছন্ন	—	—	ছানা
ছেদনিকা	ছেঅণিআ	ছেঅণিঅ	—	ছেনী
জয়হার	জঅহার	—	—	জোহার
*জাগ্রতি (=জাগৃতি)	জগ্‌গই	জগ্‌গই	—	জাগে
জাতপত্রিকা	জাঅত্রিঅ	—	জায়তী	—
জিহ্বা	জিব্‌ভা	—	—	জিব, জিভ
জুর্ণ	জুণ্ণ	—	—	ঝুন, ঝুনা
জুষ্ঠ	জুট্‌ঠ<ঝুট্‌ঠ	—	—	ঝুট, ঝুটা
জ্যেষ্ঠতাত	জেট্‌ঠতাত, জেট্‌ঠদাদ	জেট্‌ঠআত	—	জেঠা
জ্যেষ্ঠতাতিকা	জেট্‌ঠাইঅ	জেট্‌ঠইঅ	—	জেঠাই
জ্ঞাতিগৃহ	নাইহর		নাইহর	নাইয়র
তাম্র	তম্ব	তম্ব	তাম্বা	তামা, তাঁবা

সং	প্রা	অপ	প্রা-বা	আ-বা
তুণ্ড	টুণ্ড	—	—	ঠোঁট
ত্রয়োদশ	তেরস, তেরহ	তেরঅ	—	তের
ত্রোটয়তি	তোডেই	—	—	তোড়ে
*ত্রিত্য (=তৃতীয়)	তিতীয়, তিইজ্জ	তিঈজ	—	তেজ
ত্রীণি	তিণ্ণি	তিণ্ণি	তীনি	তিন
দংশ	ডংশ	—	—	ডাঁশ
দলপতি	দলবই	দলঅই	—	দলুই (পদবী)
দক্ষিণ	দক্‌খিণ, দাহিণ	দাহিন	—	ডাহিন, ডান
দীপবর্তিকা	দিঅবট্টিআ	দিঅবট্টিঅ	দিয়টি	দেউটী
দীপবৃক্ষ	দীবরুক্‌খ	দীঅরুক্‌খ	দিঅরূখা	দেরখো
দুহিতা	ধিতা, ঝিআ	ঝিঅ	—	ঝি, ঝী
দ্যূত	জুদ, জুঅ	জুঅ	—	জুয়া
দেবগৃহ	দেবঘর, দেবহর	দেহর	—	দেহরা
দ্রম্য (<গ্রীক দ্রাখমে)	দম্ম	—	—	দাম
দ্বাদশ	দ্‌বাদশ	—	বারহ	বার
দ্বাবিংশতি	বাবীসতি, বাঈসঈ	বাইসই	—	বাইশ
ধাতৃকা	ধাইআ	ধাইঅ		ধাই
ধূমক	ধূমঅ	ধুঁবঅ	—	ধোয়া
নখহরণিকা	ণহহরণিআ	*নহ-হরনী	—	নরুন
নবনীত	নবনীঅ	নবনীঅ	নঅনী	ননী
নগ্ন-বর্ত	*ণঙ্গ-বট্ট	*নঙ্গ-অট্ট	—	নাংটা
নপ্তৃক	ণত্তিঅ	—	—	নাতি
নষ্ট	নট্‌ঠ	নঠ	ণাঠ	নট, নাট
নিদ্রা	নিদ্দা	*নিন্দা	নিন্দা	নিদ, নীঁদ
পঞ্চদশ	পন্নরস, পন্নরহ	পন্নরঅ	—	পনর, পনে।
পততি	পডই, পড়ই	পড়ই	পড়ে	পড়ে
পর্যঙ্কিকা	পল্লঙ্কিআ	পল্লঙ্কিঅ	—	পালকি

সং	প্রা	অপ	প্রা-বা	আ-বা
পিতৃস্বস্থকা	পিউস্‌সিআ	পিউসিঅ	—	পিসী
পুত্র	পুত্ত	পুত্ত	পুত্ত	পো
পৃচ্ছতি (=*পৃস্কোতি)	পুচ্ছদি, পুচ্ছই	পুচ্ছই	—	পুছে
প্রবিশতি	পবিসই	পইসই	পইপে	পশে
প্রভাতি	পভাদি, পহাদি	পহাই	—	পোহায়
প্রক্ষালয়তি	পক্‌খালেদি	পক্‌খালেই	—	পাখালে
প্রস্নবয়তি	পণ্‌হবেই	—	—	পানায়
প্রস্থাপয়তি	পট্‌ঠাবেই	পট্‌ঠবেই	—	পাঠায়
প্রাজন	পাজন	—	—	পাচন
ফল্গু	ফগ্‌গু	ফগ্‌গু	—	ফাগ
বর্ধতে	বড্‌ঢতি, বড্‌ঢই	বড্‌ঢই	—	বাড়ে
বৎসরূপ	বচ্ছরূব, বচ্ছরূঅ	বচ্ছরূঅ	—	বাছুর
বর্গ	বগ্‌গ	বগ্‌গ	—	বাগ
বল্গা	বগ্‌গা	বগ্‌গ	—	বাগ
বর্ততে	বট্টদি, বট্টই	বট্টই	—	বাট
বন্যা	বঞ্‌ঞা, বণ্ণা	বণ্ণ	বান	বান্
বর্ধতে	বড্‌ঢতি, বড্‌ঢই	বড্‌ঢই	বাঢ়ে	বাড়ে
বর্ধাপিকা	বদ্ধাইআ	বদ্ধাইঅ	—	বাধাই
বৎসরূপ	বচ্ছরূঅ	—	—	বাছুর
বাষ্প	বপ্‌ফ	বপ্‌ফ	—	ভাপ
বাসগৃহ	বাসঘর, বাসহর	বাসঅর	—	বাসর
বিদ্যুৎ	বিজ্জু	বিজ্জু	—	বিজলী
বিভীতক	বিহিডঅ	বহেডা	—	বহেড়া
ব্যঙ্গ	বেঙ্গ	—	—	বেঙ্
ব্রাহ্মণ	বম্‌হণ	বম্‌হণ	বাম্‌হণ	বামন, বামুন
ভক্ত	ভত্ত	ভত্ত	—	ভাত
ভণ্ড	ভণ্ড, ভণ্ণ	ভণ্ণ	—	ভাঁড়, ভাণ
ভদ্রক	ভল্লঅ	ভল্লঅ	—	ভাল

সং	প্রা	অপ	প্রা-বা	আ-বা
ভ্রাতৃক	ভাইঅ	ভাইঅ	—	ভাই
মণ্ড	মণ্ড	*মণ্ণ	—	মাড়, মান (কচু)
মক্ষিকা	মচ্ছিআ	মচ্ছিঅ	—	মাছি
মধুরিকা	মহুরিআ	মহুরিঅ	—	মৌরী
মহন্ত+ইক	মাহিন্তী	মাইতি	—	মাইতি (পদবী)
মাতৃস্বস্থকা	মাউস্সসিঅ	মাউসিঅ	—	মাসী
মুকুল	মউল, বউল	মউল, বউল	—	মোল, বোল
মৃত	মট, মড	মড	মড়া	মড়া
মৃত্তিকা	মট্টিআ	মট্টিঅ	—	মাটি
ম্রক্ষতি	মক্খই	—	—	মাখে
রক্ষাপাল	রক্খাআল	রক্খআল	রাখোয়াল, রাখাল	
রশ্মি	রস্সি	রস্সি	—	রাশ, রাস
রাধিকা	রাহিআ	রাহিঅ	রাহী	রাই
শক্তুক	সত্তুঅ	ছত্তুঅ	—	ছাতু
শয্যা	সেজ্জা	সেজ্জ	সেজ	সেজ
শল্য	সেল্ল	সেল্ল	—	শেল
শল্যকরূপ	*সজ্জঅরূঅ	—	—	সজারু
শাব	ছাব, ছাঅ	ছাঅ	—	ছা
শৃঙ্গাতক / শৃঙ্গাটক	সিঙ্গাটক / সিঙ্গাডঅ	সিঙ্গাডা	—	সিঙ্গাড়া
শৃণোতি	স্থণদি, স্থণই	স্থণই	শুণই	শুনে, শোনে
শুক্তিকা	স্থক্কিআ	স্থক্কিঅ	—	শুকি, সিঁকি
শুষ্ক	স্থক্খ	স্থক্খ	স্থখা	শুখা, শুকো
শ্মশ্রু	ম্হচ্ছু	—	—	মোছ
সঙ্গ	সঙ্গ	—	সাঙ্গ	সঙ্
সংক্রম	সংকম	সংকবঁ	সাঙ্কব	সাঁকো
সংদংশিকা	সণ্ডংসিআ	সণ্ডংসিঅ	—	সাঁড়াশি
সপ্ততি	সত্তডি, সত্তরি	সত্তরি	—	সত্তর
সপ্তপর্ণ	সত্তপণ্ণ, ছত্তপণ্ণ	ছত্তঅণ্ণ	—	ছাতিম

সমর্পয়তি	সমপ্পেদি, সমপ্পেই	সবঁপ্পেই	সঁঅপই	সঁপে
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সঞ্ঝ	—	সাঁঝ
সামন্তরাজ	সামন্তরাঅ	সাবঁন্তরাঅ	সাবঁন্তরা	সাঁতরা (পদবী)
সামন্তপাল	সামন্তআল	সাবঁন্তআল	—	সাঁওতাল
স্কন্ধ	কন্ধ	কন্ধ	—	কাঁধ
স্কম্ভাগার	খম্ভাআর	—	—	খামার
সিংহ	সীহ	সীঅ	—	সী*(পদবী)
সিধ্যতে	সিজ্ঝই	—	—	সিঝে
সীমন্তিকা	সীমন্তিআ	সিঁঅন্তিঅ	—	সিঁতি
সূত্রধর	সুত্তধর, ছুত্তহর	ছুত্তঅর	—	ছুতার
স্নেহবৃত্ত	*ণেহবট্ট	ণেহঅট্ট	—	নেওটা
সৌভাগ্য	সোভগ্গ, সোহগ্গ	সোহগ্গ	—	সোহাগ
যবাগূ	জবাগূ, জআউ	জআউ	—	জাউ
যন্ত্র	জন্ত	জন্ত	—	জাঁতা
যুধ্যতি	যুঝই	—	—	জুঝে
রথ্যা	রচ্ছা, লচ্ছা	লচ্ছা	—	লাছ, নাছ
লঘুক	হলুক্ক	হলুক্ক	—	হালকা
হস্ত	হত্থ	হত্থ	হাথ	হাত্
হৃদয়	হিদয়, হিঅঅ, হিয়য়	হিঅঅ	হিঅঅ	হিআ, হিয়া

একত্রিংশৎ অধ্যায়

বাংলায় প্রচলিত ফারসী-আরবী শব্দ

(**তৎসৎ তুরকী** শব্দের) একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অছি<ওঅসী (wasī)
অছিলা<ওঅসীলহ্ (wasīlah)
অক্ত<ওঅক্ত্ (waqt)
আঙ্গুর<অঙ্গুর (angūr)
আন্দাজ<অন্দাজ (andāz)
আপশোশ<অফ্শোস (afsōs)
আবোয়াব<অব্ওয়াব (abwāb)
আলবৎ<অলবত্তহ্ (albattah)
আসল<অস্ল্ (asl)
আক্কেল<'অক্ল্ ('aq')
আর্দাস<'অরজ'-দস্ত ('arz-dast)
আয়না<অ'ইনহ্ (a'inah)
আমেজ<অমেজ (amēz)
আশনাই<আশনা'ই (āsnā'i)
আলাদা<'অলাহিদিহ্ ('alahidah)
আতর<'অত্র্ ('atr)
আখনী<ইঅখ্নী (yaxnī)
আখুঞ্জি<আখ্ন্দ-জী (āxwand-ji)
আচকান<অচ্কন (ackan)
আতশবাজী<আতশ-বাজী (ātas-bāzī)
আদব<আদব (ādab)
আনার<অনার (anār)

আকছার<'আকথর ('akθar)
আইন<আ'ইন (a'in)
আচকান<অচকন (ackan)
আঞ্জীর<অঞ্জীর (anjīr)
আমানৎ<অমানৎ (amānat)
আবলুস<অবনূস (abnūs)
আনার<অনার (anār)
আল্লা<অল্লাহ্ (Allāh)
আহাম্মক<অহ্মক্ (ahmaq)
আরজ<'অরজ' ('arz)
আবা<'অবা ('abā)
আয়মা<'আইম্মহ্ (a'immah)
আজব<'অজব ('ajab)
আফিম<অফ্য়ূম্ (afyūm)
আস্তে<আহিস্তহ্ (āhistah)
আয়েশ<'অইশ ('ays)
আখের<আখির (āxir)
আঞ্জম<অঞ্জাম (anjām)
আতর<'ইত্র্ ('itr)
আমল<'অমল ('amal)
আঙ্গুর<অঙ্গুর (angūr)
আমদানী<আমদনী (āmdanī)

আলেম<'আলিম ('ālīm)
আবকারী>আবকারি (ābkāri)
আমিন<অমীন (amīn)
আদমী<আদমী (ādami)
আবরু<আবরূ (āb-rū)
আবলুশ<অবনূস (abnūs)
আমেজ<আমেজ (amēz)
আফশোশ<অফ্সোস্ (afsōs)
আক্কেল<'অ ক্ল্ ('aql)
আজব<'অজব ('ajab)
আওয়াজ<অওআজ· (awāz)
আন্দাজ<অন্দাজ· (andaz)
আসবাব<অস্বাব (asbāb)
আপিং<অফ্ইয়ূম্ (afyūm)
আসমান<অশ্মান (asmān)
আকছার<অক্শর (aksar<akθar)
আশরফী<অশ্রফী (asrafī)
আহাম্মক<অহ্মক্ (ahmaq)
ইজার, এজার<ইজ·ার (izār)
ইজারা<ইজারহ্ (ijārah)
ইজ্জৎ<'ইজ্জত ('izzat)
ইদ, ঈদ<'ঈদ ('īd)
ইমাম<ইমাম (imām)
ইয়াদ<ইয়াদ (yād)
ইরান<ঈরান (īrān)
ইল্লাৎ<'ইল্লাৎ ('illat)
ইশাদী<ইশাদী (ishādi)
ইশারা<ইশরহ্ (isarah)
ইস্তফা<ইস্ত'ফা (ista'fa)
ইস্তাহার<ইস্তিহার (istihār)

উজবুক<উজ্•বক (uzbak)
উকীল<ওঅকীল (wokil)
উজীর<ওঅজ·ীর (wazīr)
উমেদার<উম্মেদ্বার (ummēdwar)
ওক্ত<ওক্ত্ (waqt)
ওকালৎ<ওকালৎ (wakālat)
ওজন<ওজ·ন্ (wazn)
ওজর<'উজ্র্ ('uzr)
ওজু<ওজ্ (wazū)
ওজুহাত<ওয়জূহাৎ (wajūhāt)
ওমরাহ<ওমরা' (umrā')
ওয়াজ<ওয়'জ (wa'z)
ওয়াকফ<ওক্ফ্ (waqf)
ওয়াকিফ<ওয়াকিফ (wāqif)
ওয়াদা<ওয়'দহ্ (wa'dah)
ওয়াপস<ওয়াপস (wāpas)
ওয়ারিশ<ওয়ারিশ (wāris)
ওয়াস্তা<ওয়াস্তহ্ (wāstah)
ওস্তাদ<উস্তাদ্ (ustād)
ওস্তাগর<উস্তাদ্-গর (ustād-gar)
ওসমান, উছমান<'উসমান (usmān)
ওয়ালী<ওয়লী (walī)
ওয়াশীল<ওয়াশিল (wāsil)
ওরফে<'উর্ফ্ ('urf)
একরার<ইক্রার (iqrār)
এক্তিয়ার<ইখ্তিয়ার (ixtiyār)
এজমাল<ইজমাল (ijmāl)
এজলাস<ইজ্লাস (ijlās)
এজার<ইজ·ার (izar)
এজাহার<ইজ·হার (izahār)

এত্তালা<ইতলা’ (itala’)
এলাহী<ইলাহী (ilāhī)
এলাকা<’ইলাকহ্‌ (’ilākah)
এলেম<’ইল্‌ম্‌ (’ilm)
কদম<কদম (qadam)
কদর<কদ্‌র্‌ (qadr)
কবচ<কব্‌জ· (qabz)
কবর<কব্‌র্‌ (qabr)
কম<কম্‌ (kam)
কর্জ<করজ· (karz)
করার<করার (qarār)
কসুর<কুসুর (qusur)
কসম<কস্‌ম্‌ (qasm)
কয়েদ<কইদ (qaid)
কলাই<কল’ই (qala`i)
কসাই<কসা’ই (qasā’i)
কলমা<কল্‌মহ্‌ (ka'mah)
কমবক্ত<কম্‌-বখ্‌ত (kam-baxt)
কবুল<কবূল (qabūl)
কসরৎ<কসরৎ (kasrat)
কাওয়ালী<কওওয়াল+ঈ (qawwāl+ī)
কানাৎ<কনৎ (qanat)
কাবাব<কবব্‌ (kabab)
কালন্দর<কলন্দর (qalandar)
কাগজ<কাগজ. (kagaz)
কামান<কমান (kamān)
কাদের<কাদির (qādir)
কানুন<কানুন (qānūn)
কাফের<কাফির (kāfir)
কাজী<কাজী kāzī)

কায়েম<কাইম (qā’im)
কায়দা<ক’ইদহ্‌ (qa’idah)
কাবুলী<কবুলী (kabulī)
কালিয়া<কল্যহ্‌ (kalyah)
কারিগর<কারীগর (karīgar)
কানুন গো<কানুন-গো (qanūn-gō)
কাঁচি<তুরকী কৈঞ্চী (qaincī)
কারদানী<করদনী (kardanī)
কিল্লা<কল্‌’অহ (qal’ah)
কিঙ্খাব<কম্‌-খ্‌বাব (kam-xwāb)
কিনারা<কিনারহ্‌ (kinārah)
কিম্মৎ<কিমৎ (qimat)
কিশমিশ<কিশমিশ (kismis)
কিস্তী<কিস্তী (kisti)
কুরনিশ<কূর্নিশ (kūrnis)
কুদরৎ<কুদরৎ (qudrat)
কুলুপ<কুল্‌ফ (qulf)
কুচ<কূচ (kūc)
কুস্তী<কুস্তী (kustī)
কেচ্ছা<কিশ্‌শহ্‌ (quissah)
কেতাব<কিতাব (kitāb)
কেল্লা<কিল্‌’অহ্‌ (qil’ah)
কৈফিয়ৎ<কৈফিয়ৎ (kaifiyat)
কোপ্তা<কোফ্‌তহ (kōftah)
ক্রোক<তুরকী কুরক্‌ (qurq)
কোরবানী<কুর্‌বানী (qurbānī)
কোমর<কমর (kamar)
খঞ্জর<খঞ্জর (xanjar)
খত<খত্ত্‌ (xatt)
খদ্দের<খরীদার (xarīdār)

খবর<খব্‌র (xabr)
খবীস<খবীস (xabis)
খরচ<খর্‌চ্‌ (xarc)
খয়রাত<খইরাত (xairāt)
খরিদ<খরীদ্‌ (xarīd)
খয়ের খাঁ<খইর-খ্বাহ্‌ (xair-xwāh)
খরগোস<খর-গোস্‌ (xar-gōs)
খসড়া<খস্‌রহ্‌ (xasrah)
খলিফা<খলীফহ্‌ (xalīfah)
খসম<খস্‌ম্‌ (xasm)
খাতা<খত্ত্‌হা (xatt-hā)
খাজা<খ্বাজহ্‌ (xwājah)
খাজনা<খজানহ্‌ (xazānah)
খালাস<খলাস (xalās)
খাস<খাস (xās)
খাতির<খাতির (xātir)
খানকী<খানহ্‌-গী (xānah-gī)
খাক<খাক্‌ (xāk)
খামকা<খ্বাহ্‌-ম-খ্বাহ্‌ (xwāh-ma-xwāh)
খাজাঞ্চি<খজান-চী (xazān-cī)
খাস্তা<খ্বাসতহ (xwāstah)
খারিজ<খারিজ (xārij)
খানসামা<খান-ই-সামন্‌ (xān-i-sāman)
খাপ্পা<খফা (xafā)
খাসী<খস্‌সী (xassī)
খারাপ<খরাব (xarāb)
খাঁ<খান (xān)
খুস্কি<খুস্‌ক (xusk)
খুব<খুব (xūb)
খুন<খূন (xūn)
খুশী<খুশ্‌+ঈ (xūsī)
খেজমৎ<খিদ্‌মৎ (xidmat)
খেয়াল<খিয়াল (xiyāl)
খেলাৎ<খিল্‌'অৎ (xil'at)
খেসারৎ<খিসারৎ (xisārat)
খোদ<খুদ (xud)
খোদা<খুদা (xudā)
খোয়ার<খ্বার (x'wār)
খোয়াব<খ্বাব (xwāb)
খোস, খুশী<খুশ্‌, খুশী (xūs, xūsī)
খোসা<কুস্‌হ (kusah)
খোসামোদ<খোশ্‌-আমদ্‌ (xōs-āmad)
খোলসা<খুলাসহ (xulāsah)
খোন্দকার<খ্বন্দ্‌-কার (xwand-kār)
গজ<গজ় (gaz)
গজল<গজ়ল (gazal)
গরজ<গরজ় (garz)
গলদ<গল্‌ত্‌ (ga't)
গরম<গর্‌ম্‌ (garm)
গরীব<গরীব (garīb)
গর্দা<গর্দহ্‌ (gardah)
গাওয়া<গুওয়াহ (guwāh)
গাজী<গাজী (gāzī)
গালিচা<গালীচহ্‌ (gālicah)
গুজরান<গুজরান (gujrān)
গুনোগার<গুনাহ্‌-গার (gunāh-gār)
গুম্বজ<গুম্বজ (gumbaz)
গৈবী<গৈবী (gaibī)
গোমস্তা<গুমাস্তহ্‌ (gumāstah)
গোসা<গুস্‌সহ্‌ (gussah)

গোঁতা<গউৎ (gaut)
গোস্ত্<গোস্ত্ (gost)
গোলাম<গুলাম (gulām)
গোমরা<গহ্ওয়ারহ্ (gahwārah)
গোর<গোর (gōr)
গোল<গোল (gōl)
গোলাপ<গুলাব (gul-āb)
গোণা<গুনাহ্ (gunāh)
চকমকী<তুরকী-চক্মাক্ (caqmaq)
চরখা<চরখহ্ (carxah)
চর্বী<চরবী (carbī)
চশম<চশ্ম্ (casm)
চাকু<চাকু (cāqū)
চাকর<চাক্র্ (cākr)
চাকরান<চাকরান (cākarān)
চাপকান<চপ্কন (capkan)
চাবুক<চাবুক (cābuk)
চীজ<চীজ (cīz)
চেহারা<চিহ্রহ্ (cihrah)
চেরাগ<চিরাগ (cirāg)
চোগা<চোগহ্ (cōgah)
চোস্ত<চুস্ত্ (cust)
চৌবাচ্চা<চৌবচ্চহ্ (caubaccah)
ছবি<শবীহ্ (sabīh)
ছয়লাপ<সইল-আব (sail-āb)
ছানি<সানী (sānī)
ছিরকা, শিরকা<সিরকহ্ (sirkah)
ছিলিম<চিলম্ (cilam)
জখম<জখ্ম্ (zaxm)
জবান<জবান (zabān)

জবাব<জওয়াব্ (jawāb)
জমা<জম্ (jam')
জমায়েৎ<জমাঅ'ৎ (zamā'at)
জমী<জমীন্ (zamīn)
জবাই<জবিহ্ (jabih)
জরিমানা<জর্-মানহ্ (jar-mānah)
জরী<জরী (zarī)
জলদী<জলদী (jaldī)
জলদ<জল্দ্ (jald)
জহর<জওহর (jauhar)
জহরৎ<জওআহিরাৎ (jawāhirāt)
জঙ্গ<জঙ্গ (jang)
জব্দ<জব্ত্ (zabt)
জলুশ<জলুশ (jalūs)
জরুরী<জরুরী (zarūrī)
জাহাজ<জাহাজ (jahāz)
জাহান্নম<জহন্নুম (jahannum)
জাফরান<জা'ফরান (za'fran)
জায়গা<জাএগাহ্ (jāēgāh)
জায়গীর<জাএগীর (jāēgīr)
জাস্তি<জিয়াদতী (ziyādatī)
জাহির<জাহির (zāhir)
জান<জান (jān)
জামা<জামহ্ (jāmah)
জাল<জ'ল (ja'l)
জালা<জর্রহ্ (jarrah)
জায়<জায় (jāy)
জ্যায়দা<জিয়াদহ্ (ziyādah)
জালিয়াৎ<জ'আলিয়াৎ (za'āliyat)
জিগির<জিগ্র্ (jigr)

জিন<জীন (zīn)
জিনিষ<জিন্স (jins)
জিদ<জিদ্দ্ (zidd)
জিঞ্জির<জিঞ্জির (zinjir)
জিলা<জিলা' (zi'a')
জিম্মা—জিম্মহ্ (zimmah)
জুলুম<জুল্ম্ (zulm)
জুলপী<জুল্ফ্ (zulf)
জের<জের (zēr)
জেল্লা<জিল্লা (jillā)
জেরা<জরা (zarā)
জেনানা<জনান্হ (zanānah)
জেব<জয্ব্ (jayb)
জেহাদ<জিহাদ (jihād)
জোব্বা<জুব্বহ্ (jubbah)
জোলাপ<জুলাব (julāb)
জোয়ান<জওয়ান (jawān)
জোর<জোর (zōr)
ডিহি<দিহ্ (dih)
ডেকচী<তুরকী দেগ্চী (dēg-ci)
ডেগ<দেগ (deg)
তকরার<তকরার (takrār)
তকমা<তুরকী তম্গহ্ (tamgah)
তকলিব<তক্লিফ্ (taklif)
তক্ত<তখ্ত্ (taxt)
তদারক<তদারুক (tadāruk)
তন্‌কা<তন্খ্বাহ্ (tanxwāh)
তবলা<তবলহ্ (tablah)
তবক<তবক্ (tabaq)
তরফ<তরফ (tarf)

তফসীল<তফ্শীল (tafsil)
তর, তারা<তরহ্ (tarah)
তবিয়ত<তবী'অৎ (tabī'at)
তহবিল<তহ্ওঈল্ (tahwīl)
তরাজু<তরাজু (tarāzū)
তফাৎ<তফাওউৎ (tafāwut)
তছরুপ<তস্সর্রুফ্ (tassarruf)
তছনছ<তহ্স্-নহ্স (tahs-nabs)
তলব<তলব (talab)
তমঃস্থক<তমস্সুক (tamassuk)
তহশীল<তহ্শীল (tahsil)
তক্তা<তখ্তহ (taxtah)
তম্বি<তন্বিহ্ (tanbih)
তাকাবী<তকাবী (taqāwī)
তাকিয়া<তক্যহ্ (takyah)
তাহাম<তমাম্ (tamām)
তালাক<তালাক (tālāq)
তামাদী<তমাদী (tamādi)
তাজা<তাজহ্ (tāzah)
তাজিয়া<তজ্যহ্ (tazyah)
তালিম<ত'লীম, (ta'lim)
তাগুৎ, তাকৎ<তাকৎ (tāqat)
তাবিজ<ত'ওইজ (ta'wiz)
তালাশ, তল্লাস>তলাশ (talās)
তাগিদ<তাকীদ (taxīd)
তাগাদা<তকাদা (taqādā)
তাঁবে<তাবি' (tabi')
তামিল<ত'মিল (ta'mil)
তাউস<তা'উস (ta'us)
তাজ<তাজ (tāj)

তাজ্জব<ত'অজ্জুব (ta'ajjub)
তারিখ<তারিখ্ (tārix)
তাইৎ<তা'ঈদ্ (tāid)
তামাসা<তমাশহ্ (tamāsah)
তাপ্তা<তফ্তহ্ (taftah)
তীর<তীর (tīr)
তুরপুন<তুরফান (turfān)
তুরুক<তুরক্ (turq)
তুফান (tufān)
তৈয়ার<তইয়ার (taiyār)
তোষক<তোশক (tosak)
তোয়াক্কা<তওঅক্কু' (tawaqqu')
তোবা<তোবহ্ (tobah)
তোক<তোক (toq)
তোতা<তোতা (totā)
তোপ<তোপ (tōp)
তোড়া<তুর্রহ (turrah)
তৌজি<তউজীহ্ (taujih)
দফা<দফ'হ্ (dafa'h)
দরকার<দরকার (darkār)
দরিয়া<দরিয়া (daryā)
দরাজ<দরাজ (darāz)
দরগা<দরগাহ (dargāh)
দরদ<দর্দ্(dard)
দরখাস্ত<দর্-খ্বাস্ত (dar-xwāst)
দরবেশ<দর্ওয়েশ (darwēs)
দস্তখত<দস্ত-খত্ (dast-xatt)
দস্তুর<দসতুর (dastūr)
দহরম মহরম<দর-হম বর-হম্ (dar-ham, bar-ham)

দজ্জাল<দজ্জাল (dajjāl)
দস্তাবেজ<দস্তাওয়েজ (dastāwēz)
দাবী<দ'ওঈ (da'wī)
দামামা<দমামহ্ (damāmah)
দালাল<দল্লাল্ (dallāl)
দারোগা<দারোগহ্ (dārōgah)
দায়ের<দায়ের (dāyēr)
দাদখানি<দা'উদ-খানী (dāu'd-xānī)
দানা<দানহ্ (dānah)
দাওয়াই<দওয়া' (dawā')
দারু<দারূ<(dārū)
দিল<দিল (dil)
দীন<দীন (dīn)
দুনিয়া<দুন্যা (dunyā)
দুরবীন<দূর-বীন (dūr-bīn)
দুম্বা<দুম্বহ্ (dumbah)
দুষমন<দুশমন (dusman)
দেওয়ান<দীওয়ান (dīwān)
দেওয়াল<দীওয়াল (dīwāl)
দেমাক<দিমাগ্ (dimāg)
দোকান<দুকান (dukān)
দোয়া<দু'আ (du'ā)
দোরস্ত<দুরুস্ত্ (durust)
দৌলৎ<দৌলৎ (daulat)
নকর, নোকর<নউকর (naukar)
নকাশী<নক্কাশ্+ঈ (naqqās+i)
নজর<নজ্র্ (nazr)
নবাব<নওয়াব (nawāb)
নমাজ<নমাজ (namāz)
নহবৎ<নউবৎ (naubat)

নরম<নর্ম্ (narm)
নবিশ<নবীশ (navis)
নহর<নহ্র্ (nahr)
নজদিক<নজদিক (nazdik)
নগদ<নক্দ্ (naqd)
নসীব<নসীব (nasib)
নসীপুর<নসীবপুর (nasibpur)
নাকচ<নাকিস (naqis)
নাজির<নাজির (nāzir)
নালিশ<নালিশ (nālis)
নাবালক<নাবালিগ (nābālig)
নায়েব<না'ইব (nā'ib)
নাজেহাল<নজ'-হাল (naz'-hāl)
নাগরা<নক্করাহ্ (naqqarāh)
নাশপাতি<নাশপাতি (nāspāti)
নিকা<নিকাহ্ (nikāh)
নিশাদল<নউশাদুর (nausādur)
নিশান<নিশান (nisān)
নিরিখ<নির্খ্ (nirx)
নিয়ামৎ<নি'মৎ (ni'mat)
নিমকী<নমকীন (namakin)
নূর<নূর (nūr)
নেমক<নমক (namak)
নেকরা<নক্রহ্ (naxrah)
নেক<নেক (nēk)
নোক্তা<নুক্তহ্ (nuqtah)
পছন্দ<পসন্দ্ (Pasand)
পনীর<পনীর (panir)
পয়মাল<পইমাল (pai-māl)
পয়গম্বর<পইগম্বর (paigambar)
পরওয়ানা<পরওয়ানহ্ (parwānah)
পশম<পশ্ম্ (pasm)
পাঁজা<পজাওহ্ (pazāwah)
পাইকার<পাইকার (pāikār)
পায়া<পায়হ্ (pāyah)
পায়খানা<পই-খানহ্ (pai-xānah)
পিয়াজ<পিয়াজ (piyāz)
পেশোয়াজ<পেশওয়াজ (pēswāz)
পিলখানা<পীল-খানহ্ (pīl-xānah)
পিলসুজ<ফতিল-সোজ (fatil-sōz)
পীর<পীর (pir)
পেঁচ<পেচ (pēc)
পেশ<পেশ (pēs)
পেশা<পেশহ (pēsah)
পেয়ালা<পিয়ালহ্ (piyālah)
পোক্ত<পুখ্ত্ (puxt)
পোলাও<পলাও (palāw)
পোস্তা<পুশ্তহ্ (pustah)
পোদ্দার<ফোতহ্-দার (fotah-dār)
ফকির<ফকীর (faqir)
ফতে<ফত্হ্ (fath)
ফতুই<ফতোই (fatōi)
ফর্দ<ফর্দ্ (fard)
ফর্মান< (farmān)
ফরমাস<ফরমাঈ'স (farmāi's)
ফরিয়াদ<ফর্ইয়াদ (faryād)
ফলানা<ফুলান (fulān)
ফস্ত<ফস্দ্ (fasd)
ফলসা<ফাল্সহ্ (fālsah)
ফয়সলা<ফইসলহ্ (faisalah)

ফসল<ফস্‌ল্ (fasl)
ফাজিল<ফাজিল (fāzil)
ফায়দা<ফা'ইদহ্ (fā idah)
ফানুস<ফানূস (fānūs)
ফারাক<ফর্‌ক্ (farq)
ফিকির<ফিক্‌র্ (fiqr)
ফিরিস্তি<ফিহ্‌রিস্ত্ (fihrist)
ফিরোজা<ফীরোজহ্ (firōzah)
ফুরসৎ<ফুর্‌সৎ (fursat)
ফেরার<ফিরার (firār)
ফেরেব<ফরেব (fareb)
ফেসাদ<ফসাদ (fasād)
ফোয়ারা<ফও্‌ওয়ারহ্ (fawwārah)
ফৌজ<ফউজ (fauj)
ফৌৎ<ফউৎ (faut)
বকশিশ<বখ্‌শীশ্ (baxsīs)
বখেয়া<বখ্‌য়হ্ (baxyah)
বগল<বগল (bagal)
বজায়<বজাএ (bajā-ē)
বন্দুক<বন্দূক (bandūq)
বকরীদ<বক্‌র্-'ঈদ (baqr-'id)
বরকন্দাজ<বরক্-অন্দাজ (barq-andāz)
বরফ<বর্‌ফ্ (barf)
বল্লম <বহ্‌লম (bahlam)
বহাল<বহাল (bahāl)
বক্তিয়ার<বখ্‌ত্যার (bakhtyār)
বক্‌সিস<বখ্‌শীশ্ (baxsīs)
বদল<বদল (badal)
বরদাস্ত<বর্-দাস্ত্ (bar-dāst)
বয়েদ<বইৎ (bait)
বর্গী<বার্গির (bārgir)
বন্দোবস্ত<বন্দোবস্ত্ (bandōbast)
বহর<বহ্‌র্ (bahr)
বরবাদ<বরবাদ (barbād)
বস্তা<বস্‌তহ্ (bastah)
বজ্জাৎ<বদ্-জাৎ (bad-zāt)
বাগিচা<বাগ্‌চহ্ (bāgcah)
বাগান<বাগওয়ান (bāgwān)
বাবুরচী (bavarcī)
বাহাদুর<বহাদুর (bahādur)
বাকী<বাকী (bāqī)
বাবদ<বাবৎ (bābat)
বাদ<ব'দ (b'ad)
বাজু<বাজু (bāzū)
বাজ<বাজ (bāz)
বালাপোষ<বালাপোশ (bālāpōs)
বালাই<বলা (balā)
বান্দা<বন্দহ্ (bandah)
বাহার<বহার (bahār)
বায়না<বহানহ্ (bahānah)
বায়া<বায়ি' (bāyi')
বিদায়<বিদা' (widā')
বিলাত্<বিলায়ৎ (wilāyat)
বীমা<বীমহ্ (bimah)
বুনিয়াদ<বুন্‌ইয়াদ্ (bunyād)
বুলবুল<বুলবুল (bulbul)
বুজরুক<বুজুর্‌গ্ (buzurg)
বুরুজ<বুর্‌জ্ (burj)
বোঁচকা<তুরকী বুগ্‌চহ্ (bugcah)
বেকুব<বে-ওউক্‌ফ্ (bē-wuqf)

বেহুঁশ<বে-হোশ (bē-hos)
বেমক্কা<বে-মউক্‌'অহ্‌ (bē-mauq'ah)
বেচারা<বেচারহ্‌ (becārah)
বেলোয়ারী<বিল্লউরী (billauri)
বোঁচকা<তুরকী বুগ্‌চহ্‌ (bugcah)
মকস্‌<মস্‌ক্‌ (masq)
মকবুল<মক্‌বুল (maqbūl)
মগজ<মগ্‌জ্‌ (magz)
মজুর<মজদূর (mazdūr)
মক্কেল<মু'অক্‌কল (mu'aqqal)
মনিব<মুনীব (munib)
মজুদ<মউজুদ (maujūd)
ময়দা<মইদহ্‌ (maidah)
ময়দান<মইদান (maidān)
মফঃস্বল<মুফস্‌সল্‌ (mufassal)
মতন<মত্‌ন্‌ (matn)
মস্করা<মস্‌খরহ্‌ (masxarah)
মহল<মহ্‌ল্‌ (mahl)
মশলা<মসালহ্‌ (masālah)
মশাল<মশ্‌'অল (masa'l)
মহকুমা<মহ্‌কুমহ্‌ (mahkumah)
মলম<মর্‌হম (marham)
মছলন্দ<মছ্‌নদ্‌ (masnad)
মজা<মজা (mazā)
মজবুদ<মজবুৎ (mazbūt)
মগজ<মগ্‌জ্‌ (magz)
মরিচা<মূর্‌চহ্‌ (mūrcah)
মর্দ<মর্‌দ্‌ (mard)
মনক্কা<মুনক্‌কা (munaqqā)
মানা<মন' (mana')

মানে<ম'আনী (ma'ānī)
মাল্লা<মল্লাহ্‌ (mallāh)
ম'ত<মঅ'অত (ma'ata)
মাতবর<মু'অৎবর (mu'atbar)
মামলা<মু'আমলহ্‌ (mu'ām'ah)
মাহিনা<মাহ্‌-আনহ্‌ (māh-ānah)
মাফিক<মুওয়াফিক্‌ (muwāfiq)
মারফৎ<ম'র্‌ফৎ (ma'rfat)
মালেক<মালিক (mālik)
মাশুল<মশুর্‌ (mashur)
মিছিল<মিস্‌ল্‌ (misl)
মিহি<মহীন্‌ (mahīn)
মিয়াঁ<মিয়ান্‌ (miyān)
মুচ্ছুদ্দী<মুতসদ্‌দী (mutasaddi)
মুদ্দই<মুদ্দ'ঈ (muddaī)
মুরোদ<মুরাদ (murād)
মুর্দাফরাস<মুর্দহ্‌+ফরোশ (murdah+farōs)
মুন্সেফ<মুন্‌সিফ্‌ (munsif)
মুফৎ<মুফৎ (mufat)
মুলুক<মুল্‌ক্‌ (mulk)
মুরুব্বী<মুরব্বী (murabbi)
মুহুরী<মুহর্‌রির্‌ (muharrir)
মুসাবিদা<মুসব্বদহ্‌ (musavvadah)
মুনাফা' (munafa')
মুলতবী<মুলতবী (multavi)
মেজাজ (mizāj)
মেরামৎ<মরম্মৎ (marammat)
মেহনৎ<মিহ্‌নৎ (mihnat)
মেহেরবাণী<মিহ্‌র্‌বাণী (mihrbānī)

মেথর<মিহ্তর (mihtar)
মেরাপ<মিহ্রাব (mihrāb)
মেওয়া<মেওয়া (mēwāh)
মোকাম<মুকাম (muqām)
মোকদ্দমা<মুকদ্দমহ্ (muqaddamah)
মোকরুরী<মুকর্-ররী (muqar-rari)
মোক্ষম<মুহ্কম (muhkam)
মোরগ<মুর্গ্ (murg)
মোহম্মদ<মুহম্মদ (muhammad)
মোদ্দা<মুদ্দ'আ (mudda'ā)
মোনফা<মুনফা (munafa')
মোহর<মুহ্র (muhr)
মোল্লা<মুল্লা (mullä)
মোম<মোম (mom)
মোহরম<মুহর্রম্ (muharram)
মোকরর<মুকর্রর্ (muqarrar)
মোকুব<মউকুফ (mauqūf)
মৌজা<মৌজ' (mauza')
মৌলবী<মউলবী (maulavi)
মৌসুম<মউসিম (mausim)
মৌরুশী<মৌরূশী (maurūsi)
রপ্তা<রব্ত্ (rabt)
রফা<রফ্ (raf')
রমজান<রমজান (ramazān)
রসদ<রসদ্ (rasd)
রসীদ<রসীদ (rasid)
রদ্দী<রদ্দী (raddi)
রবাব<রবাব (rabāb)
রাহা<রাহ (rāh)
রাহাজানী<রাহ-জানী (rāh-zāni)

রায়<রায় (rāy)
রায়ৎ<র'অয়্যৎ (ra'ayyat)
রিপু<রফূ (rafū')
রুমাল<রূমাল (rū-mäl)
রুজু<রুজূ' (rujū')
রেশম<রেশম (rēsam)
রোজ<রোজ (rōz)
রোয়াক<রওয়াক্ (rowāq)
রোশনী<রোশনী (rōsani)
রোশনাই<রোসনাই (rōsanāi)
লক<নথ্ (nax)
লঙ্গর<লঙ্গর (langar)
লবেজান<লব্+জান্ (lab+zān)
লস্কর<লশ্কর (laskār)
লহমা<লম্হহ্ (lamhah)
লাগাম<লগাম (lagām)
লাগাৎ<লগায়ৎ (lagäyat)
লায়েক<লা'ইক (laī'q)
লাল<ল'ল (la'l)
লাস<লাশ (lās)
লোকসান<নুকসান (muqsān)
শক্ত<সক্ত্ (saxt)
শর্ত<সর্ত্ (sart)
শরম<শর্ম্ (sarm)
শহর<শহ্র (sahr)
শয়তান<শইতান (saitān)
শরাপ<শরাব (sarāb)
শনাক্ত<শিন্কত্ (sinaxt)
শা<শাহ্ (sāh)
শানাই<শহ্না'ই (sah-nā'i)

শামিয়ানা<শাম্‌-আনহ্‌ (sām-ānah)
শিরপেঁচ<সর-পেচ (sar-pēc)
শিন্নি<শিরনী (sirnī)
শেখ<শইক্‌ (saix)
সই<সহীহ্‌ (sahih)
সওগাৎ<সওগাৎ (saugāt)
সওদা<সওদাহ্‌ (saudāh)
সওয়ার<অসবারি (asabāri)
সকলাত<সকলাত (saqalāt)
সওয়াল<সওয়াল (sawāl)
সখ<সউক্‌ (sauq)
সফেদ<সফেদ (safēd)
সন<সন (san)
সনদ<সনদ (sanad)
সনাক্ত<সিনাকৃত (sināxt)
সদর<সদর্‌ (sadr)
সতরঞ্চি<শতরঞ্জী (satranji)
সরকার<সরকার (sarkār)
সরবৎ<সরবৎ (sarbat)
সরাই<সরা'ঈ (sara'i)
সরবরাহ<সর-বরাহ্‌ (sar-barāh)
সরখেল<সর-খেল (sar-xēl)
সর্দার<সরদার (sardār)
সহবৎ<সুহ্‌বৎ (suhbat)
সবুর<সব্‌র্‌ (sabr)
সাজা<সজা (sazā)
সাফ<সাফ (sāf)
সাবুদ<শবুৎ (sabūt)
সানক<সহ্‌নক (sahnak)
সানকী<সহ্‌নক (sahnak)

সায়েব<সাহিব (sāhib)
সারেং<সর-হঙ্গ (sar-hang)
সাবেক<সাবীক (säbiq)
সাবাশ<শবাশ (sabās)
সালিস<শালিশ (sālis)
সিক<সীক (six)
সিন্দুক<সিন্‌দূক (sin-dūk)
সুদ<সুদ (sūd)
সুবা<সুবহ্‌ (subah)
সুরকি<সুরখ্‌ (surx)
সুরাক<সুরাগ (suräg)
সুপারিশ<সিফরিশ (sifaris)
সেপাই<সিপাহী (sipähi)
সেরেস্তা<সর্‌রিশ্‌তহ্‌ (sarristah)
সেরেফ<সিরফ্‌ (sirf)
সেলাম<সলাম (saläm)
সোপর্দ<সুপুর্দ (supurd)
সোরাই<সুরাহী (surähi)
সৌখীন<সোকীন (sauqīn)
হক<হক্‌ক্‌ (haqq)
হজম<হজ্‌ম্‌ (hazm)
হদ্দ<হদ্দ্‌ (hadd)
হরফ<হর্‌ফ্‌ (harf)
হাউই<হওআঈ (hawäi)
হাওদা<হউদহ (haudah)
হাওয়া<হওআ (hawä)
হাকিম<হাকিম (häkim)
হাজৎ<হাজৎ (häjat)
হাজাম<হজ্জাম (hajjäm)
হাজার<হজার (hazär)

হাজির<হাজির (hāzir)
হাঙ্গামা<হঙ্গামহ (hangämah)
হাফেজ (häfiz)
হাবেলী<হওয়েলী (hawēli)
হাবসী<হাব্সী (habsī)
হামলা<হম্লহ্ (hamlah)
হামেশা<হামেশহ্ (hamēsah)
হামান দিস্তা<হাওন-দস্তহ্ (hāwan-dastah)
হারাম<হরাম (harām)
হালাল<হলাল (halāl)
হাল<হাল (hāl)
হালদার<হওয়ালহ্-দার (hawālah-dār)
হালুই<হল্ওয়াই (halwāi)
হিসাব<হিসাব (hisāb)
হিসাবী<হিসাবী (hisābī)
হুকা<হুক্কহ্ (huqqah)
হুকুম<হুক্ম্ (hukm)
হুজুর<হজুর (hazur)
হুলিয়া<হুলাহ্ (hulyah)
হুঁস<হোশ্ (hōs)
হুঁসিয়ার<হোশ্যার (hōsyār)
হেস্তনেস্ত<হস্ত্-নীস্ত্ (hast-nīst)
হৌজ<হউজ্ (houz)

বাংলায় গৃহীত পোর্তুগীজ শব্দ

আচার (achar)
আতা (ata)
আনারস (annanas)
আলকাৎরা (alcatrao)
আলপিন (alfinete)
আলমারী (almario)
আয়া (aia)
ইস্পাৎ (espada)
ইস্তিরি (estirar)
ওলন্দাজ (Hollandez)
কপি (couve)
কাকাতুয়া (cacatu)
কাজু (caju)
কাতান (catana)
কানাস্তারা (canastra)
কাফি (cafe)
কাফরি (cafre)
কাবার (cabar)
কামরা (camara)
কাপ্তেন (capitao)
কালাপাতি (calafate)
কেদারা (cadeira)
কেরানী (carrane)
খানা (cano)
গরাদে (grade)
গস্ত (gasto)
গামলা (gamella)
গুদাম (gudão)
চাবি (chave)
জানালা (janella)

জোলাপ (jalapa)
টোকা (touca)
তামাক (tabaco)
তিজেল (tigela)
তোয়ালে (toalha)
তোলা (talha)
নীলাম (leilão)
নোনা (anona)
পরাত (prato)
পাউ (pão)
পাচার (Passar)
পাদ্রি (padre)
পিপা (pipa)
পিরিচ (pires)
পিস্তল (pistola)
পেঁপে (papaia)
পেয়ারা (peara)
পেরেক (prego)
ফর্মা (forma)
পেরু (peru)
ফিতা (fita)
ফাল্‌তো (falto)
বরগা (verga)
বাণ্ডেল (Bandel)
বালতি (balde)
বারান্দা (varanda)
বাসন (basia)
বিন্‌তি (vinte)
বিস্কুট (biscoito)
বেসালি (vasilha)
বেহালা (viola)
বৈয়াম (boião)
বোতল (botelha)
বোতাম (botão)
বোমা (bomba)
বোম্বেটে (bombardeiro)
মস্করা (mascara)
মার্কা (marca)
মাস্তল (mastro)
মিস্ত্রি (mestre)
মেজ (mesa)
রেস্ত (resto)
লবেদা (loba+abada)
সাঁতরা (cintra)
সাগু (sagu)
সাবান (sabao)
সায়া (saia)
সালসা (salsa)
স্বরতি (sorte)
হারামদ (armada)

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

পরিভাষা

A

Ablaut—অপশ্রুতি
Accent—ঝোঁক, স্বরাঘাত
Accentuation—স্বরচিহ্ন
Acute—উদাত্ত
Acoustic—শ্রুতিগত
Acoustics—শ্রুতিবিজ্ঞান
Adam's apple—কণ্ঠমণি
Affirmative—অস্ত্যর্থক
Affix—প্রত্যয়
Affricate—ঘৃষ্ট
Agglutinating—সংযোগমূলক, সমাসাত্মক
Allophone—অন্তরধ্বনি, সহধ্বনি, পূরকধ্বনি
Allophonic—পূরকধ্বনি জাত, সহধ্বনি জাত
Allomorph—সহরূপমূল
Allomorphic—সহরূপমূলীয়
Alphabet—বর্ণমালা
Alphabetic Script—ধ্বনিমূলক লিপি
Alveolae—দন্তমূলসমূহ
Alveolar—দন্তমূলীয়
Alveolo-palatal—দন্তমূলীয়-তালব্য
Alveolo-retroflex—দন্তমূলীয় মূর্ধন্য
Analogy—সাদৃশ্য
Analogical—সাদৃশ্য জাত
Analysis—বিশ্লেষণ
Analytical—বিশ্লেষণমূলক
Anaptyxis—বিপ্রকর্ষ, স্বরভক্তি
Antecedent—পূর্বপদ
Anthropology—নৃতত্ত্ব
Aphesis—আদিস্বরলোপ
Apex—জিহ্বাগ্র
Apical—জিহ্বামুখ্য
Apocope—অন্ত্যবর্ণলোপ
Archaic—অপ্রচলিত
Archæology—পুরাতত্ত্ব
Article—উপশব্দ
Articulation—উচ্চারণ
Articulator—উচ্চারক
Assibilation—সকারীভবন
Assimilation—সমীভবন; সমীকরণ
Association—অনুষঙ্গ
Assonance—ধ্বনিসাম্য
Aspirate—মহাপ্রাণ
Aspirated—মহাপ্রাণিত
Attributive use—বিশেষণমূলক প্রয়োগ

B

Back Vowel—পশ্চাৎ স্বরধ্বনি
Back of the tongue—পশ্চাৎ জিহ্বা
Base—পদমূল, শব্দমূল
Bar—পর্ব
Beat—পর্বাংশ
Bilabial—ওষ্ঠ্য
Bilingual—দ্বিভাষী
Blade of the tongue—জিভের ডগা
Barrowed—কৃতঋণ, অনুকৃত
Breathed—অঘোষ
Broad transcription—ধ্বনি প্রতিলিপি
Bronchial tubes—শ্বাসনালী

C

Cacuminal—মূর্ধন্য
Cæsura—যতি
Cardinal Vowel—মৌলিক স্বরধ্বনি
Central Vowel—কেন্দ্রীয় স্বর
Cerebral—মূর্ধন্য
Cerebralization—মূর্ধন্যীভবন
Chronological—কালানুক্রমিক
Circumflex—স্বরিত
Clear sound—স্বচ্ছধ্বনি
Clicks—শীৎকার, কাকুধ্বনি
Closed—সংবৃত
Close sequence—অন্তর্বর্তী ক্রম
Cluster—গুচ্ছ
Cognate—সমগোত্রজ
Cognate Object—সম-ধাতুজ কর্ম
Colloquial—কথ্য
Commentary—ভাষ্য
Compactness—সংহতি
Comparative Grammar—তুলনামূলক ব্যাকরণ
Comparative Philology—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব
Compensotory lengthening—পরিপূরক দীর্ঘত্ব
Compound—যৌগিক, সমাসবদ্ধ
Compounded roots—সংযোগমূলক ধাতু
Copulative Compound—সংযোগমূলক সমাস
Complement—পরিপূরক
Complementary distribution—পরিপূরক অবস্থান
Compound Verbs—যৌগিক ক্রিয়া
Comprehensive—সামগ্রিক
Concave—অবতল
Concord—সমন্বয়
Conditional—আপেক্ষিক
Connected speech—বাক্ প্রবাহ
Conjuncts—সংযুক্ত বর্ণ
Consonant Cluster—সংযুক্ত ব্যঞ্জন
Contact—সংস্পর্শ
Contamination—মিশ্রণ
Contex—প্রসঙ্গ
Content—বিষয়বস্তু
Continuant—প্রলম্বিত ধ্বনি
Continuous—অসম্পন্ন বর্তমান

Contour—ধ্বনিরেখ ভঙ্গী
Contraction—সংকোচ
Copula—সংযোজক
Cuneiform—বাণমুখ লিপি

D

Dark sound—গম্ভীর ধ্বনি
De-aspirated—মহাপ্রাণ-হীনতা
Definite article—নির্দেশক সংখ্যা
Dental—দন্ত্য
Dentilabial—দন্তৌষ্ঠ্য
Derivative roots—সাধিত ধাতু
Descriptive—বর্ণনামূলক
Descriptive Compound—কর্মধারয় সমাস
Descriptive Grammar—বর্ণনামূলক ব্যাকরণ
Determinative Compounds—ব্যাখ্যানমূলক সমাস
Devocalization—অঘোষীভবন
Diachronic Linguistics—বিবর্তন-মূলক ভাষাতত্ত্ব
Diacritic mark—অতিরিক্ত চিহ্ন
Dialectology—উপভাষাতত্ত্ব
Dialect Geography—উপভাষা সম্বন্ধীয় ভূগোল
Diminutive—সংকোচক
Dipthong—সন্ধ্যক্ষর, যৌগিক স্বর
Dissimilation—বিষমীভবন
Distich—দ্বিচরণ শ্লোক
Disyllabic—দ্ব্যক্ষরিক
Distribution of sound—ধ্বনির অবস্থান
Dorsal—পশ্চাজিহ্ব্য
Dorso-Alveolar—প্রশস্ত দন্তমূলীয়
Doubling—দ্বিত্বীভবন
Doublet—যমজ
Double sound change—দ্বিমুখী ধ্বনিপরিবর্তন

E

Element—উপাদান
Elision—লোপ
Epenthesis—অপিনিহিত
Epigram—প্রবচন
Ethonology—নৃতত্ত্ব
Etymology—ব্যুৎপত্তি তত্ত্ব
Euphemism—স্বভাষণ
Euphony—অনুরণন
Euphonic Combination—সন্ধি
Explosion—স্ফুরণ
External juncture—বহিঃসন্ধি
Extension—সম্প্রসারণ

F

Falling—স্বরিত
Flapped sound—তাড়নজাত ধ্বনি
Flexion—বিভক্তি
Flexional language—সংশ্লেষণাত্মক বা সংশ্লেষণমূলক ভাষা
Foot—পর্ব
Folk-entymology—লোক নিরুক্তি
Form—রূপ

Formative—গঠনকারী
Free Variants—ধ্বনি বা রূপ বিকল্প
Frequency—পৌনঃপুনিক
Fricative—উষ্ম
Friction—উষ্মতা
Front Vowel—সম্মুখ স্বরধ্বনি
Function—ব্যবহার
Fusion—সমন্বয়

G

Germination—যুগ্মীভবন
Generator—উৎপাদক
Genealogial—বংশানুক্রমিক, বংশমূলক
Glide—শ্রুতি
Glossary—শব্দ তালিকা
Glottal—কণ্ঠনালীয়
Glottalization—কণ্ঠনালীয় ভবন
Glottis—কণ্ঠতন্ত্রী
Gradation—ক্রম, স্তর
Grammatical feature—ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য
Graphemics—লিপিতত্ত্ব
Graphical—লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধীয়
Groove—সংকীর্ণ
Guttural—কণ্ঠমূলীয়

H

Half closed—অর্ধসংবৃত
Haplology—সমাক্ষর লোপ
Hard palate—শক্ত তালু
Hard sound—অঘোষবর্ণ, শ্বাসধ্বনি
Harmony of vowel—স্বরসঙ্গতি
Heterogenic—অসমস্থান জাত
Heteroclisis—শব্দমূল বিপর্যয়
Hiatus—ফাঁক, স্বরচ্ছেদ
Holophrase—শব্দ-বাক্য
Holophrastic—বাক্য সংহতিমূলক
Homograph—সাদৃশ্যমূলক বিচ্যুতি
Homophone—সমধ্বনি
Homorganic—সমস্থান জাত
Homonym—সমধন্যাত্মক শব্দ
Hybrid—শঙ্কর শব্দ, মিশ্র শব্দ
Hypothetical—অনুমান সিদ্ধ
Hieroglyphic—প্রতীকলিপি

I

Ideogram—ভাবলিপি
Idiom—বাগ্‌ধারা
Idiomatic—বাগবিধি সম্মত
Idiolet—ব্যক্তি বিশেষের বাক্যরীতি
Imperative mood—আদেশক ভাব, অনুজ্ঞা
Implosive—অবরুদ্ধ
Inclusive—অন্তর্ভুক্ত
Incorporation—সংহতিমূলক, সংযোগ মূলক
Indicative—নির্দেশক
Infection—সংক্রমণ
Infix—বিকরণ, অন্তঃপ্রত্যয়
Inflected—সাধিত
Inflection—বিভক্তি
Inflecting—সবিভক্তিক
Inflexion—প্রত্যয়

Innovation—আবিষ্কার, সৃষ্টি
Injunctive—নির্বন্ধ
Inorganic—অশৃঙ্খলিত, আশ্লেষহীন
Inscription—প্রত্নলেখ
Interword—আন্তর শাব্দিক
Intervocal—আন্তঃস্বরীয়
Internal juncture—অন্তর্বর্তী সন্ধি
Intonation—ধ্বনিতরঙ্গ, স্বর তরঙ্গ
International Phonetic Script (I.P.A.)—আন্তর্জাতিক লিপিমালা
Isolating language—বিশ্লেষণমূলক ভাষা
Isogloss—সমশব্দ রেখা
Isograph—সমভাষা চিত্র
Isophone—সমধ্বনি রেখা
Isomorph—সমরূপ রেখা

J

Jargon—অপভাষা
Juncture—সংযোগস্থল
Juxtaposition—সান্নিধ্য

K

Kymographic tracing—ধ্বনি-নির্ধারক যন্ত্রলিপি
Keyword—মূলশব্দ

L

Labialization—ওষ্ঠীভবন
Labio-dental—দন্তৌষ্ঠ্য
Labio-velar—পশ্চ-জিহ্বৌষ্ঠ্য
Language boundary—ভাষা সীমারেখা
Language shift—ভাষা পরিবর্তন
Language strata—ভাষাস্তর
Larynx—স্বর-যন্ত্র
Laryngeal—স্বর-যন্ত্রীয়
Lateral—পার্শ্বিক
Law of differentiation—বিষমীকরণ সূত্র
Lengthened grade—বর্ধিত ক্রম
Lenis—কোমল
Level of articulation—উচ্চারণ ক্রম
Lexical category—অভিধানিক শ্রেণী বিভাগ
Lexical form—অভিধানিক শব্দ
Lexicography—অভিধান রচনা
Lexicology—অভিধান-তত্ত্ব
Lexicon—অভিধান
Liaison—যোগাযোগ
Linear writing—সমান্তরাল লিপি
Lingua franca—আন্তর্জাতিক ভাষা
Linguist—ভাষাতাত্ত্বিক
Linguistic Geography—ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল
Linguistic minority—সংখ্যালঘু ভাষাভাষী
Linguistic Palaeontology—ভাষা-তত্ত্বগত প্রত্নবিদ্যা
Linguistic typology—ভাষাতাত্ত্বিক রূপ পরিচয়
Linguisticion—ভাষাতত্ত্ববিদ্
Liquid—তরল
Literal—আক্ষরিক

Literatursprache—সাহিত্যিক ভাষা
Logogram—শব্দলিপি
Logography—শব্দলিপিতত্ত্ব
Logo-syllabic writing—শব্দাক্ষরিক লিপি

M

Malapropism—অপপ্রয়োগ
Manner of Articulation—উচ্চারণ রীতি
Mentalistic Theory—মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ
Metathesis—বিপর্যাস, বিপর্যয়
Metalinguistics—ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষা
Metanalysis—বিষমচ্ছেদ
Metonymy—লক্ষণা
Metrics—ছন্দঃ প্রকরণ
Microlinguistics—সূক্ষ্ম ভাষাতত্ত্ব
Mimesis—অনুকৃতি
Mixed language—মিশ্র ভাষা
Monophone—একক ধ্বনি
Monopthong—একক স্বর
Mono-syllabic—একাক্ষরিক
Moon-dot—চন্দ্রবিন্দু
Mora—মাত্রা
Morpheme—রূপমূল
Morphemic—রূপমূলক
Morphophonemics—রূপধ্বনি প্রকরণ
Morphology—রূপতত্ত্ব
Morphological—রূপতাত্ত্বিক, রূপগত
Mutual assimilation—অন্যোন্য সমীভবন

N

Narrative—বর্ণনামূলক
Narrow transcription—সংকীর্ণ অনুলিখন
Nasal—নাসিক্য
Nasalized vowel—আনুনাসিক স্বরধ্বনি
Nasalisation—নাসিক্যীভবন
Naso-pharynx—নাসাপথ
Negative—নঞর্থক
Neutral vowel—মধ্যস্থস্বর, অতিহ্রস্বস্বর
Nominal—নামবাচক
Nonphonemic—অধ্বনি মূলীয়
Nonpersonal—নৈর্ব্যক্তিক
Non syllabic—অনাক্ষরিক
Normal grade—সাধারণ ক্রম
Nucleus—মূলাধার

O

Ob olete word—অপ্রচলিত শব্দ
Occidental—পাশ্চাত্য
Onomatopoetic word—ধ্বন্যাত্মক শব্দ
Open vowel—বিবৃত স্বরধ্বনি
Optional—ঐচ্ছিক
Oral cavity—মুখ গহ্বর
Oral vowel—মৌখিক স্বরধ্বনি
Organs of speech—বাগ্‌যন্ত্র
Orthography—বর্ণ বিন্যাস
Over-tense—সুদৃঢ়

P

Palatal—তালব্য
Palato-alveolar—তালব্য দন্তমূলীয়
Palato-guttural—কণ্ঠ-তালব্য
Palatal law—তালব্য সূত্র
Palatalization—তালব্যীভবন
Paradigm—পদপ্রকরণ
Paradigmatic—পদপ্রকরণ জাত
Paraphrase—শব্দান্তর
Parent language—মূল ভাষা
Parenthsis—অনুবাক্য
Paronyms—সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ
Participial—কৃদন্ত
Participial post-position—অসমাপিকা অনুসর্গ
Particle—নিপাত
Pause—যতি
Past participle—নিষ্ঠা
Periphrastic—যৌগিক
Pharyngeal—গল নালীয়
Pharynx—গল নালী
Phoneme—মূলধ্বনি, ধ্বনিতা
Phonemic—মূলধ্বনি জাত
Phonemics—ধ্বনি বিচার
Phonemic analysis—ধ্বনি বিচার বিশ্লেষণ
Phonetics—ধ্বনি বিজ্ঞান
Phonetician—ধ্বনি বিজ্ঞানী
Phonetic script—ধ্বনি লিপি
Phonogram—শব্দ লিপি
Phonology—ধ্বনি তত্ত্ব
Pictogram—চিত্রলিপি
Pitch—স্বর
Plosive—স্পৃষ্ট ধ্বনি
Point of articulation—উচ্চারণ স্থান
Polyglot—বহুভাষী
Polysyllabic—বহু আক্ষরিক
Polysynthetic—বহু সংহতি মূলক
Portmanteau word—জোড় কলম শব্দ
Post palatal—পশ্চজিহ্বা, পশ্চাত্তালু জাত
Post-position—অনুসর্গ, পরসর্গ, কর্ম প্রবচনীয়
Pre-palatel—অগ্রতালব্য
Prefix—উপসর্গ
Prepositional Determination—প্রাদি সমাস
Primary roots—সিদ্ধ ধাতু
Primary suffix—কৃৎ প্রত্যয়
Pronominal stem—সর্বনাম মূল
Progressive assimilation—প্রগত সমীভবন
Prothesis—স্বরাগম
Prosody—ছন্দ প্রকরণ
Punctuation—যতি বিধান
Psychology of Language—দার্শনিক বিচার মূলক ব্যাকরণ

Q

Quantitative—পরিমাণগত
Quiper—গ্রন্থি লিপি
Quadrisyllabic—চতুরাক্ষরিক

Quality—গুন
Quantity—মাত্রা
Quotation mark—বন্ধনী চিহ্ন

R

Radical—মৌলিক
Reciprocal assimilation—অন্যোন্য সমীভবন
Recursive—অবরুদ্ধ
Redundant—অতিরিক্ত, বাহুল্য
Reduplication—দ্বিরুক্তি, আম্রেড়ন, অভ্যাস
Reduplication of words—শব্দ দ্বিরুক্তি
Reference—প্রসঙ্গ
Regressive—পরাগত
Regressive assimilation—পরাগত সমীভবন
Relative—সম্বন্ধযুক্ত
Relative clause—সম্বন্ধ যুক্ত উপবাক্য
Relative degree—সম্পর্কিত পরিমাণ
Resonance—ব্যঞ্জনা, অনুরণন
Resonant—রণিত
Retracted—প্রস্থত
Retroflex—মূর্ধন্য
Rhotacism—রকারীভবন
Rhythm—ছন্দঃ
Rolled—কম্পিত
Root base—ধাতু মূল
Root inflexion—ধাতু সম্প্রসারণ
Rotracted—প্রস্থত
Rounded—বর্তুলাকার প্রাপ্ত, কুঞ্চিত

S

Script—লিপি, হরফ
Secondary accent—অপ্রধান স্বরাঘাত
Secondary ending—গৌণ বিভক্তি
Secondary phoneme—আনুষঙ্গিক ধ্বনিমূল
Secondary suffix—তদ্ধিত প্রত্যয়
Segmental phoneme—বিভাজিত ধ্বনিমূল
Semantics—শব্দার্থতত্ত্ব, বাগর্থতত্ত্ব
Semantic extension—অর্থ সম্প্রসারণ
Semantic shift—অর্থান্তর
Semicolon—অর্ধযতি চিহ্ন
Sentence word—শব্দ বাক্য
Sequence—অনুক্রম
Sequence utterance—উক্তি ক্রম
Sibilant—শিশ্ ধ্বনি
Sign language—প্রতীক ভাষা
Slang—শিষ্ট বহির্ভূত ভাষা, ইতর ভাষা
Slender consonant—তরল ব্যঞ্জনধ্বনি
Slit fricative—প্রশস্ত উষ্মধ্বনি
Soft palate—কোমল তালু
Soft sound—কোমল ধ্বনি
Solecism—ব্যাকরণের অপপ্রয়োগ
Sonant—ঘোষ
Sonorous—অনুরণনশীল
Souud attributes—ধ্বনিগুণ
Sound box—ধ্বনি মঞ্জুষা
Sound shift—ধ্বনি পরিবর্তন

Sound spectograph—ধ্বনি পরীক্ষার যন্ত্র
Speech-community—ভাষা সম্প্রদায়
Speech sound—বাগ্ধ্বনি
Spirantization—উষ্মীভবন
Spread—প্রসৃত
Spontaneous cerebralization স্বতোমূর্ধন্যীভবন
Spontaneous nasalization—স্বতোনাসিক্যীভবন
Sporadic—অনিয়মিত, বিক্ষিপ্ত
Standard colloquial—চলিত ভাষা
Statistics—পরিসংখ্যান
Stem—শব্দমূল বা ক্রিয়ামূল
Stop—স্পর্শবর্ণ
Stream of speech—বাক্ প্রবাহ
Stereotyped—রীতিসিদ্ধ
Stress—শ্বাসাঘাত, বল
Strong grade—সাধারণ বা গুণিত ক্রম
Structural Linguistics—গঠন বিন্যাস-মূলক ভাষাতত্ত্ব
Style—শৈলী
Subjunctive—অভিপ্রায়
Supra segmental phoneme—অতিরিক্ত ধ্বনিমূল
Syllable—অক্ষর
Syllabic—অক্ষর ভিত্তিক
Syllabic script—অক্ষর লিপি
Syllabic syncope—সমাক্ষর লোপ
Syllabic sign—আক্ষরিক চিহ্ন
Syllabic stress—আক্ষরিক ঝোঁক
Syllabic writing—আক্ষরিক লিখন প্রণালী
Syllabication—অক্ষরীকরণ
Syllabification—অক্ষর বিভাজন
Symbol—প্রতীক
Synchronic—সমকালীন
Syncope—মধ্যস্বর লোপ
Syntactical—পদক্রমিক
Syntactic category—বাক্যরীতি শ্রেণী
Syntactic construction—পদ গঠন বিন্যাস
Syntax—বাক্যরীতি, পদক্রম

T

Tagmene—রূপমূল
Tap—মৃদুস্পর্শ
Taxeme—অতি ক্ষুদ্র রূপমূল
Teeth ridge—দন্ত-মূল
Tempo—গতি
Temporal affix—কালবাচক প্রত্যয়, বিকরণ
Tetrapthong—চতুঃস্বরিক
Tetra-syllabic—চতুরাক্ষরিক
Terminal stress—অন্ত্যাক্ষরিক ঝোঁক
Tone—স্বর
Tone Language—স্বর প্রধান ভাষা
Toneme—স্বরমূল
Tongue root—জিহ্বা-মূল
Tongue tip—জিহ্বাগ্র
Transcription—প্রতিলিপি

Transferred meaning—পরিবর্তিত অর্থ
Transition—সংক্রমণ
Transliteration—অনুলিখন
Trill—কম্পন জাত
Trilled—কম্পিত
Tripthory—ত্রিস্বরিক
Triplets—ত্রয়ী
Trisyllabic—ত্র্যক্ষরিক

U

Ultimate constituent—অন্ত্য উপাদান
Umlant—অভিশ্রুতি
Unaspirated—অল্পপ্রাণ
Unit—একক
Unvoiced—অঘোষ
Unvoicing—অঘোষভবন
Uvula—আলজিহ্বা
Uvular—আলজিহ্ব্য

V

Variant—বিকল্প
Variation—ধ্বনি বা রূপ বিকল্প
Velar—জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালু জাত
Vibration—কম্পন
Vocabulary—শব্দাবলী
Vocal organ—স্বরযন্ত্র
Vocalization—ঘোষীভবন
Vocalic consonant—অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন
Voiced—ঘোষ
Voiceless—অঘোষ
Voicing—ঘোষীভবন
Vowel contraction—স্বর সংকোচ
Vowel gradation—গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণ, অপ্রশ্রুতি
Vowel harmony—স্বরসঙ্গতি
Vowel in contact—সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি, স্বরধ্বনি সংযোগ
Vowel mutation—স্বর পরিবর্তন
Vowel stem—স্বরান্ত শব্দ
Vulgarism—গ্রাম্যতা দুষ্ট

W

Wave form—তরঙ্গ ভঙ্গ
Weak grade—ক্ষয়িত ক্রম
Weakening—হ্রস্বীভবন
Weak sound—তরল ধ্বনি
Whispered vowel—অঘোষ স্বরধ্বনি
Widened meaning—সম্প্রসারিত অর্থ
Wind pipe—বায়ুনালী
Word-Building—শব্দ গঠন
Word class—শব্দ প্রকার
Word order—শব্দ ক্রম
Word writing—শব্দ লিপি
Writing system—লিখন প্রণালী
Yotized—তালব্যীভবন
Zero Affix—শূন্য বিভক্তি

বাংলা নির্দেশ

ইংরেজী নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
স্বরাঘতি	স্বরাঘাত	৪১
লঙ্	লুঙ্	"
নিম্নলিখিত	উপরে বর্ণিত	৮২
Frictive	Fricative	৯৩
পরিলর্তন	পরিবর্তন	১১৯
Partmantean	Partmanteau	১২৩
Cordinal numpers	Cardinal numbers	১৯৮
অনির্দেক	অনির্দেশক	২০৪
ধ্বনি প্রাধান	ধ্বনি প্রধান	২৩২
পব্দ	শব্দ	২৩৮
ণরিচায়ক	পরিচায়ক	২৮৫
Bengal Phonetic Reader	Bengali Phonetic Reader	২৯৬
Bengal Self-Taught	Bengali Self-Taught	২৯৬

গ্রন্থঋণ

The Origin and development of the Bengali Language (ODBL)—Prof. S. K. Chatterji.

A brief sketch of Bengali Phonetics— ,, ,,

Indo-Aryan and Hindi— ,, ,,

Language—Leonard Bloomfield.

An Introduction to Descriptive Linguistics—H. A. Gleason

A comparative Grammar of Middle Indo-Aryan—Prof. S. Sen.

Comparative Grammar of the Greek Language—Josep Wright.

Comparative Grammar of Greek and Latin—Carl Darling Buck.

Elements of the Science of Language—I. J. S. Taraporewala.

An Introduction to Comparative Philology—P. D. Gune.

Introduction to Prakrit—Woolner.

Introduction to the Natural History of Langnage—Tucker.

A Comparative Grammar of Sanskrit, Greek and Hittite —Satya Swarup Misra.

Foundation of Language—Grey.

Sanskrit Grammar—William Dwight Whitney.

Vedic Grammar of Students—Macdonell.

A Course in Modern Linguistics—C. F. Hockett.

Language—Sapir.

English Phonetics—Armfield Noel.

A hand book of Phonetics—Sweet Henry.

A Sanskrit-English Dictionary—Monier Williams.

The Students Sanskrit English Dictionary—V. S. Apte.

ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা— ,, ,, ,,

ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা— ,, ,, ,,

ভাষার ইতিবৃত্ত—অধ্যাপক সুকুমার সেন
পালি প্রকাশ—বিধুশেখর শাস্ত্রী
ধ্বনি-বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব—মুহম্মদ আবদুল হাই
ভাষাতত্ত্ব—রফিকুল ইসলাম
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ
চর্যাপদ—মনীন্দ্রমোহন বসু
শব্দ কথা—অধ্যাপক ক্ষিতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মৈমনসিংহ গীতিকা—
ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন—ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার—জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী
বঙ্গীয় শব্দ কোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত কোষ—
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস

সংকেত চিহ্ন

অপভ্রংশ—অপ
আধুনিক বাংলা—আ-বা
মধ্য বাংলা—ম-বা
গ্রীক—গ্রী
মহারাষ্ট্রী—মহা
অর্ধ-মাগধী—অ-মা
লিথুয়ানীয়—লি
শৌরসেনী—শৌ
< —পূর্ববর্তী রূপের গতিদ্যোতক চিহ্ন

আবেস্তা—আ
প্রাচীন বাংলা—প্রা-বা
ইংরেজ—ইং
প্রাচীন পারসীক—প্রা-পা
মাগধী—মা
লাতিন—লা
সংস্কৃত—সং
> —বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন
√—ধাতুবাচক চিহ্ন

*—সম্ভাব্য রূপ